(১ থেকে ৫ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ — প্রশ্নোত্তর আকারে)

MUKHTASAR Kitab–ut–Taharah (Volume 1 to 5, in Q/A Format)

বিশদ জানার জন্য পাঁচ খণ্ডের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রণিধান করুন

সংক্ষিপ্ত কিতাবুত তাহারাহ

৬ষ্ঠ খণ্ড

লেখক

ড. হাফিয শায়খ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

পরিমার্জন / পুনর্বিবেচনা

শায়খ রিজাউল্লাহ আবদুল করিম মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

সূচিপত্র

ক্রম নম্বর	প্রশ্ন/ মাসআলা নম্বর	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
		অনুবাদকের বক্তব্য	১
১		ভূমিকা	৩
২		কিতাবুত তাহারাহ (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, প্রশ্নোত্তর আকারে)	৬
৩		পরিচিতি	৬
৪		সংক্ষিপ্ত পুস্তিকার উদ্দেশ্য	৬
PART-1 প্রথম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ			
৬		কিতাবুত তাহারাহ – প্রথম খণ্ড (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, প্রশ্নোত্তর আকারে)	৮
৭		শায়খ ড. হাফিয আরশাদ বাশির উমরি মাদানি (হাফিযাহুল্লাহ)-এর রচিত "কিতাবুত তাহারাহ" গ্রন্থে কোন কোন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে?	৮
৮	১	তাহারাহ (الطهارة) শব্দের শাব্দিক অর্থ কী?	৮
৯	২	তাহারার বিপরীত কী?	৮
১০	৩	ফিকহি পরিভাষায় তাহারাতের সংজ্ঞা কী?	৮
১১	৪	তাহারাহ কত প্রকার?	৯
১২	৫	মা'নাবি তাহারাহ কী?	৯
১৩	৬	মা'নাবি তাহারাহ অর্জনের উপায় কী?	৯
১৪	৭	হিসসি (শারীরিক) তাহারাহ কী?	৯
১৫	৮	হিসসি তাহারাহ অর্জনের উপায় কী?	১০
১৬	৯	তাহারার গুরুত্ব কী?	১০
১৭	১০	কেন হাদাস দূর করা ও নাপাকি অপসারণের জ্ঞান অপরিহার্য?	১০
১৮	১১	যারা পবিত্রতা থেকে বিমুখ থাকে, তাদের পরিণতি কেমন হবে?	১১
১৯	১২	তাহারাহ কাকে বলে?	১১
২০	১৩	নাজাসাত কাকে বলে?	১২
২১	১৪	হাদাস কাকে বলে?	১২
২২	১৫	হাদাস কত প্রকার?	১২
২৩	১৬	নাপাক বস্তুসমূহের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।	১২

২৪	১৭	মানুষের শরীর থেকে বের হওয়া (হায়েয ও নিফাস ছাড়া) রক্তের বিধান কী?	১৩
২৫	১৮	ওয়াদি (وَدْي) কী এবং এর বিধান কী?	১৩
২৬	১৯	মাযি (مَذْي) কী এবং এর বিধান কী?	১৩
২৭	২০	মাযির ক্ষেত্রে এক বা একাধিক হাতের তালু দিয়ে পানি ছিটানো কি যথেষ্ট?	১৪
২৮	২১	যে হালাল পশুকে শরিয়তসম্মতভাবে জবাই করা হয়নি— তার গোশত ও চামড়ার বিধান কী?	১৪
২৯	২২	জীবিত হালাল পশুর শরীর থেকে কেটে নেওয়া কোনো অঙ্গের বিধান কী?	১৪
৩০	২৩	মরা মাছ ও পঙ্গপাল (টিড্ডি)-এর বিধান কী?	১৪
৩১	২৪	দাবাগা (চামড়া পাক করা)-এর মাধ্যমে কি প্রত্যেক পশুর চামড়া পবিত্র হয়ে যায়?	১৪
৩২	২৫	মৃত মানুষের বিধান কী?	১৫
৩৩	২৬	প্রাণীদের প্রস্রাব ও গোবর (মল)-এর বিধান কী?	১৫
৩৪	২৭	পবিত্রতার মূলনীতি কী?	১৬
৩৫	২৮	হালাল পশুর নাড়িভুঁড়ির (ওড়ঝি/উড়ঝি) বিধান কী?	১৬
৩৬	২৯	কুকুরের কেবল লালা (আঁঠালো লালা) নাপাক, নাকি তার পুরো দেহ?	১৬
৩৭	৩০	গাধার কি কেবল গোশত নাপাক, নাকি পুরো দেহ?	১৬
৩৮	৩১	জাল্লালাহ (الجلالة)—নাপাকখোর পশু—এর বিধান কী?	১৬
৩৯	৩২	যেসব পোকামাকড় ও প্রাণীর দেহে প্রবাহমান রক্ত নেই—তারা কি নাপাক?	১৭
৪০	৩৩	বন্য প্রাণীদের শুধু গোশত নাপাক, নাকি তার পুরো দেহ?	১৭
৪১	৩৪	উল্লেখিত বিষয়গুলোর সারসংক্ষেপ বর্ণনা করুন।	১৭
৪২	৩৫	উচ্ছিষ্ট বা অবশিষ্ট খাবারগুলোর মধ্যে কোনটি পবিত্র আর কোনটি অপবিত্র?	১৭
৪৩	৩৬	বীর্য (মানি) কি পবিত্র?	১৮
৪৪	৩৭	মদ কি পাক?	১৮
৪৫	৩৮	বমি কি নাপাক?	১৯
৪৬	৩৯	হায়েজগ্রস্ত নারী ও জুনবি ব্যক্তির ঘাম কি পবিত্র?	১৯
৪৭	৪০	যেসব পশু-পাখি সাধারণত নাপাকি থেকে বাঁচে না, তাদের	১৯

		উচ্ছিষ্টের হুকুম / বিধান কী?	
৪৮	৪১	নাপাকি দূর করার পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করুন।	১৯
৪৯	৪২	ইস্তিঞ্জা কীভাবে করতে হবে?	২০
৫০	৪৩	পেশাবের নাপাকি পরিষ্কার করার পদ্ধতি কী?	২১
৫১	৪৪	জুতায় নাপাকি লাগলে কীভাবে পরিষ্কার করা হবে?	২১
৫২	৪৫	ঋতুস্রাবের রক্ত কীভাবে পরিষ্কার করা হবে?	২২
৫৩	৪৬	মহিলাদের ঝুলে থাকা পোশাক নোংরা হলে কীভাবে পরিষ্কার হবে?	২৩
৫৪	৪৭	বীর্য (মানি) কীভাবে পরিষ্কার করা হয়?	২৩
৫৫	৪৮	মৃত হালাল পশুর চামড়া কীভাবে পবিত্র হবে?	২৩
৫৬	৪৯	যদি ঘি বা তেলে ইঁদুর পড়ে যায়, তাহলে কী করতে হবে?	২৪
৫৭	৫০	নাপাকির কারণে পরিবর্তিত পানির বিধান কী?	২৪
৫৮	৫১	কখন শুধু পানি দিয়েই পরিষ্কার করা ফরজ?	২৪
৫৯	৫২	নাপাকি দূর করার পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (দলিলসহ) দিন।	২৪
৬০	৫৩	ইস্তিঞ্জার সংক্ষিপ্ত আদব বর্ণনা করুন	২৭
৬১	৫৪	পায়খানার জন্য কত দূরে যাবে?	২৭
৬২	৫৫	কোথায় পায়খানা-প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ?	২৮
৬৩	৫৬	পাত্রে প্রস্রাব করা কি জায়েয?	২৮
৬৪	৫৭	পায়খানা বা পেশাবের সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দেওয়ার বিধান কী?	২৮
৬৫	৫৮	পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচা কেন জরুরি?	৩০
৬৬	৫৯	যদি জামাআতের সময় হয়ে যায় অথচ পেশাব-পায়খানার চাপ থাকে, তবে কী করতে হবে?	৩০
৬৭	৬০	দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা কি জায়েয?	৩০
৬৮	৬১	গোসলখানায় প্রস্রাব করা যাবে কি?	৩১
৬৯	৬২	ঘরে প্রয়োজন সারার জন্য ‘Attached Bathroom’ থাকা কি প্রমাণিত?	৩১
৭০	৬৩	ব্যবহৃত পানি (الماء المستعمل) কী?	৩১
৭১	৬৪	পবিত্র মিশ্রিত পানি কী?	৩২
৭২	৬৫	কখন পানি নাপাক বলে গণ্য হবে?	৩২
৭৩	৬৬	কোন পানি পবিত্র এবং কোন পানি অপবিত্র?	৩৪
৭৪	৬৭	যদি পানির নাপাকি দূর হয়ে যায় তবে তার হুকুম কী?	৩৬

কিতাবুত তাহারাহ – দ্বিতীয় খণ্ড			
৭৬	৬৮	“ফিতরাত” শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?	৩৮
৭৭	৬৯	ফিতরাতের পরিভাষাগত (শরঈ) অর্থ কী?	৩৮
৭৮	৭০	সুনানুল ফিতরার সংখ্যা কত?	৩৮
৭৯	৭১	ফিতরাতসংক্রান্ত হাদিসসমূহ বর্ণনা করুন	৩৮
৮০	৭২	সুনানুল ফিতরার কী কী হিকমত আছে?	৩৯
৮১	৭৩	খতনা ফরজ, নাকি সুন্নত?	৪০
৮২	৭৪	খতনার ফজিলত ও গুরুত্ব কী?	৪০
৮৩	৭৫	“ক্বাসসুশ শারিব”-এর আভিধানিক অর্থ কী?	৪০
৮৪	৭৬	গোঁফ বড়ো করা কার নিদর্শন?	৪১
৮৫	৭৭	গোঁফ কাটা উচিত, নাকি শেভ করা?	৪১
৮৬	৭৮	“اعفاء اللحية” (দাড়ি ছেড়ে দেওয়া) এর অর্থ কী?	৪১
৮৭	৭৯	দাড়ির বিধান কী?	৪১
৮৮	৮০	দাড়ির পরিমাণ ও কাটার বিষয়ে আলেমদের মতামত বর্ণনা করুন।	৪২
৮৯	৮১	দাড়ি রাখার শরয়ি বিধান কী?	৪২
৯০	৮২	নবী ﷺ-এর দাড়ি কেমন ছিল?	৪২
৯১	৮৩	দাড়ি শেভ (মুড়িয়ে ফেলা) করার হুকুম কী?	৪৩
৯২	৮৪	“সিওয়াক” (মিসওয়াক)-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী?	৪৩
৯৩	৮৫	মিসওয়াকের হুকুম কী?	৪৩
৯৪	৮৬	মিসওয়াকের উদ্দেশ্য কী?	৪৪
৯৫	৮৭	মিসওয়াকের কী ফজিলত আছে?	৪৪
৯৬	৮৮	রোজাদার কি মিসওয়াক করতে পারে?	৪৪
৯৭	৮৯	কিছু মানুষ রোজা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় রমযানের দিনে মিসওয়াক করা থেকে বিরত থাকে — এটা কি ঠিক? রমযানে কোন সময় মিসওয়াক করা উত্তম?	৪৫
৯৮	৯০	মাজমাযা (কুলি করা) ও ইস্তিনশাক (নাকে পানি দেওয়া) কী?	৪৫
৯৯	৯১	মাজমাযা ও ইস্তিনশাকের হুকুম কী?	৪৫
১০০	৯২	রোজাদারের জন্য নাকে পানি দেওয়ার হুকুম কী?	৪৬
১০১	৯৩	নখ কাটার নির্ধারিত সময় কত?	৪৬
১০২	৯৪	মহিলা ও মেয়েদের জন্য মেহেদি লাগানো কি জায়েয?	৪৬
১০৩	৯৫	পুরুষ ও নারী — উভয়ের জন্য নখ বড়ো রাখা কি নিষিদ্ধ?	৪৭

১০৪	৯৬	নখ কাটার হিকমত কী?	৪৭
১০৫	৯৭	কোন দিক থেকে নখ কাটা উচিত?	৪৭
১০৬	৯৮	কাটা নখ ফেলা ও দাফন করার বিধান কী?	৪৮
১০৭	৯৯	রাতে নখ কাটা কি নিষিদ্ধ?	৪৮
১০৮	১০০	বগলের লোম উপড়ে ফেলা উত্তম, নাকি কামানো?	৪৮
১০৯	১০১	বগলের লোম পরিষ্কার করার পদ্ধতি কী?	৪৮
১১০	১০২	নাভির নিচের লোম (যৌনাঙ্গের লোম) দূর করার পদ্ধতি কী?	৪৮
১১১	১০৩	আধুনিক জিনিস দিয়ে বগল বা নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা যাবে কি?	৪৯
১১২	১০৪	নাভির নিচের লোম কাটার সময়সীমা কত?	৪৯
১১৩	১০৫	স্বামী-স্ত্রী কি একে অপরের নাভির নিচের লোম কাটতে পারে?	৪৯
১১৪	১০৬	বগল ও নাভির নিচের লোম না কাটলে নামাজে কোনো প্রভাব পড়ে?	৪৯
১১৫	১০৭	পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জার ফজিলত ও গুরুত্ব কী?	৪৯
১১৬	১০৮	জমজমের পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা যাবে কি?	৫০
নাপাকি ও নাপাকি দূরীকরণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা ও নীতিমালা			
১১৮	১০৯	নাপাকি দূর করা ওয়াজিব।	৫০
১১৯	১১০	অধিকাংশ কবরের আযাব পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচতে অবহেলা করার কারণে হয়।	৫০
১২০	১১১	সব প্রকার নাপাকির হুকুম এক নয়।	৫০
১২১	১১২	অকারণে সন্দেহের অভ্যাস করা সঠিক নয়; বরং 'ইস্তিসহাব' (পূর্বাবস্থাকে বহাল ধরা)-এর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।	৫০
১২৩	১১৩	কিছু আলেমের মত হলো—যদি সূর্য বা বাতাসের মাধ্যমে (নাপাকি শুকিয়ে যায়)...	৫১
১২৪	১১৪	পেশাব লাগলে বড় বিছানা ধোয়ার পদ্ধতি।	৫১
১২৫	১১৫	ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়ার বিধান।	৫২
১২৬	১১৬	সাবান, শ্যাম্পু, ক্রিম ইত্যাদি ব্যবহার করলে (গোসলের ক্ষেত্রে)...	৫২
১২৭	১১৭	নামাজ আদায়ের পর জানা গেল শরীর বা কাপড়ের কোনো অংশে নাপাকি ছিল...	৫২
১২৮	১১৮	টিস্যু/কাগজ দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা জায়েজ।	৫২
১২৯	১১৯	আলেমদের ফতোয়া অনুযায়ী সূঁচের অগ্রভাগ পরিমাণ...	৫৩

১৩০	১২০	বীর্য নাপাক—এ মর্মে কোনো প্রমাণ নেই।	৫৩
১৩১	১২১	শিশু বিছানায় পেশাব করলে এবং শুকিয়ে গেলে...	৫৩
১৩২	১২২	নাপাক বস্তু থেকে নির্গত পদার্থ সম্পর্কে ইমাম ইবন তাইমিয়ার বক্তব্য।	৫৩
১৩৩	১২৩	ইমাম ইবন তাইমিয়া ইমাম আবু হানিফার একটি মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।	৫৩
১৩৪	১২৪	বাথরুমের পোকা কাপড় বা বিছানায় দেখা গেলে হুকুম কী?	৫৪
১৩৫	১২৫	বৃদ্ধ, অসুস্থ বা অক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে পায়খানা সংক্রান্ত বিধান।	৫৪
১৩৬	১২৬	আলেমদের নির্ধারিত পার্থক্য সম্পর্কিত আলোচনা।	৫৪
১৩৭	১২৭	হাত বা মেশিনে পবিত্র ও নাপাক কাপড় একত্রে ধোয়া।	৫৪
১৩৮	১২৮	হারাম ও নাপাক জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েজ নয়।	৫৫
১৩৯	১২৯	যে নাপাকিতে মানুষ সরাসরি আক্রান্ত বা লিপ্ত নয় তার বিধান।	৫৫
১৪০	১৩০	ঘুম থেকে জেগে হাত ধোয়ার আগে পানিতে না ঢোকানো।	৫৫
পোশাক সংক্রান্ত মাসআলা			
১৪১	১৩১	কাপড়ের যে অংশে নাপাকি লেগেছে...	৫৫
১৪২	১৩২	নামাজের পর অজ্ঞতা বা ভুলে শরীর/কাপড়/স্থান নাপাক ছিল জানা গেলে...	৫৫
রক্ত কখন নাপাক, কখন নয়?			
১৪৪	১৩৩	অধিকাংশ আলেমের মতে প্রবাহিত রক্ত নাপাক।	৫৫
১৪৫	১৩৪	অল্প পরিমাণ রক্ত ক্ষমাযোগ্য।	৫৬
১৪৬	১৩৫	ইমাম ইবন আবদুল বার এবিষয়ে ইজমা বর্ণনা করেছেন।	৫৬
১৪৭	১৩৬	পুঁজের মধ্যে থাকা রক্তও একই শ্রেণিভুক্ত।	৫৬
১৪৮	১৩৭	জবাইয়ের সময় কসাইয়ের গায়ে লাগা রক্ত ক্ষমাযোগ্য।	৫৬
১৪৯	১৩৮	প্রবাহিত রক্ত ক্ষমাযোগ্য।	৫৬
১৫০	১৩৯	রক্ত নাপাক নয়—এ মর্মে দলিল উপস্থাপন।	৫৬
১৫১	১৪০	ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য।	৫৬
১৫২	১৪১	'দামে ইয়াসির' শব্দটি সাধারণত মাঝারি পরিমাণ রক্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।	৫৬
১৫৩	১৪২	রক্তদান (Blood Donation) করা জায়েজ।	৫৬
১৫৪	১৪৩	ইনজেকশনে রক্ত বের হলে অজু ভাঙে না।	৫৬
প্রাণী সংক্রান্ত মাসআলা			

১৫৫	১৪৪	মৃত জন্তুর চামড়া পাক নয়, যতক্ষণ না তা প্রক্রিয়াজাত (দাবাগা) করা হয়।	৫৭
১৫৬	১৪৫	জীবিত প্রাণী থেকে কাটা গোশত মৃতের হুকুমে।	৫৭
১৫৭	১৪৬	হারাম প্রাণীর গোশত নাপাক।	৫৭
১৫৮	১৪৭	সন্দেহজনক বিষয়ে জ্ঞান রাখা জরুরি।	৫৭
১৫৯	১৪৮	বিড়ালের অবশিষ্ট (পানি/খাবার) পাক।	৫৭
১৬০	১৪৯	হালাল ও হারাম প্রাণীর লোম পাক।	৫৮
১৬১	১৫০	কাফের দেশের তৈরি লোম/উল/পালক ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত জিনিসের বিধান।	৫৮
১৬২	১৫১	চামড়া থেকে তৈরি জিনিসপত্র	৫৮
১৬৩	১৫২	হালাল প্রাণীর লোম ও উল থেকে প্রস্তুত বস্তু	৫৮
১৬৪	১৫৩	জীবিত অবস্থায় প্রাণীর অংশের বিধান।	৫৮
১৬৫	১৫৪	“ইনফাহা” অর্থ—হালকা হলদেটে সাদা পদার্থ।	৫৮
১৬৬	১৫৫	যেসব প্রাণীতে রক্ত নেই তাদের বিধান।	৫৮
১৬৭	১৫৬	হরিণের কস্তুরী পাক।	৫৯
১৬৮	১৫৭	অমুসলিম দেশে প্রস্তুত জুতা ইত্যাদির বিধান।	৫৯
১৬৯	১৫৮	হালাল-হারাম প্রাণীর চামড়া সম্পর্কিত বিধান।	৫৯
১৭০	১৫৯	হাড় দিয়ে তৈরি জিনিসের বিধান।	৫৯
১৭১	১৬০	মৃত মানুষ (মুমিন) নাপাক নয়।	৫৯
১৭২	১৬১	মদ (খামর) পবিত্র।	৫৯
১৭৩	১৬২	নাপাকি থেকে কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করা যায়?	৫৯
১৭৪	১৬৩	কুয়ায় পশু পড়ে মারা গেলে...	৫৯
১৭৫	১৬৪	স্থির পানিতে পায়খানা করতে নিষেধ।	৬০
১৭৬	১৬৫	কাদা নিজে নাপাক নয় যতক্ষণ না নাপাকি মিশে।	৬০
১৭৭	১৬৬	বাধ্যতামূলক অবস্থায় তিনবারে পায়খানা...	৬০
১৭৮	১৬৭	ওয়াশিং মেশিনের বিধান।	৬০
পাত্র-বাসনের নাপাকি সংক্রান্ত মাসআলা			
১৮০	১৬৮	পুরুষ ও নারীর জন্য সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ।	৬০
১৮১	১৬৯	নারীর জন্য সোনা-রূপার অলংকার বৈধ।	৬১
১৮২	১৭০	পুরুষের জন্য সোনা-রূপার ঘড়ি বৈধ নয়।	৬১
১৮৩	১৭১	পুরুষের জন্য সোনা-রূপার চশমা, কলম ইত্যাদি...	৬১
১৮৪	১৭২	চরম প্রয়োজনে বিকল্প না থাকলে...	৬১

১৮৫	১৭৩	ইবন তাইমিয়ার মত—জরুরি অবস্থা ব্যতীত...	৬১
১৮৬	১৭৪	নির্দিষ্ট ধাতব পাত্র ব্যবহারের বিধান।	৬১
১৮৭	১৭৫	অপচয় ও অহংকার থেকে বেঁচে থাকা।	৬১
পানির নাপাকি ও পবিত্রতার বিধান			
১৮৯	১৭৬	দুই কুল্লা বা তার বেশি পানি হলে...	৬২
১৯০	১৭৭	পানির পরিমাণ ও লিটারের হিসাব।	৬২
১৯১	১৭৮	পানিতে লোহা, পাতা, সবজি বা জাফরান পড়লে...	৬২
১৯২	১৭৯	ব্যবহৃত পানি (অজু/গোসলের পর অবশিষ্ট) পবিত্র।	৬২
১৯৩	১৮০	মূলনীতি—সবকিছু পবিত্র বলে গণ্য হবে যতক্ষণ প্রমাণ না আসে।	৬২
১৯৪	১৮১	কোনো কিছুর নাপাক হওয়ার দৃঢ় প্রমাণ হলে...	৬৩
১৯৫	১৮২	নাপাকি দূর করার প্রধান মাধ্যম পানি।	৬৩
১৯৬	১৮৩	বাষ্পের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন।	৬৩
১৯৭	১৮৪	আধুনিক প্রযুক্তিতে পানি পরিশোধন বৈধ।	৬৩
১৯৮	১৮৫	পানির নাপাকি দূর করার পদ্ধতি।	৬৩
১৯৯	১৮৬	কাপড়ে নাপাকি লাগলেও স্থান জানা না থাকলে...	৬৩
২০০	১৮৭	কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে কঠোরতা করা উচিত নয়।	৬৩
২০১	১৮৯	কুকুরের লালা ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর লালার নাপাকির বিধান।	৬৪
২০২	১৯০	কোনো বস্তুকে পবিত্র বলে গণ্য করলে তার দলিল চাওয়া হয় না।	৬৪
২০৩	১৯১	সব বস্তু মূলত পবিত্র ও পাক—যতক্ষণ না তার নাপাক হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।	৬৪
২০৪	১৯২	‘আল-বারাআতুল আসলিয়্যা’ (মূলনীতি) অনুযায়ী প্রত্যেক বস্তু পবিত্র বলে ধরা হবে।	৬৪
২০৫	১৯৩	যদি নাপাক ও ময়লা পানি নিজে নিজে পবিত্র হয়ে যায় (তাহলে তার বিধান)।	৬৪
২০৬	১৯৪	‘সুর’ (অবশিষ্ট পানি) শব্দটি কেবল পান করার পর অবশিষ্ট পানির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়।	৬৪
২০৭	১৯৫	মানুষের অবশিষ্ট পানি—যাতে তার হাত লেগেছে—সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম, তার বিধান।	৬৪
২০৮	১৯৬	হালাল প্রাণীর অবশিষ্ট পানি পবিত্র।	৬৫
২০৯	১৯৭	খচ্চর ও গাধার অবশিষ্ট পানি—যদি অন্য কোনো পানি না	৬৫

		পাওয়া যায়—তাহলে তার বিধান।	
পায়খানা সংক্রান্ত আদব			
২১১	১৯৮	টয়লেটে প্রবেশের দোয়া।	৬৫
২১২	১৯৯	বের হয়ে "গুফরানাকা" পড়া।	৬৫
২১৩	২০০	আল্লাহর নামযুক্ত বস্তু টয়লেটে না নেওয়া।	৬৫
২১৪	২০১	পায়খানার সময় সালামের জবাব না দেওয়া।	৬৫
২১৫	২০২	লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা।	৬৬
২১৬	২০৩	মাটির কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত কাপড় না তোলা।	৬৬
২১৭	২০৪	খোলা স্থানে কিবলার দিকে মুখ/পিঠ না করা।	৬৬
২১৮	২০৫	পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচা।	৬৬
২১৯	২০৬	রাস্তা ও ছায়াযুক্ত স্থানে পায়খানা না করা।	৬৬
২২০	২০৭	স্থির পানিতে পায়খানা না করা।	৬৬
২২১	২০৮	গোসলখানায় পেশাব না করা।	৬৬
২২২	২০৯	প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পেশাব করা বৈধ।	৬৬
পেশাব-পায়খানা পরিষ্কার করার পদ্ধতি			
২২৪	২১০	পানি, পাথর বা কোনো শক্ত ও কঠিন বস্তুর মাধ্যমে (হাড় ও গোবর ব্যতীত) পেশাব পরিষ্কার করার বিধান।	৬৬
২২৫	২১১	পায়খানা পরিষ্কার করা 'ইস্তিজমার' দ্বারা—অর্থাৎ পাথর, ঢেলা বা তার সমপর্যায়ের কোনো বস্তুর মাধ্যমে।	৬৭
২২৬	২১২	পাথর বা ঢেলার মাধ্যমে পরিষ্কার করলে তা বেজোড় সংখ্যায় (৩, ৫ ইত্যাদি) হতে হবে।	৬৭
২২৭	২১৩	গোবর, হাড়, সম্মানিত বস্তু ও খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষিদ্ধ।	৬৭
২২৮	২১৪	পায়খানা শেষে পরিষ্কারের জন্য ডান হাত ব্যবহার করা যাবে না।	৬৭
২২৯	২১৫	পায়খানা শেষে নাপাকি দূর করার পরবর্তী বিধান।	৬৭
২৩০	২১৬	টয়লেটে প্রবেশের সময় বাম পা আগে প্রবেশ করানো।	৬৭
২৩১	২১৭	বায়ু নির্গত হলে ইস্তিঞ্জা জরুরি নয়; তবে অজু ভেঙে যায়।	৬৭
২৩২	২১৮	গর্ত, ফাটল, সুড়ঙ্গ ও প্রাণীর বিলের মধ্যে পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে।	৬৭
২৩৩	২১৯	সূর্য বা চাঁদের দিকে মুখ বা পিঠ করে বসার বিধান।	৬৭
২৩৪	২২০	টয়লেট সংক্রান্ত একটি মাসআলা দুর্বল হাদিসের ভিত্তিতে	৬৭

		বর্ণিত হয়েছে।	
২৩৫	২২১	ইমাম সানআনি ও "হামলাতুল-মাওদি" গ্রন্থকারের মতামত।	৬৮
২৩৬	২২২	টয়লেটে প্রবেশকালে যিকর বা বিসমিল্লাহ বলা প্রসঙ্গে বিধান।	৬৮
২৩৭	২২৩	টয়লেটে প্রবেশের সময় প্রথমে বাম পা প্রবেশ করানো।	৬৮
২৩৮	২২৪	পায়খানা শেষে পরিষ্কারের জন্য তিনটি পাথর ব্যবহার করা।	৬৮
২৩৯	২২৪	ইস্তিজমার ও ইস্তিঞ্জার ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ।	৬৮
২৪০	২২৫	মিসওয়াকের জন্য পিলু গাছের ডাল ব্যবহার সুন্নতের অনুসরণ।	৬৮
২৪১	২২৬	মাজন (টুথপেস্ট/মঞ্জন) ও পিলু গাছের কাঠ ব্যবহারের বিধান।	৬৮
২৪২	২২৭	অ্যালকোহল সম্পর্কিত বিধান।	৬৮
২৪৩	২২৮	কোন বস্তু দ্বারা মিসওয়াক করা উত্তম?	৬৯
২৪৪	২২৯	ইমাম রাফেয়ি 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে বলেছেন—'সিওয়াক' শব্দের মূল ধাতু 'স-ও-ক'।	৬৯
মাসাহ সংক্রান্ত বিধান ও মাসআলা			
২৪৬	২৩০	বুট জুতার হুকুমও মোজার (খুফ) মতো।	৬৯
২৪৭	২৩১	কাপড়ের মোজার উপরও মাসাহ করা জায়েজ।	৬৯
২৪৮	২৩২	মুকীম ও মুসাফিরের জন্য মাসেহের নির্ধারিত সময়সীমা কখন থেকে শুরু হবে।	৬৯
২৪৯	১২৭	মোজা খুলে ফেললে পূর্ববর্তী মাসাহ বাতিল হয় না।	৬৯
২৫০	২৩৩	পাগড়ির ক্ষেত্রে শিমাগ বা অন্যান্য কাপড় অন্তর্ভুক্ত নয়; সেগুলোর উপর মাসাহ জায়েজ নয়।	৭০
২৫১	২৩৪	ব্যান্ডেজ বা প্লাস্টারের উপর মাসাহ করা জায়েজ।	৭০
২৫২	২৩৫	অঙ্গের উপর প্লাস্টার থাকলে করণীয় কী?	৭০
২৫৩	২৩৬	কারও হাত বা অজুর কোনো অঙ্গ ভেঙে গেলে তার বিধান।	৭০
২৫৪	২৩৭	কৃত্রিম পা বা হাতের উপর অজু বা গোসল করা জরুরি নয়।	৭০
২৫৫	২৩৮	সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে নাকে ছিদ্র করা।	৭০
২৫৬	২৩৯	খাবারের মধ্যে পড়ে যাওয়া পোকামাকড়ের বিধান।	৭১
Part – 3 তৃতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ			
কিতাবুত তাহারাত – ৩য় খণ্ড			
পবিত্রতার প্রকারভেদ আলোচনা			
২৬০	২৪০	হাদাসের আভিধানিক অর্থ ও পরিভাষিক সংজ্ঞা দিন।	৭৪
২৬১	২৪১	হাদাসে আকবার কী?	৭৫

২৬২	২৪২	রাফউল হাদাস (হাদাস দূর করার পদ্ধতি) কী?	৭৫
২৬৩	২৪৩	হাদাসের কারণসমূহ কী?	৭৫
২৬৪		হাদাসে আকবারের কারণ: জানাবাত (সহবাস বা বীর্যপাতজনিত অপবিত্রতা), ঋতুস্রাব (হায়েয), নিফাস (প্রসূতি রক্তস্রাব) ইত্যাদি।	৭৫
২৬৫	২৪৪	অজু সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য দিন।	৭৫
২৬৬	২৪৫	অজুর সাধারণ ভুলত্রুটি (আখতা'উল উযূ) বর্ণনা করুন।	৭৫
২৬৭	২৪৬	অজুর আভিধানিক ও পরিভাষাগত অর্থ আলোচনা করুন।	৭৬
২৬৮	২৪৭	ওজুর ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ বলুন।	৭৬
২৬৯	২৪৮	অজুর সহিহ হওয়ার শর্তসমূহ আলোচনা করুন।	৭৭
২৭০	২৪৯	অজুর ফরজসমূহ (ওয়াজিবাত) উল্লেখ করুন।	৭৭
২৭১	২৫০	অজুর সুন্নতসমূহ উল্লেখ করুন।	৭৮
২৭২	২৫১	অজুতে বৈধ (মুবাহ) বিষয়সমূহ উল্লেখ করুন।	৭৯
২৭৩	২৫২	অজুতে অননুমোদিত (গায়র মাশরু') কাজসমূহ উল্লেখ করুন।	৭৯
২৭৪	২৫৩	অজু ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ (নাওয়াকিযুল উযূ) আলোচনা করুন।	৭৯
২৭৫	২৫৪	যেসব বিষয়কে অজু ভঙ্গকারী গণ্য করা হয় না, সেগুলো আলোচনা করুন।	৮০
২৭৬	২৫৫	কোন কাজের জন্য অজু ওয়াজিব?	৮১
২৭৭	২৫৬	কখন অজু করা শরীয়তসম্মত (মাশরু')?	৮১
২৭৮	২৫৭	অজুর সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি আলোচনা করুন।	৮২
২৭৯	২৫৮	অজু কোন ক্রমে করতে হবে ?	৮৩
২৮০	২৫৯	মাথা মাসাহ কীভাবে করতে হবে?	৮৩
২৮১	২৬০	কানের মাসাহ কীভাবে করতে হবে?	৮৪
২৮২	২৬১	কানের মাসাহ করার পদ্ধতি?	৮৪
২৮৩	২৬২	মাথা ও কান কি একই ভেজা হাতে মাসাহ করতে হবে, নাকি নতুন পানি নিতে হবে?	৮৫
২৮৪	২৬৩	ঘাড় মাসাহ করা কি প্রমাণিত?	৮৫
২৮৫	২৬৪	পাগড়ি ও মোজার ওপর মাসাহ করার অনুমতি আছে কি?	৮৫
২৮৬	২৬৫	পাগড়ির ওপর মাসাহের জন্য কি মোজার মতো পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা শর্ত?	৮৫
২৮৭	২৬৬	মোজার ওপর মাসাহ কীভাবে করতে হবে?	৮৬
২৮৮	২৬৭	জুতার ওপর মাসাহ করা যায় কি?	৮৭

২৮৯	২৬৮	অজু সমাপ্ত করার পরের দুআ কী?	৮৭
২৯০	২৬৯	অজুর পর লজ্জাস্থানের স্থানে পানি ছিটানো কেমন?	৮৭
২৯১	২৭০	দাঁড়িয়ে অজুর অবশিষ্ট পানি পান করা কি প্রমাণিত?	৮৭
২৯২	২৭১	অজুর পর আকাশের দিকে তাকানো বা শাহাদাতের আঙুল উঠিয়ে দুআ করা কি প্রমাণিত?	৮৮
২৯৩	২৭২	অজুর পর তোয়ালে, রুমাল বা কাপড় ব্যবহার করা কেমন?	৮৮
২৯৪	২৭৩	প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করা কি জরুরি?	৮৯
২৯৫	২৭৪	পবিত্র ও পরিষ্কার পানি কি অজুর শর্ত?	৮৯
২৯৬	২৭৫	নাবিয (খেজুর ভেজানো পানি) দিয়ে অজু করা কি বৈধ?	৯০
কিতাবুত তাহারাত – ৪র্থ খণ্ড			
২৯৮	২৭৬	অজু ভঙ্গকারী ও নষ্টকারী বিষয়সমূহ কী কী?	৯২
২৯৯	২৭৭	স্বাভাবিক পথ ছাড়া অন্য স্থান দিয়ে পেশাব বা পায়খানা বের হলে অজু ভঙ্গ হয় কি?	৯৩
৩০০	২৭৮	নারীর নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় কি?	৯৩
৩০১	২৭৯	অন্য কোনো পুরুষ বা নারীর লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় কি?	৯৪
৩০২	২৮০	পায়ুপথ (দুবুর) স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় কি?	৯৫
৩০৩	২৮১	দুই অণ্ডকোষ, উরুর সংযোগস্থল (যেখানে ময়লা জমে) এবং নিতম্ব স্পর্শ করলে কি অজু ভঙ্গ হয়?	৯৬
৩০৪	২৮২	চতুষ্পদ প্রাণীর লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে কি অজু ভঙ্গ হয়?	৯৬
৩০৫	২৮৩	ধর্মত্যাগ (ইরতিদাদ) করলে অজু ভঙ্গ হয় কি?	৯৬
৩০৬	২৮৪	অজু ভঙ্গকারীদের সংক্ষিপ্তসার দিন।	৯৮
৩০৭	২৮৫	মাযি ও ওয়াদি কী?	৯৮
৩০৮	২৮৬	পেশাবের ফোঁটা বের হলে অজু ভঙ্গ হয় কি?	৯৯
৩০৯	২৮৭	পেশাবের ফোঁটা থেকে কীভাবে বাঁচা যায়?	৯৯
৩১০	২৮৮	বায়ু নির্গমনের রোগ ও তার বিধান আলোচনা করুন।	১০০
৩১১	২৮৯	দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নির্গমন ও তার বিধান।	১০০
৩১২	২৯০	ঘুমালে কি অজু ভেঙে যায়?	১০১
৩১৩	২৯১	নামাজের মধ্যে ঘুমালে অজু ভাঙে কি?	১০১
৩১৪	২৯২	“গোঠ” (এক ধরনের গুটিয়ে বসা অবস্থায়) মেরে বসে ঘুমালে কি অজু ভঙ্গ হয়?	১০২
৩১৫	২৯৩	লজ্জাস্থানে হাত লেগে গেলে কি অজু ভঙ্গ হয়?	১০৪

৩১৬	২৯৪	পুরুষ ও নারী উভয়েই কি এই বিধানে সমান?	১০৪
৩১৭	২৯৬	ছোটো ছেলে-মেয়েদের লজ্জাস্থান স্পর্শের বিধান ?	১০৭
৩১৮	২৯৭	শিশুর কাপড় পরিবর্তন করার সময় যদি তার লজ্জাস্থানে হাত লেগে যায়, তাহলে কি আমার অজু ভঙ্গ হবে?	১০৮
৩১৯	২৯৮	উটের গোশত খেলে কি অজু ভেঙে যায়?	১০৯
৩২০	২৯৯	কোন কোন কারণে অজু ভেঙে যায় না?	১০৯
৩২১	৩০১	রক্ত বের হলে অজু ভেঙে যায় কি?	১১০
৩২২	৩০২	সারসংক্ষেপ আলোচনা করুন।	১১০
৩২৩	৩০৩	বমি করলে বা নাক দিয়ে রক্ত বের হলে কি অজু ভেঙে যায়?	১১২
৩২৪	৩০৪	বমি করলে কি অজু ভেঙে যায়?	১১২
৩২৫	৩০৫	স্ত্রীকে স্পর্শ করলে বা চুম্বন করলে কি অজু ভেঙে যায়?	১১৩
৩২৬	৩০৬	জানাজা কাঁধে বহন করলে কি অজু ভেঙে যায়?	১১৪
৩২৭	৩০৭	জোরে হাসলে (অট্টহাসি) কি অজু ভেঙে যায়?	১১৪
৩২৮	৩০৮	কোন কোন কাজের জন্য অজু ফরজ?	১১৫
৩২৯	৩০৯	কোন কোন ক্ষেত্রে অজু করা মুস্তাহাব?	১১৫
৩৩০	৩১০	প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করা কি ফরজ, নাকি মুস্তাহাব?	১১৫
৩৩১	৩১১	দুইবার সহবাসের মধ্যে অজু করা কি মুস্তাহাব?	১১৬
৩৩২	৩১২	সহবাসের পর ঘুমানোর আগে অজু করা কি মুস্তাহাব?	১১৬
৩৩৩	৩১৩	জানাবাত অবস্থায় পানাহারের আগে অজু করা কি মুস্তাহাব?	১১৭
৩৩৪	৩১৪	গোসলের আগে অজু করা কি মুস্তাহাব?	১১৭
৩৩৫	৩১৫	ঘুমানোর আগে অজু করা কি মুস্তাহাব?	১১৯
৩৩৬	৩১৬	ঘুমানোর জন্য অজুর বদলে শুধু হাত-মুখ ধোয়া কি যথেষ্ট?	১১৯
৩৩৭	৩১৭	কুরআন তিলাওয়াতের জন্য কখন অজু মুস্তাহাব এবং কখন ওয়াজিব?	১২০
৩৩৮	৩১৮	হায়েয অবস্থায় নারীর জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা কি জায়েজ?	১২০
৩৩৯	৩১৯	সমসাময়িক আলেমদের মতে হায়েয অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতের হুকুম কী?	১২১
৩৪০	৩২০	হায়েয অবস্থায় মুসহাফ (কুরআন শরীফ) স্পর্শ করা কি জায়েজ?	১২১
৩৪১	৩২১	অজু ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করা কি জায়েজ? আর “পবিত্র	১২১

		লোক” বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?	
৩৪২	৩২২	অজু ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার করা এবং সালাম দেওয়া ও সালামের জবাব দেওয়ার বিধান কী?	১২১
৩৪৩	৩২৩	অজু ছাড়া মুসহাফ স্পর্শ করে কুরআন পড়া কি জায়েজ?	১২২
৩৪৪	৩২৪	হিফজ করা শিশুদের জন্য অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শের হুকুম কী?	১২২
৩৪৫	৩২৫	অজু ভেঙে গেলে সাথে সাথে অজু করা কি মুস্তাহাব?	১২৩
৩৪৬	৩২৬	কা’বা তাওয়াফের জন্য অজু কি শর্ত?	১২৩
৩৪৭	৩২৭	হাদাসে আসগার (ছোটো নাপাকি) সম্পর্কিত কয়েকটি মাসআলা ও বিধান উল্লেখ করুন—পূর্ববর্তী বিস্তারিত আলোচনার আলোকে।	১২৪
৩৪৮	৩২৮	কী দিয়ে মিসওয়াক করা উত্তম? মিসওয়াক কি অবশ্যই কাঠের ডাল দিয়েই করতে হবে, নাকি দাঁত পরিষ্কার হওয়াই মূল উদ্দেশ্য?	১২৬
৩৪৯	৩২৯	মিসওয়াক সম্পর্কিত কিছু বিষয় আলোচনা করুন।	১২৬
৩৫০	৩৩০	মাসাহ (মোজার উপর মাসাহ) সংক্রান্ত কয়েকটি বিধান উল্লেখ করুন।	১২৭
৩৫১	৩৩১	যদি অজুর অঙ্গের উপর প্লাস্টার থাকে তাহলে কী করবেন?	১২৭
৩৫২	৩৩২	কৃত্রিম অঙ্গের উপর অজু করার বিধান কী?	১২৮
৩৫৩	৩৩৩	নাক বা কানে অলংকারের জন্য ছিদ্র করা কেমন?	১২৮
৩৫৪	৩৩৪	অজুর ফরজসমূহ সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করুন।	১২৮
সংক্ষিপ্ত কিতাবুত তাহারাহ- ৫ম খণ্ড			
حدث اكبر (বড়ো অপবিত্রতা) সম্পর্কিত বিধানসমূহ			
৩৫৭	৩৩৫	জানাবাতের গোসলের জন্য বীর্যপাত কি শর্ত?	১৩২
৩৫৮	৩৩৬	নারীরও কি স্বপ্নদোষ হয়?	১৩২
৩৫৯	৩৩৭	স্বপ্নদোষের চিহ্ন না থাকলে গোসলের বিধান কী?	১৩২
৩৬০	৩৩৮	নারীর গোসলে চুলের বেণী খোলার ব্যাপারে কী সুবিধা দেওয়া হয়েছে?	১৩২
৩৬১	৩৩৯	শরিয়তে জুনবি ব্যক্তির সাথে মেলামেশা, ওঠাবসা, লেনদেন, খাওয়া-দাওয়া কি নিষিদ্ধ?	১৩৩
৩৬২	৩৪০	জানাবাত অবস্থায় কোন কাজগুলো নিষিদ্ধ?	১৩৩
৩৬৩	৩৪১	হায়েযা ও জুনবি ব্যক্তির মসজিদে অবস্থান কি বৈধ?	১৩৪

৩৬৪	৩৪২	জুনবি ও হায়েযার জন্য কি কুরআন তিলাওয়াতের অনুমতি আছে?	১৩৪
৩৬৫		জুনবি ব্যক্তির জন্য মুসহাফ স্পর্শ করার বিধান কী?	১৩৪
৩৬৬	৩৪৩	হায়েয অবস্থায় নারীর কুরআন তিলাওয়াতের বিধান কী?	১৩৬
৩৬৭	৩৪৪	হায়েয নারীর জন্য মুসহাফ স্পর্শ করার বিধান কী?	১৩৬
৩৬৮	৩৪৫	হায়েয ও নিফাস অবস্থায় আল্লাহর জিকির করার বিধান কী?	১৩৬
৩৬৯	৩৪৬	সমসাময়িক ফতোয়ার আলোকে হায়েযা নারীর কুরআন তিলাওয়াতের বিধান কী?	১৩৬
৩৭০	৩৪৭	যে মোবাইল ফোনে কুরআন রয়েছে, তা অজু ছাড়া স্পর্শ করা এবং তা থেকে তিলাওয়াত করার বিধান কী?	১৩৬
৩৭১	৩৪৮	জুনবি ও হায়েয অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতের বিধান কী?	১৩৭
গোসলের বিধানসমূহ			
৩৭২	৩৪৯	গোসল ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ কী?	১৩৭
৩৭৩	৩৫০	কোন কোন সময়ে গোসল করা মুস্তাহাব?	১৩৮
৩৭৫	৩৫১	জুমার গোসল ও জানাবাতের গোসল — দুটর জন্য এক গোসল কি যথেষ্ট?	১৩৮
৩৭৬	৩৫২	গোসলের গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা করুন।	১৩৯
৩৭৭	৩৫৩	পবিত্রতা অবলম্বন না করলে কবরের শাস্তির সতর্কবার্তা	১৩৯
৩৭৮	৩৫৪	ফরজ ও সুন্নতের বিবেচনায় গোসলের প্রকারভেদ কী?	১৩৯
৩৭৯	৩৫৫	গোসলের আগে অজুর বিধান কী?	১৪০
৩৮০	৩৫৬	গোসল কি অজুর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়?	১৪০
৩৮১	৩৫৭	জানাবাত, হায়েয ও নিফাসের গোসল বা অন্যান্য গোসলের ক্ষেত্রে অজু কি শর্ত, নাকি মুস্তাহাব?	১৪০
৩৮২	৩৫৮	গোসলের ফরয ও আরকান (ওয়াজিবসমূহ) কী কী?	১৪১
৩৮৩	3৫৯	পূর্ণাঙ্গ গোসলের সুন্নত আমলসমূহ কী কী?	১৪২
৩৮৪	৩৬০	গোসলের মাকরূহ বিষয়সমূহ কী কী?	১৪৩
৩৮৫	৩৬১	সাধারণ গোসলের সুন্নত পদ্ধতি (ধাপে ধাপে)	১৪৪
৩৮৬	৩৬২	জানাবাত / হায়েয / নিফাসের গোসলের সুন্নতি পদ্ধতি বর্ণনা	১৪৫
৩৮৭	৩৬৩	জানাবাতের গোসলের সুন্নতি পদ্ধতি উল্লেখ করুন।	১৪৬
হায়েয, ইস্তিহাযা ও নিফাসের ৬৬টি মাসআলা			
৩৮৮	৩৬৪	নারীদের মধ্যে হায়েয কিভাবে শুরু হলো?	১৪৭
৩৮৯	৩৬৫	হায়েযের কারণ ও প্রেক্ষাপট কী?	১৪৮

৩৯০	৩৬৬	হায়েযের রক্তের রং কেমন হয়?	১৪৯
৩৯১	৩৬৭	হায়েয ও ইস্তিহাযার মধ্যে পার্থক্য কী?	১৪৯
৩৯২	৩৬৮	হায়েযের সময়সীমা কত?	১৪৯
৩৯৩	৩৬৯	হায়েয শুরু হওয়ার বয়স কত?	১৫০
৩৯৪	৩৭০	হায়েয (ঋতুস্রাব) বন্ধ হওয়ার বয়স কত?	১৫০
৩৯৫	৩৭১	তুহ্‌র (পবিত্রতার) সময়কাল কতদিন?	১৫১
৩৯৬	৩৭২	গর্ভাবস্থায় যে রক্ত আসে তার বিধান কী?	১৫১
৩৯৭	৩৭৩	পবিত্রতা চেনার লক্ষণ কী?	১৫১
৩৯৮	৩৭৪	হায়েযে দিন গণনা হবে, নাকি রক্তের উপস্থিতি?	১৫১
৩৯৯	৩৭৫	যদি হলদে, মলিন, বা কালো-হলদের মাঝামাঝি রং বা কেবল আর্দ্রতা দেখা যায়—তার হুকুম কী?	১৫১
৪০০	৩৭৬	যদি বয়স হায়েযের উপযুক্ত না হয়, তবুও রক্ত আসা শুরু হয়—হুকুম কী?	১৫১
৪০১	৩৭৭	যদি শুধু এক ফোঁটা রক্ত দেখা যায়, ধারাবাহিক না হয়—তাহলে কি তা হায়েয?	১৫২
৪০২	৩৭৮	হায়েযের রক্তের বৈশিষ্ট্য ও নামাজ-রোজার হুকুম উল্লেখ করুন।	১৫২
৪০৩	৩৭৯	হায়েযা নারীর জন্য কি নামাজ ও রোজার কাযা জরুরি?	১৫২
৪০৪	৩৮০	হায়েযে নামাজ না পড়ার কারণ কী?	১৫২
৪০৫	৩৮১	হায়েয অবস্থায় কী বৈধ, আর কী অবৈধ?	১৫২
৪০৬	৩৮২	হায়েয অবস্থায় রোযা রাখা কি জায়েয?	১৫৩
৪০৭	৩৮৩	হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা কি জায়েয?	১৫৩
৪০৮	৩৮৪	ঋতুবতী নারী কি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারে?	১৫৪
৪০৯	৩৮৫	হায়েযা নারী কি মসজিদে অবস্থান করতে পারে?	১৫৫
৪১০	৩৮৬	হায়েযা নারীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া যায় কিনা?	১৫৬
৪১১	৩৮৭	ঋতু বন্ধ করার ওষুধের হুকুম কী?	১৫৬
৪১২	৩৮৮	ঋতু চালু করার ওষুধের হুকুম কী	১৫৬
৪১৩	৩৮৯	মাগরিবের আগে ঋতু শুরু হলে রোযার হুকুম কী?	১৫৭
৪১৪	৩৯০	রমযানে ফজরের আগে পবিত্র হওয়া নারীর রোযার বিধান কী?	১৫৭
৪১৫	৩৯১	হায়েয ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়ার বিধান কী?	১৫৭
৪১৬	৩৯২	নামাযের সময় শুরু হওয়ার পর কোনো নারী হায়েযগ্রস্ত হলে	১৫৮

		এবং নামায ছুটে গেলে তার বিধান কী?	
৪১৭	৩৯৩	নামাজের সময় শেষ হওয়ার কয়েক মিনিট পূর্বে হায়েয শুরু হলে বিধান কী?	১৫৮
৪১৮	৩৯৪	রমযানে ফজরের পরে পবিত্র হওয়া নারীর রোযার হুকুম কী?	১৫৮
৪১৯	৩৯৫	রমযানের দিনে দিনের প্রথমাংশে রোজা অবস্থায় হায়েয শুরু হলে তার বিধান কী?	১৫৯
৪২০	৩৯৬	হায়েযগ্রস্ত নারীর কুরআন তিলাওয়াতের হুকুম কী?	১৫৯
৪২১	৩৯৭	অপবিত্র (জানাবত অবস্থায়) ব্যক্তি ও ঋতুবতী নারী কি কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন?	১৬০
৪২২	৩৯৮	হায়েয ও নিফাস অবস্থায় কুরআন ধরার ও স্পর্শ করার পদ্ধতি আলোচনা করুন।	১৬০
৪২৩	৩৯৯	হায়েযগ্রস্ত নারীর মসজিদে প্রবেশের বিধান কী?	১৬০
৪২৪	৪০০	হায়েযা স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর এক বিছানায় শোয়ার বিধান কী?	১৬১
৪২৫	৪০১	হায়েযগ্রস্ত নারীর সঙ্গে ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির বিধান কী?	১৬১
৪২৬	৪০২	হায়েয অবস্থায় তাওয়াফের বিধান কী?	১৬১
৪২৭	৪০৩	ঋতুবতী নারীদের দুআয় অংশগ্রহণ করার বিধান কী?	১৬২
৪২৮	৪০৪	তাওয়াফে ইফাযা সম্পন্ন করার পর যদি কোনো নারী ঋতুগ্রস্থ হয়ে যায়, তবে কি তার জন্য তাওয়াফে বিদা মাফ হবে?	১৬৩
৪২৯	৪০৫	ইহরামের গোসলের সময় হায়েযা নারী কি চুলের বেণী খুলবে?	১৬৩
৪৩০	৪০৬	পবিত্র হওয়ার পর হলদে বা মলিন রঙের স্রাবের হুকুম কী?	১৬৪
৪৩১	৪০৭	ঋতু বা নিফাস অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী নারীর জানাজার নামাজের পদ্ধতি কী?	১৬৪
৪৩২	৪০৮	হায়েয ও ইস্তিহাযার মধ্যে পার্থক্য কী?	১৬৪
৪৩৩	৪০৯	ইস্তিহাযা বলতে কী বোঝায়?	১৬৫
৪৩৪	৪১০	ইস্তিহাযার রক্তের বৈশিষ্ট্য কী?	১৬৫
৪৩৫	৪১১	ইস্তিহাযা অবস্থায় ইবাদতের বিধান কী?	১৬৫
৪৩৬	৪১২	ইস্তিহাযা কাকে বলে?	১৬৬
৪৩৭	৪১৩	নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ কত?	১৬৬
৪৩৮	৪১৪	৪০ দিনের মধ্যে রক্ত বন্ধ হয়ে আবার শুরু হলে কী হবে?	১৬৭
৪৩৯	৪১৫	গর্ভপাতের পর রক্তস্রাবের বিধান কী?	১৬৭
৪৪০	**প্রমাণপঞ্জী**		১৬৮

অনুবাদকের বক্তব্য

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد:

قال الله تعالى: ﴿**إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ**﴾ (سورة البقرة: ٢٢٢)

وقال سبحانه: ﴿**فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ**﴾ (سورة التوبة: ١٠٨)

ইসলাম এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা—যেখানে মানুষের অন্তর, আচরণ, সমাজ ও ইবাদত—সমস্ত কিছুকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। একারণেই ইসলামি শরিয়তে **"তাহারাত" বা পবিত্রতা** এমন একটি মৌলিক বিষয়, যার উপর বহু ইবাদতের শুদ্ধতা নির্ভরশীল। নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, তাওয়াফসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ আমল তাহারাত ব্যতীত সম্পূর্ণ হয় না। তাই ইসলামের শিক্ষা মানুষকে কেবল বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার দিকেই আহ্বান করে না; বরং হৃদয়, চরিত্র ও আমলের গভীর পবিত্রতার দিকেও আহ্বান জানায়।

এই মৌলিক বিষয়টিকে সামনে রেখে যুগে যুগে ইসলামের আলেমগণ তাহারাত সম্পর্কিত মাসআলা ও বিধানসমূহ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন এবং এ বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। সমসাময়িক যুগে সম্মানিত আলেম **শায়খ ড. হাফিয আরশাদ বাশির উমরি মাদানি (হাফিযাহুল্লাহ)** রচিত *"কিতাবুত তাহারাহ"* এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ, গবেষণাধর্মী ও সমৃদ্ধ গ্রন্থ। কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে তাহারাত সম্পর্কিত অসংখ্য মাসআলা এতে সুসংগঠিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

মূল গ্রন্থটি বিস্তৃত ও পাঁচ খণ্ডে রচিত। পাঠকদের সহজ অনুধাবনের সুবিধার্থে এর একটি **সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রশ্নোত্তর আকারে** প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সংক্ষেপে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই গ্রন্থে তাহারাতের মৌলিক ধারণা থেকে শুরু করে নাপাকি, পবিত্রতার বিধান, অজু, গোসল, মাসাহ, হায়েয, নিফাস এবং সংশ্লিষ্ট অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়েছে।

বাংলাভাষী পাঠকদের নিকট এই মূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডারের সুফল পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি এর বাংলা অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করি। মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ ও সহায়তায় দীর্ঘ অধ্যবসায়, অধ্যয়ন ও সতর্কতার মাধ্যমে প্রায় দুই শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী এই অনুবাদ সম্পন্ন করার তাওফিক লাভ করেছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি যেন মূল গ্রন্থের বক্তব্য, ভাব ও বৈজ্ঞানিক বিন্যাস যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ থাকে এবং বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সহজেই এর বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে পারেন।

এই অনুবাদ প্রচেষ্টার পেছনে আমার একমাত্র কামনা—বাংলাভাষী মুসলিম সমাজ যেন তাহারাতের বিধানসমূহ সহজভাবে জানতে পারে এবং দৈনন্দিন জীবনে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে। যদি এই সামান্য প্রচেষ্টা পাঠকের জ্ঞানার্জনে সহায়ক হয়, তাদের আমলের ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে এবং ইসলামি জীবনযাপনে সামান্যও উপকার বয়ে আনে—তবে এটিই হবে আমার জন্য পরম প্রাপ্তি।

তবে মানুষের প্রচেষ্টা কখনোই ত্রুটিমুক্ত নয়। এই অনুবাদের মধ্যে যদি কোনো ভুল, অসংগতি বা অপূর্ণতা থেকে থাকে, তবে তা একান্তই আমার সীমাবদ্ধতা ও অজ্ঞতার ফল। সম্মানিত আলেম, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর নিকট বিনীত অনুরোধ—তারা যদি সদয়ভাবে এসব ত্রুটি নির্দেশ করেন, তবে ভবিষ্যৎ সংস্করণে সংশোধনের সুযোগ হবে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে আন্তরিক দোয়া করি—তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, একে ইলমে নাফে' (উপকারী জ্ঞান) হিসেবে গণ্য করেন এবং এর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের উপকার সাধন করেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় পবিত্রতার পথে পরিচালিত করুন।

والله ولي التوفيق

অনুবাদক
আব্দুল হালিম বুখারি
তারিখ: ০৬/০৩/২০২৬

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাই। আমরা আমাদের অন্তরের অকল্যাণ ও কর্মের দোষত্রুটি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন, তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না; আর যাকে তিনি বিভ্রান্ত করেন, তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণকারীদের উপর অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

অতঃপর—

ইসলামি ফিকহের বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে *"কিতাবুত তাহারাহ"* (পবিত্রতার অধ্যায়) মৌলিক ও ভিত্তিগত মর্যাদা ধারণ করে। তাহারাহ ব্যতীত ইবাদতের অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। একারণেই প্রাচীন ও আধুনিক সকল ফিকহগ্রন্থে সালাত, যাকাত ও অন্যান্য ইবাদতের পূর্বে পবিত্রতার বিধানসমূহ বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পাঠকসমীপে নিবেদিত এই গ্রন্থ— *"মুখতাসার কিতাবুত তাহারাহ"*— মূলত প্রথম থেকে পঞ্চম খণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ, যা প্রশ্নোত্তর আকারে বিন্যস্ত।

গ্রন্থের পটভূমি

এই গ্রন্থটি ইলমি দলিল, ফিকহি পরিভাষা, বিধিবিধান এবং বিভিন্ন মাযহাবের তুলনামূলক আলোচনায় সমৃদ্ধ ছিল। এর মূল সংস্করণ বারোশত পৃষ্ঠাজুড়ে পাঁচ খণ্ডে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য পাঁচ খণ্ড পাঠ করা ও তার বিধানসমূহ অনুশীলন করা সহজ ছিল না।

সেই প্রেক্ষাপটে একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়, যাতে প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলো সহজেই জানা যায়। প্রত্যেক খণ্ডকে ২৫–৩০ পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এভাবে পাঁচ খণ্ডের সারসংক্ষেপ একত্রিত করে এক খণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং এটিকে ষষ্ঠ খণ্ড হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে।

সহজবোধ্যতা ও উপযোগিতার লক্ষ্যে এই খণ্ডটি ছাত্র-ছাত্রী, মসজিদের ইমামগণ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সাধারণ পাঠকের জন্য সরল ভাষায়, ধাপে ধাপে এবং প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে।

এই গ্রন্থ অনন্য এজন্য যে,

১. প্রাচীন ও আধুনিক মাসআলাগুলোকে একত্র করে সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
২. ফিকহি আলোচনা ধারাবাহিক ও শিক্ষামূলক ভঙ্গিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে।
৩. প্রশ্নোত্তর আকারে তাহারাহ-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে পাঠকদের সহায়তা করা হয়েছে।
৪. এটি কেবল ইলমি মহলের জন্য নয়, সাধারণ পাঠকদের জন্যও এক উৎকৃষ্ট দিকনির্দেশক— যা তাহারাহর মৌলিক নীতিমালা স্পষ্ট করে এবং ইবাদতের শুদ্ধতার জন্য অপরিহার্য শর্তসমূহ সহজ ভাষায় তুলে ধরে।

এইন গ্রন্থের উদ্দেশ্য:

আজকের বিশ্বে সরকার ও জনগণ উভয়েই পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সচেতন। সুসংগঠিত পরিচ্ছন্নতাকে কেবল সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং ঈমানের অংশ হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

এই গ্রন্থ দৈনন্দিন জীবনের নানা বিষয়— যেমন: পবিত্রতার বিধান, অজু, গোসল, হায়েয, নিফাস, ইস্তিহাযা, নাজাসাত, প্রাকৃতিক প্রয়োজনাদি সম্পাদনের আদব এবং সমসাময়িক চিকিৎসাবিষয়ক নতুন প্রশ্ন— সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার মাধ্যমে তুলে ধরেছে।

গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

- এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটি দারসে নিযামিয়ার ধাঁচে প্রস্তুত করা হয়েছে; কাজেই এটি কার্যত একটি ওয়ার্কবুকের মর্যাদা রাখে।
- প্রত্যেক পাঠ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা উচিত।
- "মাইন্ড ম্যাপ" প্রস্তুত করে হাদাস, নাজাসাত, অজু ও গোসলের পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্ট করা।
- ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- অজু ও গোসলের সঠিক পদ্ধতি, মোজার উপর মাসাহ ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।
- জুমার খুতবা বা দারসে তাহারাহকে এককালীন বিষয় হিসেবে নয়, বরং ধারাবাহিক সংস্কারমূলক কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা।
- পাঠ্যসূচিতে তাহারাহ অধ্যায়কে ব্যবহারিক অ্যাসাইনমেন্ট, ভিডিও/ডেমো এবং প্রশ্নপত্রসহ অন্তর্ভুক্ত করা।

নারীদের জন্য নির্দেশনা

- ঘরোয়া দীনী মাহফিল, মহিলা মাদরাসা ও মসজিদে নারীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণমূলক আসর আয়োজন করা।
- হায়েয, নিফাস ও ইস্তিহাযা-সংক্রান্ত ব্যবহারিক মাসআলাগুলোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা।

তরুণদের জন্য নির্দেশনা

- পবিত্রতার অভ্যাস গড়ে তোলা।
- স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অজুর উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- মোজার উপর মাসাহের বিধান জানা।
- সফরের সময় তায়াম্মুমের বিধান শেখা।

উপসংহার

তাহারাহর উদ্দেশ্য কেবল বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা নয়; এটি অন্তরের পরিশুদ্ধি ও খুশু অর্জনের পথ, এবং সালাতের শর্তসমূহ পূরণের ভিত্তি। যখন বান্দা অজু করে, তখন সে কেবল বাহ্যিক অপবিত্রতা দূর করে না; বরং অন্তরের কালিমাও ঝেড়ে ফেলে। গোসলের পর ইবাদতে যে প্রশান্তি ও হৃদয়ের প্রসারতা অনুভূত হয়, তা এই আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধিরই নিদর্শন। ইবাদতের সৌন্দর্য পবিত্রতার মৌলিক শর্তের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট দুআ করি— হে আল্লাহ! আমাদেরকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকে পূর্ণ পবিত্রতা দান করুন। আমাদের অন্তরসমূহকে ঈমানের আলোয় আলোকিত করুন। আমাদের আমলসমূহকে ইখলাসের অলংকারে সুশোভিত করুন। আমাদেরক সকল প্রকার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নাজাসাত থেকে হেফাজত করুন। আপনার অসীম রহমতে আমাদের ইবাদতসমূহ কবুল করুন। আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যাদের বাহ্য ও অন্তর উভয়ই পবিত্র।

আমীন।

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

ড. হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি
(আল্লাহ তাঁকে তাওফিক দান করুন)
৩০ নভেম্বর ২০২৫
১০ রজব ১৪৪৯ হিজরি

কিতাবুত তাহারাহ

(সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, প্রশ্নোত্তর আকারে)

পরিচিতি

এই গ্রন্থটি *কিতাবুত তাহারাহ*-এর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সমন্বিত সারসংক্ষেপ, যা সহজ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। মূল গ্রন্থটি একটি বিস্তৃত ও গবেষণাধর্মী রচনা, যা পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। এতে প্রমাণসমূহের প্রাচুর্য, বিভিন্ন ফিকহি মাযহাবের তুলনামূলক আলোচনা, ইমামগণের—বিশেষত চার ইমামের—অভিমত এবং সালাফি ফিকহগ্রন্থের সুদৃঢ় উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে।

দৃঢ় দলিল, গভীর ইলমি আলোচনা এবং মতপার্থক্যের বিস্তৃত পরিসর—এসব গুণের কারণে এই গ্রন্থ ফিকহি রচনাসমূহের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। বিস্তারিত দলিল ও আলোচনার কারণে গ্রন্থটি প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত হয়ে পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত সংস্করণের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেক পাঠকের পক্ষে এত বিস্তৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করা সহজ নয়। তাই সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থে, সহজ ভাষায় কেবল প্রাধান্যপ্রাপ্ত ও প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলো উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রতিটি খণ্ডকে প্রায় ২৫ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ, শিক্ষার্থী এবং নবীন পাঠকেরা সহজে শিখতে ও বুঝতে পারেন। যারা গবেষণামনস্ক, বিশদ আলোচনায় আগ্রহী এবং গভীর অধ্যয়নে অভ্যস্ত—তারা অবশ্যই মূল পাঁচ খণ্ডের বিস্তারিত গ্রন্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন। পক্ষান্তরে, নবীন শিক্ষার্থী, সাধারণ পাঠক এবং যারা বিশদ অধ্যয়নে অসুবিধা অনুভব করেন—তারা এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ থেকে শিক্ষার সূচনা করতে পারেন। তবে পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা, গভীরতা ও শক্তিশালী দলিলভিত্তিক আলোচনার জন্য বিস্তারিত মূল সংস্করণ অধ্যয়ন অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করি—তিনি যেন আমাদের উপকারী জ্ঞান দান করেন এবং সেই জ্ঞানের উপর আমল করার তাওফিক দান করেন। আমীন।

PART-1

প্রথম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

কিতাবুত তাহারাহ – প্রথম খণ্ড

(সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, প্রশ্নোত্তর আকারে)

প্রশ্ন : শায়খ ড. হাফিয আরশাদ বাশির উমরি মাদানি (হাফিযাহুল্লাহ)-এর রচিত **"কিতাবুত তাহারাহ"** গ্রন্থে কোন কোন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এই গ্রন্থে নামাযের **নয়টি শর্তের মধ্যে প্রথম দুটি শর্ত** সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যথা—

1. **নাপাকি দূর করা (إزالة النجاسة)** — যা নামাযের একটি শর্ত
2. **হাদাস দূর করা (رفع الحدث)** — যা নামাযের আরেকটি শর্ত

প্রশ্ন ১: তাহারাহ (الطهارة) শব্দের শাব্দিক অর্থ কী?

উত্তর ১: "الطهارة" শব্দটি আরবি **طَهُرَ – يَطْهُرُ** ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো— হায়েয, নিফাস ও অন্যান্য নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন করা।

প্রশ্ন ২: তাহারার বিপরীত কী?

উত্তর ২: তাহারার বিপরীত দুটি বিষয়—

1. **رجس (রিজস)**
2. **نجس (নাজাসাত / নাপাকি)**

হাদাস (বড়ো ও ছোটো)—এর সরাসরি সম্পর্ক শারীরিক নাপাকির সঙ্গে। আর "রিজস" শব্দটি ব্যবহৃত হয়— শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আমলগত অপবিত্রতার ক্ষেত্রে।

প্রশ্ন ৩: ফিকহি পরিভাষায় তাহারাতের সংজ্ঞা কী?

উত্তর ৩: তাহারাতের অর্থ হলো— পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা, অর্থাৎ- বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়া।

সাধারণত "তাহারাহ" শব্দটি নাপাকি দূর করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর শরিয়তের পরিভাষায় তাহারাহ-এর অর্থ অনেক ব্যাপক। তাহারাহ বলতে বোঝায়— বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার পবিত্রতা অর্জন।

ইমাম নবাবি (রহ.) বলেন—

أَمَّا الطَّهَارَةُ فِي اِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ فَهِيَ رَفْعُ حَدَثٍ أَوْ إِزَالَةُ نَجَاسَةٍ

"ফিকহবিদদের পরিভাষায় তাহারাহ হলো— হাদাস দূর করা অথবা নাপাকি অপসারণ করা।" — *(আল-মাজমু' শরহুল মুহাযযাব- ১/৭৯)*

প্রশ্ন ৪: তাহারাহ কত প্রকার?

উত্তর ৪: আলেমগণ তাহারাহকে দুই প্রকারে বিভক্ত করেছেন—

1. **মা'নবি (আত্মিক) তাহারাহ**
2. **হিসসি (শারীরিক) তাহারাহ**

প্রশ্ন ৫: মা'নাবি তাহারাহ কী?

উত্তর ৫: মা'নাবি তাহারাহ হলো—

1. শির্ক থেকে পবিত্র থাকা,
2. কবিরা গুনাহ থেকে পবিত্র থাকা,
3. হৃদয়ের ব্যাধি ও আত্মিক রোগ থেকে পবিত্র থাকা।

প্রশ্ন ৬: মা'নাবি তাহারাহ অর্জনের উপায় কী?

উত্তর ৬: এর উপায়সমূহ হলো—

- ঈমান
- তাকওয়া
- যাকাত
- সদকা
- নেক আমল
- কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ।

প্রশ্ন ৭: হিসসি (শারীরিক) তাহারাহ কী?

উত্তর ৭: ১। দৃশ্যমান নাপাকি দূর করে— শরীর, কাপড় ও নামাযের স্থান পবিত্র করা

২। বিধানগত নাপাকি হতে পবিত্রতা অর্জন। **হাদাসে আসগার বা ছোটো নাপাকি** (পেশাব-পায়খানা করা অথবা অজু ভেঙে যাওয়া) হলে শরীয়তসম্মত অজু বা তার স্থলাভিষিক্ত (তায়াম্মুম ইত্যাদি) দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয়। আর **হাদাসে আকবর / বড়ো নাপাকি** (জানাবাত, হায়েজ ও নিফাস) হলে শরীয়তসম্মত গোসল করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জিত হয়ে যায়।

প্রশ্ন ৮: হিসসি তাহারাহ অর্জনের উপায় কী?

উত্তর ৮: পবিত্র পানি, নাপাকি দূর করার শরিয়তসম্মত পদ্ধতি, শরিয়ত অনুমোদিত বিকল্প (যেমন: তায়াম্মুম)।

বিস্তারিত দেখুন—

- *শরহুল মুমতি' – ইবনু উসাইমিন, ১/২৬;*
- *বিদায়াতুল মুজতাহিদ – ইবনু রুশদ, ১/৭;*
- *আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু – যুহাইলি, ১/২৩৮।*

প্রশ্ন ৯: তাহারার গুরুত্ব কী?

উত্তর ৯:

১। পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক

"الطهور شطر الإيمان" — *(সহিহ মুসলিম: ২২৩)*

২। "لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ" (তাহারাহ ছাড়া নামায কবুল হয় না।) — *(সহিহ মুসলিম: ২২৪)*

৩। مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ (তাহারাহ নামাযের চাবিকাঠি।) — *(ইবনে মাজাহ: ২৭৫ – শায়খ আলবানি হাসিদটাকে সহিহ বলেছেন।)*

৪। রসূল ﷺ বলেন: "إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ" (আমি অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহর যিকর অপছন্দ করি।) — *(আবু দাউদ: ১৭ – শায়খ আলবানি হাসিদটাকে সহিহ বলেছেন।)*

প্রশ্ন ১০: কেন হাদাস দূর করা ও নাপাকি অপসারণের জ্ঞান অপরিহার্য?

উত্তর ১০: হাদাস দূর করা ও নাপাকি অপসারণের জ্ঞান অপরিহার্য হওয়ার কারণ হলো—

শরঈ তাহারাহ নামাযের চাবিকাঠি। অর্থাৎ শরিয়তসম্মত পবিত্রতা ছাড়া নামায আদায়ই সহি হয় না। (তাহারাহ ব্যতীত নামায গ্রহণযোগ্য নয়।)

তাহারাহ কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

নামাযের সহিহ হওয়ার জন্য হাদাস দূর করা ও নাপাকি অপসারণ—উভয়ই শর্ত। শরঈ তাহারাহ ব্যতীত কোনো নামাযই কবুল হয় না। অতএব অপবিত্র অবস্থায় আদায় করা নামায আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জানা ফরজ— কোন কোন অবস্থায় শরিয়তসম্মত গোসল ফরজ হয় এবং কোন কোন অবস্থায় শরিয়তসম্মত অজু ফরজ হয়।

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জানা অপরিহার্য— নাপাকি লাগার পর কীভাবে তাহারাহ অর্জন করা হয়, আর অজু ভেঙে গেলে কীভাবে পূর্ণ পবিত্রতা ফিরে পাওয়া যায়।

হাদাস ও নাপাকি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরজে আইন। প্রথমে এই জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক, তারপর সেই জ্ঞানের আলোকে আমল করাও আবশ্যক।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।"

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾

(সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ৬)

অনুবাদ:

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুইসহ হাত ধুয়ে নাও, মাথা মাসাহ করো এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধুয়ে নাও। আর যদি তোমরা জানাবাত অবস্থায় থাকো, তবে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করো (গোসল করো)।"

আরও বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

(সূরা আত-তাওবা, আয়াত ২৮)

অনুবাদ:

"হে মুমিনগণ! মুশরিকরা তো নিশ্চয়ই নাপাক। অতএব তারা যেন আর মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়।"

প্রশ্ন ১১: যারা তাহারাহ (পবিত্রতা) থেকে বিমুখ থাকে, তাদের পরিণতি কেমন হবে?

উত্তর ১১: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

"তারা উভয়েই কবরের আযাবে লিপ্ত ছিল। তবে বড়ো কোনো গুনাহের কারণে নয়। তাদের একজন প্রস্রাবের ছিটা থেকে সতর্ক থাকত না।" — *(সহিহ বুখারি: ২১৬)*

নোট:

কবরের আযাবের অন্যতম কারণ হলো— প্রস্রাবের নাপাকি থেকে বাঁচতে অবহেলা করা এবং তাহারাহ অর্জনে গাফিলতি।

প্রশ্ন ১২: তাহারাহ কাকে বলে?

উত্তর ১২: হাদাস ও নাজাসাত (নাপাকি) দূর করে পবিত্রতা অর্জন করাকেই তাহারাহ বলা হয়।

প্রশ্ন ১৩: নাজাসাত কাকে বলে?

উত্তর ১৩: "নাজাসাত" শব্দটি নাপাকির জন্য ব্যবহৃত হয়। হাদাস ও নাজাসাত—এই দু'টি শব্দ একত্রে ব্যবহার হলে বোঝায়—

নাজাসাত দুই প্রকার—

১. হিসসি (দৃশ্যমান) নাজাসাত

যার অস্তিত্ব কাপড়, শরীর অথবা নামাযের স্থানে থাকে এবং শরিয়তসম্মতভাবে অপসারণ না করা পর্যন্ত নামাযের জন্য বাধা হয়ে থাকে।

২. হুকমি নাজাসাত, যা মূলত হাদাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

প্রশ্ন ১৪: হাদাস কাকে বলে?

উত্তর ১৪: হাদাস বলতে বোঝায়— অজু ভেঙে যাওয়ার অবস্থা।

ফিকহি পরিভাষায় একে **"মানি' (বাধা)"** বলা হয়। যেসব আমলের শুদ্ধতার জন্য তাহারাহ শর্ত, সেসব আমলের সহিহ হওয়ার জন্য এই বাধা দূর করা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ১৫: হাদাস কত প্রকার?

উত্তর ১৫: হাদাস দুই প্রকার—

১. হাদাসে আকবর (বড়ো হাদাস)

যেমন— পুরুষের জানাবাত এবং নারীর হায়েয ও নিফাসের অবস্থা।

২. হাদাসে আসগর (ছোটো হাদাস)

যার কারণে অজু ভেঙে যায়। যেমন— প্রস্রাব, পায়খানা, বায়ু নির্গমন।

প্রশ্ন ১৬: নাপাক বস্তুসমূহের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

উত্তর ১৬:

১. মানুষের প্রস্রাব ও পায়খানা — *(সহিহ মুসলিম: ২৮৪)*

২. হায়েয ও নিফাসের রক্ত — *(সহিহ বুখারি: ২২৮, সহিহ মুসলিম: ৩৩৩)*

ইমাম নবাবি (রহ.) বলেন— "হায়েযের রক্ত নাপাক হওয়ার বিষয়ে উম্মাহর ইজমা রয়েছে।"

৩. শূকর

আল্লাহ তাআলা বলেন— ﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ *(সূরা আল-আন'আম: ১৪৫)* অর্থ: "অথবা শূকরের গোশত—নিশ্চয়ই তা নাপাক।"

প্রশ্ন ১৭: মানুষের শরীর থেকে বের হওয়া (হায়েয ও নিফাস ছাড়া) রক্তের বিধান কী?

উত্তর ১৭: যদি মানুষের শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়, অথবা কোনো হালাল পশুর রক্তে মানুষ আক্রান্ত হয় তাহলে অজু ভাঙে না এবং নামায বাতিল হয় না। কারণ, এই রক্ত নিজে নাপাক নয়। এর নাপাক হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। বরং এর পাক হওয়ার প্রমাণ বিদ্যামান। যেমন- সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তপাত অবস্থাতেও নামায আদায় করতেন। (সহি আবু দাউদ- ১/১৯৩।

হাসান বাসরি (রহ.) বলেন— وَمَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ

"মুসলমানরা তাদের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরার অবস্থাতেও নামায পড়তেন।" *(ফাতহুল বারি: ১/২৮১)*

এই মত গ্রহণ করেছেন— ইমাম বুখারি, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, ইমাম ইসহাক, ইবনু তাইমিয়া, ইবনু বায ও শায়খ আলবানি (রহিমাহুমুল্লাহ)। (তামামুল মিন্নাহ- পৃ. ৫২, আল-তা'লীকাত আল-রাযিয়া- ১/১১০)

প্রশ্ন ১৮: ওয়াদি (وَدْي) কী এবং এর বিধান কী?

উত্তর ১৮: ওয়াদি হলো— এক ধরনের ঘন, সাদা ও আঠালো তরল, যা সাধারণত প্রস্রাবের পর বের হয়।

এর বিধান হলো— এর কারণে গোসল ফরজ হয় না, তবে অজু ফরজ হয়।

প্রশ্ন ১৯: মাযি (مَذْي) কী এবং এর বিধান কী?

উত্তর ১৯: মাযি হলো— এক ধরনের পাতলা, সাদা ও আঠালো তরল, যা সহবাসের পূর্বে, সহবাসের কল্পনা বা ইচ্ছার সময় বিনা কামোত্তেজনায় বের হয়। অনেক সময় এর নির্গমনের টেরও পাওয়া যায় না।

এর বিধান হলো— এর কারণে গোসল ফরজ হয় না, তবে অজু ফরজ হয়। এ অবস্থায় ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হবে— সে তার লজ্জাস্থান ধুয়ে নেবে, তারপর অজু করে নেবে। আর যদি কেউ ওসওয়াসা (অকারণ সন্দেহ)-এর রোগে আক্রান্ত হয়, তবে সে কিছু পানি নিয়ে নিজের কাপড়ের উপরিভাগে লজ্জাস্থানের স্থানে ছিটিয়ে দেবে—এতেই সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। — *(সহিহ: ২৬৯, ফতোয়া: শায়খ ইবনু বায রাহ.)*

প্রশ্ন ২০: মাযির ক্ষেত্রে এক বা একাধিক হাতের তালু দিয়ে পানি ছিটানো কি যথেষ্ট?

উত্তর ২০: মাযি হলো— এমন আঠালো তরল, যা মানুষের থেকে যৌন উত্তেজনার প্রভাবে বের হয়, কিন্তু তা মানি (বীর্য) নয়। এর রং সাদা হয় এবং একে মাযি বলা হয়। এটি নাপাক, তবে এর নাপাকি হালকা।

এর বিধান হলো— ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান ও অণ্ডকোষ ধুয়ে নেবে, নামাযের জন্য অজু করবে, আর যদি উরু বা কাপড়ে কিছু লেগে যায়, তবে সেখানে শুধু পানি ছিটিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। অর্থাৎ, তা ধুয়ে কচলানোর প্রয়োজন নেই—কেবল পানি ছিটালেই হবে।

প্রশ্ন ২১: যে হালাল পশুকে শরিয়তসম্মতভাবে জবাই করা হয়নি, অর্থাৎ — যে হালাল পশু উঁচু স্থান থেকে পড়ে মারা গেছে, আঘাতে মারা গেছে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছে, অথবা শরিয়তবিরোধী পদ্ধতিতে মারা গেছে— তার গোশত ও চামড়ার বিধান কী?

উত্তর ২১: ওই পশু নাপাক, তার চামড়াও নাপাক। তবে চামড়া দাবাগ (চামড়া পাক করার প্রক্রিয়া) দেওয়ার পর পবিত্র হয়ে যায়। *(সহিহ মুসলিম: ৩৬৬)*

প্রশ্ন ২২: জীবিত হালাল পশুর শরীর থেকে কেটে নেওয়া কোনো অঙ্গের বিধান কী?

উত্তর ২২: জীবিত হালাল পশুর শরীর থেকে জীবিত অবস্থায় কেটে নেওয়া কোনো অঙ্গ নাপাক। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— "জীবিত পশু থেকে কেটে নেওয়া অঙ্গ মৃতেরই অন্তর্ভুক্ত।" *(সুনান তিরমিজি: ১৪৮০)*

প্রশ্ন ২২: মৃত পশুর চামড়া ছাড়া অন্যান্য অংশের (হাড়, লোম, শিং, নখ) বিধান কী?

উত্তর ২২: মৃত পশুর হাড়, লোম, শিং, নখ- এই সবকিছু পবিত্র, যদি সেগুলোর উপর লেগে থাকা নাপাকি পরিষ্কার করে ফেলা হয়। কারণ— এসব বস্তু নাপাক হওয়ার বিষয়ে কোনো বিশুদ্ধ দলিল নেই। ইমাম যুহরি (রহ.) বলেন— "সালাফে সালিহিন হাতির হাড় ব্যবহার করতেন।" *(বুখারি, মুআল্লাক ১/৩৪২; ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়া: ২১/১০০)*

প্রশ্ন ২৩: মরা মাছ ও পঙ্গপাল (টিড্ডি)-এর বিধান কী?

উত্তর ২৩: নাপাক হওয়ার বিধান থেকে দুটি মৃত প্রাণী ব্যতিক্রম— মাছ এবং পঙ্গপাল (টিড্ডি)। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ "আমাদের জন্য দুই ধরনের মৃত প্রাণী হালাল করা হয়েছে—মাছ ও পঙ্গপাল।" *(ইবনু মাজাহ; সহিহ: শায়খ আলবানি)*

প্রশ্ন ২৪: দাবাগা (চামড়া পাক করা)-এর মাধ্যমে কি প্রত্যেক পশুর চামড়া পবিত্র হয়ে যায়?

উত্তর ২৪: এই বিষয়ে আলেমদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে—

১. শূকর ও মানুষের চামড়া ছাড়া সব পশুর চামড়া দাবাগ দেওয়ার পর পবিত্র হয়ে যায়। — এটি হানাফি মাজহাবের মত। *(বদায়েউস সানায়ি – কাসানি)*

২. কুকুর ও শূকর ছাড়া সব পশুর চামড়া দাবাগার মাধ্যমে পবিত্র হয়। — এটি শাফেয়ি মাজহাবের মত। *(আল-মুহাযযাব)*

৩. শুধুমাত্র হালাল পশুর চামড়াই দাবাগার পর পবিত্র হয়। — এই মত গ্রহণ করেছেন ইবনু তাইমিয়া, ইবনু বায, ইবনু উসাইমিন (রহ.)।

৪. সব পশুর চামড়াই দাবাগার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে যায়। — এই মত পোষণ করেছেন যাহিরি, শাওকানি, সানআনি ও শায়খ আলবানি (রহ.)।

৫. কিছু আলেম বলেছেন— যদি বিকল্প হালাল বস্তু পাওয়া যায়, তবে হারাম পশুর চামড়া ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকা উত্তম।

প্রশ্ন ২৫: মৃত মানুষের বিধান কী?

উত্তর ২৫: মানুষ স্বয়ং নাপাক নয়। মানুষের শরীরের মূল অবস্থা পবিত্রতা। দলিল - ইবনু আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا "মুসলমান জীবিত অবস্থায়ও নাপাক নয়, মৃত্যুর পরেও নাপাক হয় না।"

ইমাম বুখারি (রহ.) ১২৫৩ নম্বর হাদিসের পূর্বে এই বর্ণনাটি নিশ্চয়তার ভাষায় (জাযম সিগা) উল্লেখ করেছেন। ইবনে আবি শায়বা "আল-মুসান্নাফ" (১১২৪৬)-এ মাওসূল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে আব্বাস (রাযি.) এই মতই পোষণ করতেন। ইমাম বাইহাকি (রহ.) 'আস-সুনানুল কুবরা' (১/৩০৬)-এ একে মারফু' হিসেবে উল্লেখ করে বলেন— প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত হলো, এটি মাওকূফ। ইবনু হাজার (রহ.) 'তাগলিকুত তা'লিক' (২/৪৬০)-এ এর সনদকে সহিহ বলেছেন। আর বলেন – এই হাদিসটি মাওকূফ। ঐ সূত্রেই হাদিসটি মারফূ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন: ইমাম নবাবি (রহ.)-এর 'আল-মাজমূ' (২/৫৬১)।

প্রশ্ন ২৬: প্রাণীদের প্রস্রাব ও গোবর (মল)-এর বিধান কী?

উত্তর ২৬: হালাল পশু— যাদের গোশত খাওয়া বৈধ— তাদের প্রস্রাব, গোবর ও মল নাপাক নয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত— হালাল পশু, মাছ, যেসব পাখি নখ দিয়ে শিকার করে না। দলিল — *(সহিহ বুখারি: ২৩৩; সহিহ মুসলিম: ১৬৭১)*

হারাম প্রাণী— যাদের গোশত খাওয়া বৈধ নয়— : যেসব পাখি নখর দিয়ে শিকার করে এবং যেসব জন্তু দাঁত/নখর দিয়ে আক্রমণ করে। তাদের মল নাপাক।

প্রশ্ন ২৭: পবিত্রতার মূলনীতি কী?

উত্তর ২৭: মূলনীতি হলো— সব কিছুই পবিত্র— যতক্ষণ না কোনো স্পষ্ট ও সহিহ দলিল দ্বারা তার নাপাক হওয়া প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন ২৮: হালাল পশুর নাড়িভুঁড়ির (ওড়ঝি/উড়ঝি) বিধান কী?

উত্তর ২৮: হালাল পশুর নাড়িভুঁড়ি শরীরে বা কাপড়ে লাগলে নামাযের বিশুদ্ধতার উপর কোনো প্রভাব পড়ে না। দলিল — *(সহিহ বুখারি: ২৪০; সহিহ মুসলিম: ৪৬৪৯; সুনান নাসাঈ: ৩০৬)* ইমাম নাসাঈ (রহ.) এই হাদিসের অধীনে অধ্যায় স্থাপন করেছেন— "যদি হালাল পশুর গোবর কাপড়ে লাগে।" — *(সুনান নাসাঈ, কিতাবুত তাহারাহ, অধ্যায় ১৯২)*

প্রশ্ন ২৯: কুকুরের কেবল লালা (আঁঠালো লালা) নাপাক, নাকি তার পুরো দেহ?

উত্তর ২৯: কুকুরের লালা নাপাক—এ বিষয়ে স্পষ্ট দলিল রয়েছে। এছাড়া তার দেহের সমস্ত অংশই নাপাক—এই মত গ্রহণ করেছেন ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.)। — *(মাজমূ' ফাতাওয়া: ২১/২১৬-২২০)*

প্রশ্ন ৩০: গাধার কি কেবল গোশত নাপাক, নাকি পুরো দেহ?

উত্তর ৩০: নোট: গাধার লেদ (বিষ্ঠা) নাপাক হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট নস (শরঈ দলিল) রয়েছে, তাই তা নাপাক। অধিকাংশ ফকিহ কিয়াসের ভিত্তিতে সব অখাদ্য প্রাণীর লেদকেও নাপাক বলেছেন। ১৩-তম মাসআলায় ইজমার উদ্ধৃতিসহ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

নোট: গাধার মাংস নাপাক, কিন্তু তার দেহ নিজে নাপাক নয়।

নোট: গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট (মুখ লাগা পানি/খাবার) পবিত্র। অনুরূপভাবে তাদের ঘামও নাপাক নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাগণ এগুলোতে আরোহণ করতেন; যদি তাদের দেহ নাপাক হতো, তবে তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হতো।

প্রশ্ন ৩১: জাল্লালাহ (الجلالة)—নাপাকখোর পশু—এর বিধান কী?

উত্তর ৩১: জাল্লালাহ বলা হয় সেই পশুকে, যে অধিকাংশ সময় নাপাকি ও মলমূত্র খেয়ে থাকে। এ ধরনের পশু— যতক্ষণ না তাকে বেঁধে রেখে পবিত্র খাদ্য খাওয়ানো হয়, ততক্ষণ তার গোশত খাওয়া ও দুধ পান করা নিষিদ্ধ। দলিল- ইবনু উমর (রাযি.) বলেন— نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا

"রাসূলুল্লাহ ﷺ নাপাকখোর পশুর গোশত খাওয়া ও তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।" *(সুনান আবু দাউদ: ৩৭৮৫; সুনান তিরমিজি: ১৮২৪)*

ব্যতিক্রম: কিছু আলেম পাখিকে এই বিধান থেকে ব্যতিক্রম করেছেন। *(বুখারি: ৫৫১৮; মুসলিম: ১৬৪৯)*

প্রশ্ন ৩২: যেসব পোকামাকড় ও প্রাণীর দেহে প্রবাহমান রক্ত নেই—তারা কি নাপাক?

উত্তর ৩২: যেসব প্রাণীর দেহে প্রবাহমান রক্ত নেই— যেমন: মাছি, পিঁপড়া, মশা, মাকড়সা- এরা পবিত্র। শায়খ ইবনু উসাইমিন (রহ.) এই মত পোষণ করেছেন।

প্রশ্ন ৩৩: বন্য প্রাণীদের শুধু গোশত নাপাক, নাকি তার পুরো দেহ?

উত্তর ৩৩: মূলনীতি হলো— তাদের দেহ পবিত্র— যতক্ষণ না নাপাক হওয়ার কোনো প্রমাণ না পাওয়া যায়।

এই বিষয়ে আলেমদের দুটি মত রয়েছে—

১। অপবিত্র। ২। পবিত্র। লাজনা দায়েমা দ্বিতীয় মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। (৫/৩৮০)

প্রশ্ন ৩৪: উল্লেখিত বিষয়গুলোর সারসংক্ষেপ বর্ণনা করুন।

উত্তর ৩৪: সঠিক ও বিশুদ্ধ মতানুসারে— সমস্ত জীবিত প্রাণীই পবিত্র, হোক তারা- খাওয়ার উপযোগী (হালাল), অথবা খাওয়ার অনুপযোগী (হারাম), অথবা হিংস্র প্রাণী, অথবা কীটপতঙ্গ ও সরীসৃপ। শুধু দুটি প্রাণী ব্যতিক্রম, যথা— কুকুর এবং শূকর। এই দুটি প্রাণী নিজ সত্তাগতভাবে নাপাক। وَاللهُ أَعْلَمُ (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত)।

প্রশ্ন ৩৫: উচ্ছিষ্ট বা অবশিষ্ট খাবারগুলোর মধ্যে কোনটি পবিত্র আর কোনটি অপবিত্র?

উত্তর ৩৫: (১) কুকুরের উচ্ছিষ্ট (লালা লাগা খাবার বা পানীয়) অপবিত্র। (সহিহ বুখারি: ১৭২, সহিহ মুসলিম: ২৭৯)

(২) গাধার উচ্ছিষ্ট অপবিত্র কি না? এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে—

প্রথম মত: গাধার উচ্ছিষ্ট নাপাক, কারণ হাদিসে এসেছে— ***فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجِسٌ*** *"নিশ্চয়ই তা অপবিত্র।"* — (সহিহ মুসলিম: ১৯৪০)

দ্বিতীয় মত

কিছু আলেম বলেছেন— গাধার উচ্ছিষ্ট পবিত্র, কারণ মানুষের মধ্যে এর ব্যবহার এতটাই ব্যাপক যে, তা থেকে বেঁচে থাকা কষ্টকর। এই মত অনুযায়ী—

সাধারণ ব্যাপকতার কারণে এটিকে ক্ষমাযোগ্য ধরা হয়েছে। وَاللهُ أَعْلَمُ (আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।)

(৩) শূকরের উচ্ছিষ্ট নাপাক। *(সূরা আল-আন'আম: ১৪৫)*

(৪) বন্য প্রাণীর উচ্ছিষ্ট পবিত্র, নাকি অপবিত্র?

এ ক্ষেত্রেও দুটি মত—

প্রথম মত: গবেষণাভিত্তিক মত অনুযায়ী, বন্য প্রাণীর উচ্ছিষ্ট নাপাক।

— *শায়খ আল-আলবানি (রহ.)*

দ্বিতীয় মত: বন্য প্রাণীর উচ্ছিষ্ট নাপাক নয়।

— *শায়খ ইবনু বায (রহ.)*

(৫) হালাল / খাদ্য প্রাণীর উচ্ছিষ্ট পবিত্র।

(৬) মানুষের উচ্ছিষ্ট

মানুষের উচ্ছিষ্ট পবিত্র— হোক সে মুসলমান পুরুষ বা নারী, অথবা অমুসলিম।

দলিল: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ "নিশ্চয়ই মুমিন নাপাক হয় না।" (সহিহ বুখারি: ২৮৩, সহিহ মুসলিম : ৩৭১)

নোট: অমুসলিম কারো খাবার বা পানিতে স্পর্শ করলে তা নাপাক হয়ে যায় না। ইবনে কাসির (রহ.) বলেন— আহলে কিতাবের খাবার হালাল হওয়ার দলিল বিদ্যমান।

নোট: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ

(আল্লাহর রাসূল ﷺ এক মুশরিক নারীর পানির মশক (পাত্র) থেকে অজু করেছিলেন।) (সহিহ বুখারি: ৩৪৪)

৭) বিড়ালের উচ্ছিষ্ট (মুখ লাগা পানি/খাবার) পবিত্র। (সুনানে আবু দাউদ: ৭৬ — শায়খ আলবানি এই হাদিসকে সহিহ বলেছেন)

প্রশ্ন ৩৬: বীর্য (মানি) কি পবিত্র?

উত্তর ৩৬: বীর্য পবিত্র। এই মত গ্রহণ করেছেন—ইবনু আব্বাস, ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আহমদ, ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ, দাউদ যাহিরি, ইবনু হাজম, ইবনু তাইমিয়া, ইবনু হাজার, ইবনু বায, শায়খ আল-আলবানি (রহিমাহুমুল্লাহ) এবং সৌদি আরবের স্থায়ী ফতোয়া বোর্ড।

প্রশ্ন ৩৭: মদ কি পাক?

উত্তর ৩৭: মদ মূলত পবিত্র, যতক্ষণ না অপবিত্রতার প্রমাণ না পাওয়া যায়, কারণ হারাম হওয়া মানেই সত্তাগত নাপাক হওয়া জরুরি নয়। — *শায়খ আল-আলবানি, শায়খ ইবনু উসাইমিন (রহ.)*

প্রশ্ন ৩৮: বমি কি নাপাক?

উত্তর ৩৮: বমির নাপাক হওয়ার পক্ষে কোনো সহিহ দলিল নেই। আর যেটি আছে, সেটি দুর্বল। একইভাবে থুথু, নাকের পানি, কফ— এগুলোর নাপাক হওয়ার কোনো দলিল নেই। অতএব এগুলো পবিত্র।

প্রশ্ন ৩৯: হায়েজগ্রস্ত নারী ও জুনবি ব্যক্তির ঘাম কি পবিত্র?

উত্তর ৩৯: হায়েজগ্রস্ত নারী ও জুনবি ব্যক্তির ঘাম পবিত্র। (সহিহ বুখারি, কিতাবুল গুসল — "জুনুবের ঘাম এবং মুসলমান নাপাক নয়" অধ্যায়; হাদিস: ২৮৩, ২৮৫; সহিহ মুসলিম: ৩৭১/৮২৪; সুনানে আবু দাউদ: ২৩১; সুনানে নাসাঈ: ২৬৯; সুনান ইবনে মাজাহ: ৫৩৪) উলামাদের এ বিষয়ে ঐকমত্য আছে যে, জুনবিরর দেহ পবিত্র এবং তার ঘামও পবিত্র। তার ঘাম কোনো কাপড়ে লাগলেও সেটিও পবিত্র।

প্রশ্ন ৪০: যে সব পশু-পাখি সাধারণত নাপাকি থেকে বাঁচে না, তাদের উচ্ছিষ্টের হুকুম / বিধান কী?

উত্তর ৪০: যে নাপাকি থেকে বাঁচা কঠিন — তা 'উমূমে বালওয়া' বা স্বল্প (সামান্য) হলে ক্ষমাযোগ্য। যেমন: ইঁদুর বিছানার উপর দিয়ে চলে যাওয়া বা মুরগির ঠোঁটে সামান্য নাপাকি লাগা; কারণ সামান্য সন্দেহ নিশ্চিত বিষয়কে নষ্ট করে না।

হানাফি, মালেকি ও হাম্বালি মাযহাবের মতে এদের উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। যেমন: ইঁদুর বা অবাধে ঘুরে বেড়ানো মুরগি; কারণ তারা নাপাকি থেকে বাঁচে না এবং ময়লা খোঁজে বেড়ায়। তবুও কেউ যদি তাদের উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে অজু করে তবে তা জায়েয — কারণ পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চয়তা আছে, আর নাপাকির ব্যাপারে শুধু সন্দেহ; আর নীতি হলো: সন্দেহ নিশ্চয়তার সমান হতে পারে না।

প্রশ্ন ৪১: নাপাকি দূর করার পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করুন।

উত্তর:

১) ধোয়া

২) মুছে ফেলা

৩) ঢেলে দেওয়া

৪) ছিটানো

৫) ঘষে তোলা

৬) পবিত্র মাটি/জমিনে চলাফেরা করে পরিষ্কার হওয়া

নোট: ইমাম শওকানি (রহ.) বলেন— নাপাকি দূর করার ক্ষেত্রে দলিল অনুসরণ করা জরুরি। যেখানে পানি দিয়ে ধোয়ার কথা এসেছে, সেখানে এমনভাবে পানি দিয়ে ধোয়া হবে যাতে রং, গন্ধ ও স্বাদ দূর হয়ে যায়। আর যেখানে ঢালা, ছিটানো, ঘষা বা জমিনে চলার কথা এসেছে, সেখানে সেভাবেই আমল করতে হবে। (আস-সায়লুল জাররার: ১/৪২)

প্রশ্ন ৪২: ইস্তিঞ্জা কীভাবে করতে হবে?

উত্তর ৪২: (১) পায়খানার পর পানি, পাথর বা অনুরূপ বস্তু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে হবে।

পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلَامٌ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ فَيَسْتَنْجِي بِهِ

(আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন— রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রয়োজনে বের হলে আমি ও আরেকজন বালক পানির পাত্র নিয়ে যেতাম; তিনি তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতেন।) (সহিহ বুখারি: ১৫০)

পাথর বা কাগজ দিয়ে ইস্তিঞ্জা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: «ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا أَوْ نَحْوَهُ، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ» فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ فِي طَرَفِ ثَوْبِي فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ.

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করছিলাম। তিনি প্রয়োজন (পায়খানা-পেশাব) সারতে বের হলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল চলার সময় এদিক-ওদিক না তাকানো। আমি তাঁর নিকটে পৌঁছালে তিনি বললেন: "আমার জন্য কিছু পাথর নিয়ে আসো, যাতে আমি তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে পারি।" এবং তিনি আরও বললেন: "হাড় ও গোবর আনবে না।" অতঃপর আমি আমার কাপড়ের প্রান্তে করে পাথর এনে তাঁর পাশে রাখলাম এবং সরে দাঁড়ালাম। তিনি কাজ শেষ করলে সেই পাথরগুলো দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলেন। (সহিহ বুখারি: ১৫৫, সহিহ মুসলিম: ২৬২)

ইস্তিদলাল (প্রমাণ গ্রহণের দিক):

উপরের হাদিসের সাধারণ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়— হাড় ও গোবর ব্যতীত পানি, পাথর এবং টিস্যু পেপার ইত্যাদি জিনিস দ্বারাও ইস্তিঞ্জা করা বৈধ।

(ইবনে তাইমিয়ার মাজ্‌মুউল ফাতাওয়া ২১/২০৫; আল-তাফাহ ১/২৫৬; আদ-দারারি আল-মুযীআ ১/৪০-৪১)

প্রশ্ন ৪৩: পেশাবের নাপাকি পরিষ্কার করার পদ্ধতি কী?

উত্তর ৪৩:

পেশাবের নাপাকি পরিষ্কার করার মূল ও সাধারণ পদ্ধতি হলো— পানি দিয়ে ধুয়ে নাপাকি দূর করা।

নোট (দুধপানকারী শিশু সংক্রান্ত):

যদি কোনো শিশু মায়ের দুধ ছাড়া অন্য কোনো খাবার খাওয়া শুরু না করে, তবে তার পেশাবকে হালকা নাপাকি গণ্য করা হবে। অতএব— এমন বালক শিশুর পেশাব লাগলে শুধু পানি ছিটিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট, ধুয়ে কচলানোর প্রয়োজন নেই।

দলিল

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ

হযরত আলি (রাযি.) থেকে বর্ণিত— "মেয়ে শিশুর পেশাব ধুতে হবে, আর ছেলে শিশুর পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট—যতক্ষণ না সে খাবার খাওয়া শুরু করে।" — *(সুনান আবু দাউদ: ৩৭৭, তিরমিজি: ৬১০, ইবনে মাজাহ: ৫২৫, তোহফাতুল আশরাফ: ১০১৩১, মুসনাদে আহমাদ: ১/৯৭)* শায়খ আল-আলবানি (রহ.) একে সহিহ (মাওকূফ) বলেছেন।

অপরপক্ষে মেয়ে শিশুর পেশাব ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। যদি পেশাব মাটিতে পড়ে যায়— তাহলে সেখানে পানি ঢেলে দেওয়াই যথেষ্ট। মাটি খুঁড়ে ফেলা বা অন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই। *(সহিহ মুসলিম: ২৮৪)*

প্রশ্ন ৪৪: জুতায় নাপাকি লাগলে কীভাবে পরিষ্কার করা হবে?

উত্তর ৪৪: জুতায় নাপাকি লাগলে— মাটিতে ঘষে পরিষ্কার করাই যথেষ্ট। *(সুনান আবু দাউদ: ৩৭১-৩৭২)*

ব্যাখ্যামূলক নোট:

নবী ﷺ-এর যুগে মসজিদগুলো ছিল কাঁচা মাটির, এবং জুতার তলাও সাধারণত খসখসে হতো। ফলে মাটিতে ঘষলেই নাপাকি দূর হয়ে যেত। বর্তমান সময়ে— মসজিদে কার্পেট/টাইলস থাকে আর জুতার তলায় নাপাকি আটকে যেতে পারে যা মাটির ঘষা লাগলে দূর হয় না, তাই আজ যদি কেউ জুতা পরে নামায পড়তে চায়, তবে সম্পূর্ণ পবিত্রতার নিশ্চয়তা অর্জন করা আবশ্যক। তবে খোলা মাঠ বা মরুভূমিতে পরিষ্কার জুতা পরে নামায পড়া যায়, যদি সেই জুতো পরে বসতে কোনো অসুবিধা না হয়। (আব্দুল জাব্বার, মহানবির নামায, ড. শাফিকুর রহমান)

প্রশ্ন ৪৫: ঋতুস্রাবের রক্ত কীভাবে পরিষ্কার করা হবে?

উত্তর ৪৫: ঋতুস্রাবের রক্ত পরিষ্কার করার পদ্ধতি—

- প্রথমে রক্ত ঘষে তুলে ফেলতে হবে,
- তারপর পানি, সাবান বা বরই পাতার পানি দিয়ে ধুতে হবে,
- প্রয়োজনে পুরো কাপড়ে পানি ঢেলে দেওয়া যাবে।

দলিল

হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন—

"আমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লাগলে, আমরা প্রথমে তা ঘষে তুলতাম, তারপর ধুয়ে নিতাম এবং সেই কাপড়েই নামায পড়তাম।" *(সহিহ বুখারি: ৩০৮)*

নোট: রক্ত ধোয়ার পর যদি রঙ, দাগ, হালকা চিহ্ন থেকে যায়— তাতে কোনো অসুবিধা নেই, তা ক্ষমাযোগ্য। *(নাইলুল আওতার: ১/৫০)*

শায়খ শাওকানি (রহ.) বলেন—

রক্তের দাগ থেকে যাওয়া ক্ষমাযোগ্য—এ বিষয়ে দলিল এসেছে হযরত খাওলা বিনতে ইয়াসার (রাযি.)-এর হাদিস থেকে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ قَالَتْ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ قَالَ يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ.

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত— খাওলা বিনতে ইয়াসার (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে একটি কাপড় ছাড়া আর কোনো কাপড় নেই, আর আমি হায়েজ অবস্থায়ও সেটিই পরি। আমি কী করব?" তিনি বললেন: "তুমি যখন পবিত্র হবে (হায়েজ বন্ধ হবে) তখন তা ধুয়ে নেবে, তারপর সেই কাপড়েই নামাজ পড়বে।" তিনি বললেন: "যদি রক্তের দাগ থেকে যায়?" তিনি বললেন: "রক্ত

ধুয়ে ফেলাই তোমার জন্য যথেষ্ট; এর চিহ্ন (দাগ) তোমার ক্ষতি করবে না।" (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুত তাহারাত, হাদিস: ৩৬৫; মুসনাদে আহমদ ২/৩৬৪, ৩৮০ প্রভৃতি)
বিভিন্ন হাদিস দ্বারা সমর্থিত হওয়ার কারণে এ হাদিসের অর্থ গ্রহণযোগ্য, যদিও এর সনদ ইবনে লাহিআর কারণে দুর্বল; কারণ এখানে বর্ণনাকারীদের মধ্যে চারজন আব্দুল্লাহ্‌র মধ্যে (আবাদিলা আরবাআ) কেউ নেই। তবে শায়খ আলবানি (রহ.) একে শাহেদ (সমর্থক বর্ণনা) থাকার কারণে হাসান বলে গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন ৪৬: মহিলাদের ঝুলে থাকা পোশাক নোংরা হলে কীভাবে পরিষ্কার হবে?

উত্তর ৪৬: যে পোশাক মাটিতে ঘষটে চলে, তার নোংরা পরবর্তী পরিষ্কার মাটি ঘষা খেয়ে নিজে থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। *(আবু দাউদ: ৩৭০)*

প্রশ্ন ৪৭: বীর্য (মানি) কীভাবে পরিষ্কার করা হয়?

উত্তর ৪৭:

عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَاحْتَلَمَ، فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাম্মাম ইবনে হারিস বলেন— আমি উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা.)-এর কাছে ছিলাম। আমার স্বপ্নদোষ হলো। তখন আয়িশা (রা.)-এর এক দাসী তাকে দেখল যে সে তার কাপড় থেকে জানাবাতের চিহ্ন ধুচ্ছে বা নিজের কাপড় ধুচ্ছে। সে বিষয়টি আয়িশা (রা.)-কে জানালে তিনি বললেন: "আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে (ঘষে) পরিষ্কার করতাম।" (সুনান আবু দাউদ: ২৮৮, সুনান তিরমিযি: ১১৬)

প্রশ্ন ৪৮: মৃত হালাল পশুর চামড়া কীভাবে পবিত্র হবে?

উত্তর ৪৮: মৃত হালাল পশুর চামড়া দাবাগ (চামড়া পাকানো) করার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে যায়।

দলিল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন— আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি— "যখন কোনো চামড়া দাবাগ দেওয়া হয়, তখন তা পবিত্র হয়ে যায়।" *(সহিহ মুসলিম: ৩৬৬)*

প্রশ্ন ৪৯: যদি ঘি বা তেলে ইঁদুর পড়ে যায়, তাহলে কী করতে হবে?

উত্তর ৪৯: যদি ইঁদুর ঘি-এর মধ্যে পড়ে মারা যায় এবং ঘি জমাট থাকে, তবে ইঁদুর ও তার চারপাশের অংশ ফেলে দিতে হবে। এরপর অবশিষ্ট ঘিতে যদি ইঁদুরের রং, স্বাদ ও গন্ধের কোনো প্রভাব না থাকে, তবে সেই ঘি ব্যবহার করা যাবে। ঘি বা তেলের হুকুম তাতে থাকা নাপাকির উপস্থিতির উপর নির্ভর করবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ

ইবনে আব্বাস (রা.) উম্মুল মুমিনীন মাইমুনা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন— রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সেই ইঁদুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যা ঘি-এর মধ্যে পড়েছিল। তিনি বললেন: "ওটিকে এবং তার চারপাশের অংশ ফেলে দাও, আর তোমাদের (বাকি) ঘি খাও।" (সহিহ বুখারি: কিতাবুল উযূ, হাদিস ২৩৫ — অধ্যায়: ঘি বা পানিতে নাপাকি পড়ে যায়)

প্রশ্ন ৫০: নাপাকির কারণে পরিবর্তিত পানির বিধান কী?

উত্তর ৫০: যদি পানির পরিমাণ বেশি হয় এবং নাপাকির রঙ, গন্ধ বা স্বাদ স্পষ্ট না হয়, তবে সে পানি ব্যবহারযোগ্য আর সেই ময়লা বের করে ফেলতে হবে। আর যদি নাপাকির প্রভাব স্পষ্ট থাকে তবে নাপাকি দূর না হওয়া পর্যন্ত সে পানি ব্যবহার করা যাবে না। *(ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়া: ২১/৩৮-৩৯)*

প্রশ্ন ৫১: কখন শুধু পানি দিয়েই পরিষ্কার করা ফরজ?

উত্তর ৫১: শুধু সেসব ক্ষেত্রে পানি ব্যবহার করা ফরজ যেখানে শরিয়ত স্পষ্টভাবে পানি ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে। অন্যথায় যে কোনো বস্তু যা নাপাকি দূর করতে সক্ষম তা ব্যবহার করা জায়েয। *(আল-ইখতিয়ারাত: শায়খ আল-আলবানি, আস-সায়লুল জাররার: শাওকানি)*

প্রশ্ন ৫২: নাপাকি দূর করার পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (দলিলসহ) দিন।

উত্তর ৫২:

অপবিত্রতা	অপবিত্রতা দূরীকরণ	প্রমাণসূত্র
ইস্তিঞ্জা	পানি দিয়ে ধোয়া	*সহিহ বুখারি: ১০৫*
	পাথর / ঢেলা / ইট দিয়ে পরিষ্কার করা	*সহিহ মুসলিম: ২৬২*
	কাগজ ও অনুরূপ বস্তু	*সহিহ বুখারি: ১৫৫*

	ব্যবহার হাদিসের সাধারণ অর্থ থেকে প্রমাণিত	
কাপড়ে বীর্য লাগলে	শুকিয়ে গেলে ঘষে তুলে ফেলা যাবে	*সহিহ মুসলিম: ২৮৮*
	পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা যাবে	*সহিহ বুখারি: ২২৯*
যে পাত্রে মদ বা শূকরের গোশত রান্না হয়েছে	যদি অন্য পাত্র পাওয়া যায় সেগুলোতেই খাওয়া-দাওয়া করবে। আর যদি অন্য পাত্র না পাওয়া যায় তাহলে সেই পাত্র পানি দিয়ে ধুয়ে, তারপর ব্যবহার করবে।	*সুনান আবু দাউদ: ৩৮৩৯*
কাপড়ে হায়েযের রক্ত লাগলে	রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "প্রথমে তা ঘষে ফেলো, তারপর পানি ঢেলে ধুয়ে নাও, তারপর সেই কাপড়েই নামায পড়ো।"	*সহিহ মুসলিম: ৬৭৫*
জুতায় নাপাকি লাগলে	মাটিতে বা ধুলায় ঘষে পরিষ্কার করাই যথেষ্ট।	*সুনান আবু দাউদ: ২৮৫*
কুকুর পাত্রে মুখ দিলে	পাত্রটি সাতবার ধুতে হবে, এর মধ্যে একবার মাটি দিয়ে।	*সহিহ বুখারি: ১৭২*
দুধপানকারী শিশুর পেশাব	মেয়েশিশু → ধুতে হবে ছেলেশিশু → পানি ছিটালেই যথেষ্ট	*সুনান আবু দাউদ: ৩৮৬*
মাটি নাপাক হলে	যে অংশ নাপাক হয়েছে—সেই অংশে পানি ঢেলে দিলেই পবিত্র হয়ে যাবে।	*সহিহ মুসলিম: ২৮৪*
পানীয়তে মাছি পড়লে	রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—"মাছিটিকে পুরোটা ডুবিয়ে দাও, তারপর ফেলে দাও। কারণ তার এক পাখায় রোগ,	*সহিহ বুখারি: ৩৩২০*

	আর অন্য পাখায় আরোগ্য রয়েছে।”	
স্বপ্নদোষ-এর কাপড়	মানুষ গোসল করবে আর কাপড়ের যে অংশে বীর্যের চিহ্ন থাকবে, সেই অংশ ধুয়ে ফেলবে আর কাপড়ে শুকিয়ে গেলে ঘষা যথেষ্ট।	বুখারি ২২৯
নাপাকি ধোয়ার সংখ্যা	শুধু কুকুরের লালা–এর ক্ষেত্রে সাতবার ধোয়ার বিধান আছে, প্রথমবার মাটি দিয়ে ধোয়া জরুরি। অন্যান্য নাপাকির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। মূল শর্ত হলো— নাপাকির রঙ, গন্ধ ও স্বাদ দূর হয়ে যাওয়া। সব নাপাকিকে কুকুরের উপর কিয়াস করা ভুল (قياس مع الفارق)।	
ইঁদুর ঘিতে পড়ে মারা গেলে	যদি ইঁদুর—ঘিতে পড়ে মারা যায় তাহলে ইঁদুর ও তার আশপাশের অংশ ফেলে দেবে। বাকি ঘি ব্যবহার করা যাবে।	*সহিহ বুখারি: ২৩৫*
নারীদের বোরকা, যার নিচের অংশ মাটিতে ঘেঁসে যায়	উম্মুল মু’মিনীন উম্মে সালমা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমি লম্বা আঁচল রাখি আর নাপাক জায়গায়ও চলি। উম্মে সালমা বলেন, রসূলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: পরবর্তী মাটি আগের ময়লা পরিষ্কার করে	আবু দাউদ ৩৮৩

	দেয়	

প্রশ্ন ৫৩: ইস্তিঞ্জার সংক্ষিপ্ত আদব বর্ণনা করুন

উত্তর ৫৩:

1. যদি পায়খানার জন্য নির্দিষ্ট স্থান না থাকে, তবে লোকালয় থেকে দূরে যাবে।
2. রাস্তা, ছায়াদার স্থান, বসার জায়গা ও পানির ধারে পায়খানা-প্রস্রাব নিষিদ্ধ।
3. স্থির পানিতে প্রস্রাব করবে না।
4. অসুস্থতা, ঠান্ডা বা প্রয়োজনে নির্দিষ্ট পাত্রে প্রস্রাব করা জায়েয।
5. মাটির কাছে যাওয়ার আগে কাপড় ওঠাবে না, যেন লজ্জাস্থান ঢাকা থাকে।
6. টয়লেটে ঢোকার সময় বাম পা রাখার সময় দোয়া পড়বে: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
7. পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করবে না।
8. প্রস্রাবের ছিটা থেকে শরীর ও কাপড় বাঁচাবে।
9. ডানহাতে ইস্তিঞ্জা করবে না।
10. পানি পাওয়া গেলে দিয়ে ইস্তিঞ্জা করবে।
11. শৌচাগার থেকে বের হওয়ার সময় বলবে — غفرانك
12. পায়খানার পর হাত মাটি বা সাবান দিয়ে অবশ্যই ধোবে।
13. বাধ্য হলে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়েয।
14. প্রয়োজন হলে ইউরিনাল পাত্রে প্রস্রাব করা বৈধ।
15. ইউরিনাল পাত্রের প্রস্রাব দ্রুত ফেলে দেবে।
16. প্রস্রাবের সময় সালাম করবে না এবং সালামের জবাবও দেবে না।
17. প্রস্রাবের সময় দেয়াল বা অন্য কোনোকিছুর আড়াল গ্রহণ করবে।
18. নামাজের আগে যদি পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন থাকে তবে আগে তা সারবে।
19. বাথরুমে প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ — যদি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকে।
20. ঘরে এটাচড বাথরুম বানানো বৈধ।
21. পায়খানা শেষে হাত দিয়ে মুখ ধোয়া উত্তম।
22. তাহারাত (গোসল-অজু) ডানহাত দিয়ে শুরু করবে।
23. তাহারাতে যথাসম্ভব পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করবে।
24. প্রস্রাবের সময় ডানহাতে নিজের লিঙ্গ ধরবে না, তবে প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা।

প্রশ্ন ৫৪: পায়খানার জন্য কত দূরে যাবে?

উত্তর ৫৪: পায়খানার জন্য জনবস্তি থেকে দূর বা মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে যাবে।

মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) বলেন — নবী ﷺ যখন পায়খানা বা প্রস্রাবের জন্য যেতেন, দূরে চলে যেতেন।

(আবু দাউদ: ১, তিরমিযি : ২০, নাসাঈ: ১৭, ইবনে মাজাহ: ৩৩১, মুসনাদ আহমদ: ৪/২৪৪, দারিমি: ৬৮৬, সিলসিলাতুস সাহিহা: ১১৫৯; শায়খ আলবানি হাদীদিটিকে হাসান সহিহ বলেছেন)

প্রশ্ন ৫৫: কোথায় পায়খানা-প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ?

উত্তর ৫৫: ১) রাস্তা, ছায়া ও মানুষের উপকারের স্থানে পায়খানা-প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ।

মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন:

اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ

"তিনটি অভিশপ্ত কাজ থেকে বাঁচো —পানির ঘাটে, মানুষের চলার পথে এবং ছায়ার স্থানে পায়খানা-প্রস্রাব করা।" (সুনান আবু দাউদ: ২৬)

২) স্থির পানিতে প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত — نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

(রাসূল ﷺ স্থির পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।) (সহিহ মুসলিম: ২৮১)

প্রশ্ন ৫৬: পাত্রে প্রস্রাব করা কি জায়েয?

উত্তর ৫৬: অসুস্থতা, ঠান্ডা বা কষ্টের কারণে পাত্রে প্রস্রাব করা বৈধ।

আয়িশা (রাঃ) বলেন — লোকেরা বলে নবী ﷺ মৃত্যুর সময় আলি (রাঃ)-কে বিশেষ ওসিয়ত করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি প্রস্রাবের পাত্র চেয়েছিলেন যাতে তাতে প্রস্রাব করেন; এর আগেই তাঁর দেহ ঢলে পড়ে এবং তিনি ইন্তিকাল করেন — আমি বুঝতেই পারিনি তিনি কাকে ওসিয়ত করেছেন। (নাসাঈ: ৩৩, বুখারি: ২৭৪১, মুসলিম: ১৬৩৬, ইবনে মাজাহ: ৬৪, মুসনাদে আহমাদ: ৬/৩২, শায়খ আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।)

প্রশ্ন ৫৭: পায়খানা বা পেশাবের সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দেওয়ার বিধান কী?

উত্তর ৫৭: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

“তোমাদের কেউ যখন পায়খানা বা পেশাবের জন্য যায়, তখন সে যেন কিবলার দিকে মুখ না করে এবং কিবলার দিকে পিঠও না করে; বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ করে।” *(সহিহ বুখারি: ১৪৪)*

এই নির্দেশ মদিনাবাসীদের জন্য ছিল; কারণ মদিনা থেকে কা’বা পশ্চিম দিকে অবস্থিত। যদি আমরা এই হাদিসের উপর আমল করি, তাহলে তা হবে রাসূল ﷺ–এর সরাসরি নির্দেশনা অনুযায়ী আমল।

শায়খ আল-আলবানি (রহ.)–ও এই মত গ্রহণ করেছেন যে— পায়খানা বা পেশাবের সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা যাবে না, হোক তা খোলা জায়গায় বা ঘরের ভেতরে।

দলিল

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

আবু আইয়ুব আল-আনসারি (রাযি.) থেকে বর্ণিত— “রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমরা যখন পায়খানা-পেশাবের জন্য যাও, তখন কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করো না; বরং পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করো।” *(সহিহ বুখারি: ৩৯৪, সহিহ মুসলিম: ২৬৪)*

নোট:

কিছু আলেম—যেমন ইমাম সানআনী (রহ.) ও ‘তুহফাতুল আহওয়াযী’–এর লেখক ইবনু উমর (রাযি.)–এর বর্ণিত হাদিসের ভিত্তিতে বলেছেন—

- খোলা জায়গায় → কিবলার দিকে মুখ/পিঠ করা নিষিদ্ধ
- ঘরের ভেতরে → অনুমোদিত।

দলিল (ঘরের ভেতরের ক্ষেত্রে)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

যরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন— কিছু লোক বলে যে, যখন তোমরা পায়খানার জন্য বসবে তখন কিবলার দিকে মুখ করবে না এবং বায়তুল মাকদিসের দিকেও করবে না। তখন আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বললেন— একদিন আমি আমাদের ঘরের ছাদের উপর উঠেছিলাম। তখন আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺদুইটি ইটের উপর বসে তাঁর প্রয়োজন সারছেন এবং তাঁর মুখ বায়তুল মাকদিসের দিকে ছিল। *(সহিহ বুখারি: ১৪৫, সহিহ মুসলিম: ২৬৬)*

প্রশ্ন ৫৮: পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচা কেন জরুরি?

উত্তর ৫৮: পেশাবের ছিটা থেকে কাপড় ও শরীরকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি, কারণ এর কারণে কবরের কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি এসেছে।

দলিল

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ»، ثُمَّ قَالَ: «بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.«

ইবনু আব্বাস (রাযি.) বলেন— "রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন: 'এই দুই ব্যক্তি শাস্তি পাচ্ছে—কিন্তু কোনো বড়ো গুনাহের কারণে নয়। তাদের একজন পেশাবের ছিটা থেকে সতর্ক থাকত না, আর অন্যজন চোগলখোরি করত।'" *(সহিহ বুখারি: ২১৬, সহিহ মুসলিম: ২৬২)*

প্রশ্ন ৫৯: যদি জামাআতের সময় হয়ে যায় অথচ পেশাব-পায়খানার চাপ থাকে, তবে কী করতে হবে?

উত্তর ৫৯: এমন অবস্থায়— প্রথমে নিজের প্রয়োজন সেরে নেবে, তারপর নামাযে অংশ নেবে।

দলিল

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْخَلَاءِ وَقَامَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ.

আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— "যখন নামাযের ইকামত হয়ে যায় এবং তোমাদের কারো পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন থাকে, তবে সে আগে নিজের প্রয়োজন সেরে নেবে।" *(সুনানে আবু দাউদ: ৮৮, তিরমিযি: ১৪২)*

প্রশ্ন ৬০: দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা কি জায়েয?

উত্তর ৬০: প্রয়োজনে (বাধ্য হলে) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়েয।

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا.

হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, অথবা তিনি বলেন: নবী ﷺ এক জাতির আবর্জনার ঢিবির কাছে এসে সেখানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছিলেন। (সহিহ বুখারি: ২৪৭১)

প্রশ্ন ৬১: গোসলখানায় প্রস্রাব করা যাবে কি?

উত্তর ৬১: গোসলখানায় প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ। عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ». قَالَ أَحْمَدُ: «ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ».

আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন নিজের গোসলখানায় প্রস্রাব না করে, তারপর সেখানে গোসল না করে।" ইমাম আহমদের বর্ণনায় আছে: তারপর সেখানে অজু না করে; কারণ অধিকাংশ কুমন্ত্রণা (ওয়াসওয়াসা) এ থেকেই সৃষ্টি হয়।" (সুনান আবু দাউদ: ২৭, সুনান তিরমিযি: ২১)

প্রশ্ন ৬২: ঘরে প্রয়োজন সারার জন্য 'Attached Bathroom' থাকা কি প্রমাণিত?

উত্তর ৬২: ঘরে প্রয়োজন সারার জন্য 'Attached Bathroom' থাকা প্রমাণিত। عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ.

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন— একদিন আমি আমাদের ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দুইটি ইটের উপর বসে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দেখলাম। (সহিহ বুখারি: ১৪৯)

'Attached Bathroom'-এর মাসআলায় শায়খ ইবনে বায (রহ.)-এর ফতোয়া: তাঁকে গোসলখানার ভিতরে অজু করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন— প্রয়োজন দেখা দিলে সেখানে অজু করতে কোনো অসুবিধা নেই (জায়েয)।

শায়খ ইবনু উসাইমিন (রহ.)-কে Attached Bathroom'-এ অজু করার ব্যাপারে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, কারণ সন্দেহ হয় যে অজু করার সময় নাপাকি শরীরে বা কাপড়ে লাগতে পারে— এ অবস্থায় তার হুকুম কী?

তিনি বলেন, মূলনীতি (الأصل) হলো— পবিত্রতা (তাহারাহ) অবশিষ্ট থাকে, যতক্ষণ না দেহ বা কাপড়ে নাপাকি লেগেছে—এ ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়।

প্রশ্ন ৬৩: ব্যবহৃত পানি (الماء المستعمل) কী?

উত্তর ৬৩: ব্যবহৃত পানি বলতে বোঝায়—"সেই পানি, যা ইতিপূর্বে ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন—অজুর অঙ্গসমূহ ধোয়ার সময় অথবা গোসলের সময় ব্যবহৃত পানি।" এই পানি নিজের মূল হুকুম অনুযায়ীই থাকে, অর্থাৎ— তাহির (পবিত্র) ও মুতাহ্হির (অন্যকে পবিত্রকারী)।

তবে শায়খ ইবনু বায (রহ.) বলেছেন— যদি কেউ সতর্কতামূলক পথ অবলম্বন করে ব্যবহৃত পানির সঙ্গে বেশি পরিমাণ পরিষ্কার পানি মিশায়, তবে এই ধরনের সতর্কতা বৈধ।

সেই পানির মুতাহ্হির (পবিত্রকারী) হওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ হাদিসবিশারদ তাঁর সঙ্গে একমত। তবে হানাফি আলেমগণ এই মতের বিরোধিতা করেছেন।

প্রশ্ন ৬৪: পবিত্র মিশ্রিত পানি কী?

উত্তর ৬৪: পবিত্র মিশ্রিত পানি বলতে বোঝায়— যে পানি কোনো পবিত্র বস্তুর সঙ্গে মিশে গেছে।

এটা তিন প্রকার—

(১) যে পানি পবিত্র, আর তার সঙ্গে কোনো পবিত্র বস্তু মিশে গেছে— তবুও সেটি পবিত্রই থাকে।

(২) কিন্তু যদি পানির মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে তাকে আর "পানি" (ماء مطلق) বলা যায় না, তাহলে সে ক্ষেত্রে পানি পবিত্র থাকবে, কিন্তু মুতাহ্হির (পবিত্রকারী) থাকবে না। যেমন: শরবত ইত্যাদি। তা পবিত্র, কিন্তু অজু বা গোসলের জন্য উপযোগী নয়।

(৩) পানিতে সামান্য আটা পড়ে গেলে, তার কারণে পানির পবিত্রতা ও পবিত্রকারী হওয়ার গুণ নষ্ট হয় না— অতএব সেই পানি দিয়ে অজু করা জায়েয।

প্রশ্ন ৬৫: কখন পানি নাপাক বলে গণ্য হবে?

উত্তর ৬৫: পানি নাপাক হওয়ার দুটি অবস্থা—

(১) নাপাকির কারণে যদি পানির তিনটি গুণের কোনো একটি পরিবর্তিত হয়ে যায়—স্বাদ, রং, গন্ধ, তবে সেই পানি নাপাক হবে— এ বিষয়ে ইজমা (সর্বসম্মত মত) রয়েছে।

(২) যদি কোনো জায়গা পানি ভর্তি থাকে আর নিশ্চিতভাবে জানা না যায়— পানি পবিত্র, নাকি নাপাক, তবে সে ক্ষেত্রে মূলনীতির দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে, অর্থাৎ— পানিকে পবিত্র বলেই গণ্য করা হবে। আর যদি পানির গুণ স্বাদ, রং, গন্ধ-এর মধ্যে কিছু বদলে যায় তবে তা নাপাক গন্য হবে।

দলিল:

হাদিস: বিরে বুযা'আর হাদিস "পানি পবিত্র — তাকে কোনো কিছু অপবিত্র করে না" — অর্থাৎ- যতক্ষণ পর্যন্ত পানির কোনো একটি গুণ (স্বাদ, রং বা গন্ধ) পরিবর্তিত না হয়।

অতএব বোঝা গেল, পানির একটি গুণও — অর্থাৎ স্বাদ, রং বা গন্ধ — পরিবর্তিত না হলে তা পবিত্র থাকবে। এর প্রমাণ বিরে বুযাআহ (বু'দাআহ কূপ)-এর হাদিসে রয়েছে:

عن أبي سعيد الخدري، أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم :أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الماء طهور لا ينجسه شيء

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো: আমরা কি 'বিরে বুদাআহ' কূপের পানি দিয়ে অজু করতে পারি? অথচ সেখানে ঋতুস্রাবের কাপড়, কুকুরের মৃতদেহ এবং দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস ফেলা হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "পানি পবিত্র; কোনো কিছুই তাকে অপবিত্র করে না।" (সুনান আবু দাউদ: ৬৬)

পানির গুণ — অর্থাৎ স্বাদ, রং ও গন্ধ — পরিবর্তিত হলে তা নাপাক হওয়ার হুকুম ইজমা (সম্মিলিত ঐকমত্য)-এর ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে। কারণ এ বিষয়ে যে হাদিস এসেছে তা দুর্বল হলেও অর্থটি সঠিক।

আবু উমামা বাহিলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه

"পানিকে কোনো কিছু নাপাক করে না, তবে এমন বস্তু ছাড়া যা তার গন্ধ, স্বাদ বা রঙের উপর প্রভাব বিস্তার করে।" (সুনান ইবনে মাজাহ: ৫২১)

এই হাদিসটি কুতুবে সিত্তার মধ্যে কেবল ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। এর সনদে রুশদায়ন ও রাশিদ ইবনে সা'দ দুজনই দুর্বল, তাই হাদিসটি সহিহ নয়; তবে আলেমদের এ বক্তব্যের উপর ইজমা রয়েছে — অর্থাৎ নাপাকি পড়লে যদি পানির গুণ পরিবর্তিত হয়, তবে তা নাপাক। শায়খ আলবাদি (রহ.) হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন।

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যা খোলা মাঠে থাকে এবং যেখানে হিংস্র পশু ও চতুষ্পদ জন্তু আসে-যায়। তিনি বললেন: "যখন পানি দুই কুল্লা (বড় পরিমাণ) হয়, তখন তা অপবিত্রতা বহন করে না।" (তিরমিযি: ৬৭, আবু দাউদ: ৬৩, নাসাঈ: ৫২, ইবনে মাজাহ: ৫১৭-৫১৮, মুসনাদ আহমদ ১/১২, ২৬, ৩৮, ১০৭, দারিমি: ৭৫৮, ইবনে মাজাহ : ২১৭ প্রভৃতি — আলবানি এটিকে সহিহ বলেছেন)

আবার "পানি পবিত্র — তাকে কোনো কিছু অপবিত্র করে না" — অর্থাৎ যতক্ষণ না তার কোনো গুণ (স্বাদ, রং, গন্ধ) পরিবর্তিত হয় — এই সীমাবদ্ধতাটি ইজমার ভিত্তিতে নির্ধারিত, যদিও এ বিষয়ে সরাসরি হাদিস দুর্বল; কিন্তু অর্থটি সর্বসম্মতভাবে সঠিক।

আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "পানি পবিত্র; কোনো কিছু তাকে অপবিত্র করে না।" (আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ, ইমাম আহমদ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।)[1]

ইবনে মাজাহ আবু উমামার হাদিস থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন: "তবে যা তার গন্ধ, স্বাদ ও রংকে পরিবর্তিত করে।" কিন্তু এর সনদ দুর্বল; এ বিষয়ে মূল ভিত্তি ইজমা।[2]
আর ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যখন পানি দুই কুল্লা হয়, তখন তা অপবিত্রতা বহন করে না।"[3]

প্রশ্ন ৬৬: কোন পানি পবিত্র এবং কোন পানি অপবিত্র?

উত্তর ৬৬: (১) দুই কুল্লার (দুই বড়ো মাটকা) কম পানি তখনই নাপাক হবে যখন পানির তিন গুণের (স্বাদ, রং, গন্ধ) যেকোনো একটি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ দুই কুল্লার কম পানির হুকুমও দুই কুল্লা পানির মতোই; কারণ নবী ﷺ বলেছেন: "পানি পবিত্র, কোনো কিছু তাকে অপবিত্র করে না..." এখানে দুই কুল্লার উল্লেখ এজন্য

---

[1] **সহিহ:** এ হাদিসটি ইমাম আহমদ তাঁর *মুসনাদ*-এ (১১২৫৭, ১১৮১৫, ১১৮১৮) বর্ণনা করেছেন;
আবু দাউদ — কিতাবুত তাহারাত, "বিরে বুদাআহ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে" অধ্যায় (৬৬-৬৭);
তিরমিযি — তাহারাত অধ্যায়সমূহ, "পানিকে কোনো কিছু নাপাক করে না" অধ্যায় (৬৬) — তিরমিযি বলেন: হাসান;
নাসাঈ — কিতাবুল মিয়াহ (পানির অধ্যায়), "বিরে বুদাআহের উল্লেখ" অধ্যায় (৩২৬);
শাইখ আলবানি *সহিহ আবু দাউদ*-এ একে সহিহ বলেছেন।

[2] **দুর্বল:** এটি ইবন মাজাহ বর্ণনা করেছেন — কিতাবুত তাহারাত ও তার বিধানসমূহ, "হাউজ (পানির ট্যাংক/পুকুর)" অধ্যায় (৫২১)।
শাইখ আলবানী *দঈফ ইবন মাজাহ*-এ একে দুর্বল বলেছেন।

[3] **সহীহ:** এটি ইমাম আহমদ *মুসনাদ*-এ (০৪৮০৩, ৫৮৫৫) বর্ণনা করেছেন;
আবু দাউদ — কিতাবুত তাহারাত, "কোন জিনিস পানি নাপাক করে" অধ্যায় (৬৩);
তিরমিযি — তাহারাত অধ্যায়সমূহ, "পানিকে কোনো কিছু নাপাক করে না" অধ্যায় (৬৭);
নাসাঈ — কিতাবুত তাহারাত, "পানির পরিমাণ নির্ধারণ" অধ্যায় (৫২);
ইবন মাজাহ — কিতাবুত তাহারাত ও তার বিধানসমূহ, "যে পরিমাণ পানি নাপাক হয় না" অধ্যায় (৫১৭, ৫১৮)।
শাইখ আলবানী *সহীহ আবু দাউদ*-এ একে সহীহ বলেছেন।

যে, যদি পানি এর কম হয় তবে দেখতে হবে — নাপাকি পড়ার ফলে পানির কোনো গুণ পরিবর্তিত হয়েছে কি না। এর অর্থ এই নয় যে দুই কুল্লার কম পানি স্পর্শমাত্রই নাপাক হয়ে যাবে। এ ব্যাখ্যা আবু সাঈদ খুদরি (রা.)-এর পূর্বোক্ত হাদিসের দ্বারা সমর্থিত।

(২) এটাও বোঝা যায় যে খুব অল্প পানি সাধারণত নাপাকি পড়লে দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায়; তাই অল্প পানি ফেলে দেওয়া উচিত এবং তা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উচিত। (মাজমু‘ ফাতাওয়া ইবনে বায ১০/১৬)

(৩) দুই কুল্লার কম পানির বিধান বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে বেশ মতভেদ আছে, যা এই সাধারণ গ্রন্থে বিস্তারিত আনা সম্ভব নয়; তাই বিস্তারিত গ্রন্থ বা বিশুদ্ধ আলেমদের কাছে জেনে নেওয়া উচিত।

(৪) বাতাস বা পানির স্রোতে ভেসে আসা পাতা, কাঠ, ময়লা ইত্যাদি পড়ে পানির রং পরিবর্তিত হলেও তা নাপাক হবে না; বরং তার মূল অবস্থা (পবিত্র ও পবিত্রকারী) বহাল থাকবে।

(৫) পানিতে জন্মানো উদ্ভিদ বা পানি পরিষ্কার করার কোনো বস্তু মেশানো হলে পানির পবিত্রতা নষ্ট হবে না।

(৬) মাটি মিশে পানির রং বদলে গেলে তাতেও পানি নাপাক হবে না; কারণ মাটিও পানির মতো পবিত্রকারী গুণ রাখে।

(৭) দুর্গন্ধযুক্ত বা অনেক দিন জমে থাকা পচা পানিকে “মা’ আজিন” বলা হয়। তবুও তা তার আসল অবস্থায় পবিত্র থাকবে, যতক্ষণ না তার প্রকৃত পবিত্রতা নষ্ট হয়। এ বিষয়ে ইবনুল মুনযির (রহ.) ইজমা (ঐকমত্য) উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন — এটিই অধিকাংশ আলেমের মত। এই বিষয়ে কারো মতভেদের কারণে এর বিধানের উপর কোনো প্রভাব পড়বে না।[4]

(৮) শরীরের কোনো অঙ্গে জাফরান বা আটা ইত্যাদি পবিত্র বস্তু লাগলে তা শরীরের পবিত্রতা নষ্ট করে না।

(৯) এ থেকেই বোঝা যায়, সাবান দিয়ে গোসল করলেও পবিত্রতা থাকে; যেমন সাহাবীদের যুগে ব্যবহৃত “খতমি” উদ্ভিদ দিয়ে গোসল করার অনুমতি ইবনে মাসউদ (রা.) দিয়েছেন।[5]

[4] আল-মুগনি: ১৪/১, আল-ইজমা: ৪।

[5] ইবনে আবি শায়বাহ: ১/১৭।

(১০) সূর্যের তাপে গরম করা পানি, সোলার সিস্টেমে গরম করা পানি বা বিদ্যুৎচালিত হিটার দিয়ে গরম করা পানি — সবই পবিত্র ও পবিত্রকারী। উমর (রা.) ও ইবনে উমর (রা.) গরম করা পানি দিয়ে গোসল করেছিলেন।[6]

(১১) জমজমের পানি দিয়ে অজু করা জায়েয।

(১২) নিম্নোক্ত পানিসমূহ পবিত্র:

- সমুদ্রের পানি — "তার পানি পবিত্র"
- নদী ও ঝর্ণার পানি (সূরা আনফাল ১১)
- কূপের পানি (বিরে বুযাআহ ও বিরে হা'এর হাদিস)
- বৃষ্টির পানি (সূরা ফুরকান ৪৮)
- বরফ ও শিলাবৃষ্টি গলে হওয়া পানি

(১৩) মূলনীতি হলো — পানি পবিত্র। যদি পবিত্রতা নিয়ে সন্দেহ হয় তবে মূল অবস্থার দিকে ফিরে তাকে পবিত্রই ধরা হবে যতক্ষণ না নিশ্চিত নাপাকি প্রমাণিত হয়। (ইবনে উসাইমিন, শায়খ সা'দি — আল-কাওয়ায়েদুল ফিকহিয়্যাহ)

প্রশ্ন ৬৭: যদি পানির নাপাকি দূর হয়ে যায় তবে তার হুকুম কী?

উত্তর ৬৭: যদি পানিতে প্রচুর পরিমাণ পরিষ্কার পানি মেশানো হয়, অথবা তা নিজে নিজে পরিষ্কার হয়ে যায়, অথবা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এতটাই বিশুদ্ধ করা হয় যে স্বাদ-রং-গন্ধে নাপাকির কোনো প্রভাব না থাকে এবং পানি তার মূল অবস্থায় ফিরে আসে — তবে সেই পানি পবিত্র। ফিকহের পরিভাষায় একে বলা হয় "ইস্তিহালা" (রূপান্তর হয়ে পবিত্র হওয়া)।

(১৫) আলেমদের মতে ইস্তিহালার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য।[7]

[6] দারা কুতনি: ১/৩৭, ইরওয়ালুল গালিল: ১৭।

[7] ইবনে হাযম- মুহাল্লা: ১/১৬৬, ইবনে তাইমিয়া- আল-ফাতাওয়া আল-মিসরিয়া: পৃ. ১৯

PART-2
দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

কিতাবুত তাহারাহ – দ্বিতীয় খণ্ড

সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রশ্নোত্তর আকারে

প্রশ্ন ৬৮: "ফিতরাত" শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?

উত্তর ৬৮: "الفِطرة" শব্দের বহু অর্থ রয়েছে; যেমন — জন্ম, সৃষ্টি, সূচনা, আরম্ভ, উদ্ভাবন (নতুনভাবে গঠন করা) ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৬৯: ফিতরাতের পরিভাষাগত (শরঈ) অর্থ কী?

উত্তর ৬৯: ইমাম ইবনে হাজর (রহ.) বলেন: এর অর্থ হলো — "ফিতরাত" বলতে নবীগণের সুন্নতসমূহকে বোঝানো হয়েছে। কিছু আলেম বলেন — এর দ্বারা 'দ্বীনুল ফিতরাহ' অর্থাৎ ইসলাম ধর্মকে বোঝানো হয়েছে, কারণ ইসলামই মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। (ফাতহুল বারি, ইবনে হাজর: ১০/৩৩৭)

প্রশ্ন ৭০: সুনানুল ফিতরার সংখ্যা কত?

উত্তর ৭০: ইমাম ইবনে হাজর আসকালানি (রহ.) ইবনুল আরাবি (রহ.)-এর উল্লেখিত সংখ্যার কথা উল্লেখ করে বলেন: ইবনুল আরাবি (রহ.) বলেছেন — সুনানুল ফিতরার সংখ্যা ত্রিশ (৩০) পর্যন্ত পৌঁছায়। কিন্তু যদি তিনি বিশেষভাবে "ফিতরাত" শব্দসহ বর্ণিত সুন্নতগুলো বোঝান, তবে তাঁর কথা সঠিক নয়। আর যদি সাধারণ স্বভাবজাত কাজগুলো বোঝান, তবে সংখ্যা ত্রিশেরও বেশি হয়ে যায়। তবে সর্বনিম্ন সংখ্যা তিন (৩) পর্যন্তও বর্ণিত হয়েছে — যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর হাদিসে এসেছে। (ফাতহুল বারি: ১০/৩৩৭, কিতাবুল লিবাস, বাব: গোঁফ কাটা)

প্রশ্ন ৭১: ফিতরাতসংক্রান্ত হাদিসসমূহ বর্ণনা করুন

উত্তর ৭১: আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) বর্ণনা করেন যে, উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা.) বলেন — আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন: "দশটি জিনিস ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত।"

১) গোঁফ ছোটো করা

২) দাড়ি বড় করা

(৩) মিসওয়াক করা

(৪) নাকে পানি দেওয়া

(৫) নখ কাটা

(৬) আঙুলের গিরা পরিষ্কার করা

(৭) বগলের লোম তুলে ফেলা

(৮) নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা

(৯) পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা

(১০) কুলি করা।

হাদিসগ্রন্থসমূহে সুনানুল ফিতরার সংখ্যা সম্পর্কে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস পাওয়া যায়। উপরের হাদিসগুলো থেকে বোঝা যায় — ফিতরাতের সুন্নতসমূহ মোট এগারোটি (১১)। তবে এর সংখ্যা নিয়ে আলেমদের বিভিন্ন মত রয়েছে। অধিকাংশ আলেম এগুলোর সংখ্যা ১০ বলেছেন; কেউ কিছু বেশি এবং কেউ কিছু কম বলেছেন।

ইমাম নবাবি (রহ.) লিখেছেন: নবী ﷺ-এর বাণী "ফিতরাত দশটি" — এর অর্থ হলো, বড়ো ও প্রধান সুন্নতগুলো দশটি। এটি তাঁর উক্তি "হজ্জ হলো আরাফা"-এর মতো; অর্থাৎ হজ্জ শুধু আরাফাতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার মূল অংশ আরাফা।

অতএব ফিতরাতের সুন্নত দশটিতে সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রমাণ হলো — সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় দশটি উল্লেখ আছে কিন্তু তাতে খতনার উল্লেখ নেই। (আল-মাজমূ' শরহুল মুহাযযাব ১/১৮৪-১৮৫, কিতাবুত তাহারাত, বাবুস সিওয়াক)

প্রশ্ন ৭২: সুনানুল ফিতরার কী কী হিকমত আছে?

উত্তর ৭২: এই স্বভাবজাত সুন্নতগুলো অনুসরণ করলে বহু দুনিয়াবি ও দ্বীনি উপকার লাভ হয়। যেমন—

- চেহারা ও দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়
- শরীরের পূর্ণ পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়
- বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় পবিত্রতা সংরক্ষিত থাকে
- মানুষের সাথে মেলামেশায় দুর্গন্ধ ইত্যাদি কষ্ট থেকে অন্যদের রক্ষা করে উত্তম আচরণ করা হয়
- অগ্নিপূজক, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মূর্তিপূজকদের রীতির বিরোধিতা করা হয়
- শরীয়তের আদেশ মানা হয়
- আল্লাহর বাণী: "তিনি তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন" — এর বাস্তব অনুসরণ হয়। কারণ এই স্বভাবজাত গুণগুলো মানার মধ্যে উক্ত আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। যেন বলা হচ্ছে— তোমাদের অবয়ব যখন সৌন্দর্য ও শোভায় ভূষিত, তখন তাকে কুৎসিত ও বিকৃত করে এমন কাজ দ্বারা নষ্ট করো না; বরং এমন কাজের প্রতি যত্নবান হও, যাতে তার সৌন্দর্য স্থায়ী থাকে।

- এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে মর্যাদা, উচ্চচিন্তা এবং কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসা ও সান্নিধ্য সংরক্ষিত থাকে। কেননা কোনো ব্যক্তি যখন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন অবয়বে মানুষের সামনে উপস্থিত হয়, তখন সে মানুষের মনে আনন্দ ও প্রশান্তির বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়; তার কথা গ্রহণ করা হয় এবং তার মতামত প্রশংসিত হয়। আর যদি সে এসব গুণের প্রতি খেয়াল না রাখে, তবে এর বিপরীত ফল দেখা দেয়। (ফাতহুল বারি, ইবনে হাজর ১০/৩৩৭)

প্রশ্ন ৭৩: খতনা ফরজ, নাকি সুন্নত?

উত্তর ৭৩: এ বিষয়ে আলেমদের মতভেদ রয়েছে —

(ক) খতনা ওয়াজিব।

ইমাম নবাবি (রহ.) বলেন — আমাদের মতে পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য খতনা ওয়াজিব; এবং অধিকাংশ সালাফের মতও এটিই। (আল-মাজমূ' ১/৩০০)

(খ) খতনা সুন্নত

ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.) বলেন — ইসলামের ফিতরাত দশটি; তার একটি খতনা। এটি পুরুষের জন্য সুন্নত এবং নারীর জন্য সম্মানজনক কাজ। ইমাম মালিক থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। (আল-কাফি- পৃষ্ঠা ৬১২)

প্রশ্ন ৭৪: খতনার ফজিলত ও গুরুত্ব কী?

উত্তর ৭৪: প্রথম দলিল — কুরআন

"তারপর আমি আপনার প্রতি ওহি পাঠালাম যে, আপনি ইবরাহিমের দ্বীন অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।" (সূরা নাহল ১৬:১২৩)

অতএব খতনা মিল্লাতে ইবরাহিমের একটি বড় নিদর্শন। কারণ সকল নবীর পিতা ইবরাহিম (আ.) সর্বপ্রথম নিজেই নিজের খতনা করেছিলেন। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: "নবী ইবরাহিম (আ.) আশি বছর বয়সে 'কাদূম' নামক যন্ত্র দ্বারা নিজের খতনা করেছিলেন।" (সহিহ মুসলিম ২৩৭০, সহিহ বুখরি ৩৩৫৬)

খতনা ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ও সুন্নতে ইবরাহিম। ইসলাম ছাড়া ইহুদিদের মধ্যেও এটি ধর্মীয় রীতি; তবে খ্রিস্টানদের মধ্যে কেবল কিছু অর্থডক্স গির্জায় অনুমতি আছে — কিন্তু তাদের ধর্মে এটি বাধ্যতামূলক অংশ নয়।

প্রশ্ন ৭৫: "ক্বাসসুশ শারিব"-এর আভিধানিক অর্থ কী?

উত্তর ৭৫: "قص" অর্থ — কাটা, ছাঁটা, ঘষা, শেভ করা। "الشارب" অর্থ — গোঁফ।
আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলি আল-ফাইয়ূমি (রহ.) বলেন: গোঁফ হলো সেই লোম, যা উপরের ঠোঁটে জন্মে মুখের উপর ঝুলে থাকে। (আল-মিসবাহ আল-মুনির ফি গারিব আশ-শারহিল কাবির: ১/৩০৮)

প্রশ্ন ৭৬: গোঁফ বড়ো করা কার নিদর্শন?

উত্তর ৭৬: গোঁফ বড়ো করা মুশরিকদের নিদর্শন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত — নবী ﷺ বলেছেন: "তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো — দাড়ি বাড়াও এবং গোঁফ ছোটো করো।" (সহিহ বুখারি: ৫৮৯২)

গোঁফ বড়ো করা মাজুস (অগ্নি-উপাসক)দের নিদর্শন। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন: "গোঁফ ছোটো করো, দাড়ি ঝুলিয়ে দাও এবং মাজুসদের বিরোধিতা করো।" (সহিহ মুসলিম ২৬০)

প্রশ্ন ৭৭: গোঁফ কাটা উচিত, নাকি শেভ করা?

উত্তর ৭৭: এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে।

- কেউ বলেন: কাটা উত্তম
- কেউ বলেন: শেভ করা উত্তম

শায়খ আলবানি (রহ.) উমর (রাঃ)-এর আমল থেকে গোঁফ **কাটা**কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন; কারণ উমর (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের গোঁফে ফুঁ দিতেন। (আদাবুয যুফাফ)।

প্রশ্ন ৭৮: "اعفاء اللحية" (দাড়ি ছেড়ে দেওয়া) এর অর্থ কী?

উত্তর ৭৮: এখানে "اعفاء" অর্থ — ছেড়ে দেওয়া, প্রাকৃতিক অবস্থায় রাখা, ঘনভাবে বৃদ্ধি পেতে দেওয়া। (islamqa.info, ই'ফার অর্থ)

লিহয়ার অর্থ দাড়ি: গালদ্বয়ের দুই পাশে এবং থুতনিতে জন্মানো লোমকে দাড়ি বলা হয়। (আল-কামুস আল-মুহিত্ব: ৪/৩৭৭)

প্রশ্ন ৭৯: দাড়ির বিধান কী?

উত্তর ৭৯: দাড়ি বাড়ানো নবীদের সুন্নাহ এবং এটি ওয়াজিব।

প্রমাণ: মূসা (আ.) যখন হারূন (আ.)-এর দাড়ি ধরলেন, তখন তিনি বললেন: "হে আমার মায়ের পুত্র! আমার দাড়ি ধরো না, আমার মাথার চুলও টেনো না..." (সূরা ত্বা-হা: 94)

শায়খ শাঙ্কিতি (রহ.) বলেন: এই আয়াত এবং সূরা আনআম 84 একত্রে করলে প্রমাণিত হয় — দাড়ি পূর্ণভাবে রাখা ফরজ এবং শেভ করা নাজায়েয। (আযওয়াউল বায়ান ফি ঈযাহিল কুরআন বিল কুরআন: ৪/৯২)

কিছু হাদীসে **"أَرْخُوا"** (ছেড়ে দাও) শব্দের পরিবর্তে **"أَرْجُوا"** শব্দ এসেছে। কিছু আলেম এটিকে লেখার ভুল (তাসহিফ) বলেছেন। যেমন ইমাম কুরতুবি (রহ.) তাঁর *আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখিস সহিহ মুসলিম* (১/৫১৫) গ্রন্থে স্পষ্টভাবে তা উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন ৮০: দাড়ির পরিমাণ ও কাটার বিষয়ে আলেমদের মতামত বর্ণনা করুন।

উত্তর ৮০: ইমাম নবাবি (রহ.) বলেন: পাঁচটি বর্ণনায় (أرجوا)، (أرخوا)، (أوفوا)، (أعفوا) এবং (وفروا) — এই শব্দগুলো এসেছে। এইসব শব্দের অর্থ একই — দাড়িকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া। এটাই হাদিসের শব্দের প্রকাশ্য অর্থ। আমাদের শাফেয়ি মাজহাবের একদল আলেম এবং অন্যান্য আলেমও এই মতের পক্ষপাতী। (*আল-মিনহাজ শারাহ সহিহ মুসলিম*, ৩/১৪১)

নোট: এক মুঠির বেশি দাড়ি কাটা যাবে কি যাবে না — এ বিষয়ে আলাদা একটি রিসালা পরে প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

প্রশ্ন ৮১: দাড়ি রাখার শরয়ি বিধান কী?

উত্তর ৮১: দাড়ি রাখা নবিগণের সুন্নত এবং এর হুকুম ওয়াজিব — যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এখানে প্রথমে পরিষ্কার হওয়া উচিত — মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় "ফরজ, ওয়াজিব, লাযিম" ইত্যাদি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; এগুলোর মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।

নোট: শায়খ আলবানি (রহ.) বলেন — যারা ফরজকে "কত'ঈ/যন্নী" ইত্যাদি ভাগে ভাগ করে, এর কোনো প্রমাণ কুরআন বা সহিহ হাদিসে নেই।

শায়খ আলবানি (রহ.) এ বিষয়ে *সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ* (১/২২২)-এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতিটি নির্দেশই ফরজ/ওয়াজিব — যতক্ষণ না তার বিপরীতে কোনো স্পষ্ট দলিল পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ৮২: নবী ﷺ-এর দাড়ি কেমন ছিল?

উত্তর ৮২: জাবির ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত— রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার সামনের অংশ ও দাড়িতে কিছু সাদা চুল ছিল। যখন তিনি তেল ব্যবহার করতেন তখন সাদা বোঝা যেত না; আর চুল এলোমেলো হলে সাদা বোঝা যেত। তাঁর দাড়ি ছিল অত্যন্ত ঘন। এক ব্যক্তি বলল — তাঁর চেহারা কি তরবারির মতো ছিল? জাবির (রা.) বললেন — না, বরং তাঁর চেহারা সূর্য ও চাঁদের মতো উজ্জ্বল এবং গোলাকার ছিল। আমি তাঁর কাঁধে নবুওতের মোহর দেখেছি, যা কবুতরের ডিমের মতো এবং দেহের রঙের সঙ্গে মিল ছিল। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৬০৮৪)

প্রশ্ন ৮৩: দাড়ি শেভ (মুড়িয়ে ফেলা) করার হুকুম কী?

উত্তর ৮৩: কিছু আলেমের মতে দাড়ি শেভ করা হারাম এবং এ বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম ইবনে হাজম (রহ.) বলেন: "সম্পূর্ণ দাড়ি মুড়িয়ে ফেলা বিকৃতি সৃষ্টি করে — এটি জায়েয নয়।" (মারাতিবুল ইজ্‌মা, পৃষ্ঠা: ১৫৭)

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.)-এর উদ্ধৃতি: ইবনুল কাত্তান (রহ.) বলেন: "সমস্ত দাড়ি মুড়িয়ে ফেলা বিকৃতি (মুসলা/অঙ্গহানি) সৃষ্টি করে — এটি বৈধ নয়।" (আল-ইকনা' ফি মাসাইলিল ইজমা' ২/২৯৯)

শায়খ ইবনে বায (রহ.) বলেন: "চারটি ফিকহি মাযহাবই একমত যে দাড়ি পূর্ণ রাখা ওয়াজিব; তা মুড়িয়ে ফেলা হারাম, এবং ছোটো করে ফেলা (খশখশি করা)ও তার মতোই।" (মাজমু' ফাতাওয়া ইবনে বায ২৫/৩৫১, কিতাবুল লিবাস ওয়াজ্জীনাহ)

প্রশ্ন ৮৪: "সিওয়াক" (মিসওয়াক)-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী?

উত্তর ৮৪: আভিধানিক অর্থ : "السواك" শব্দটি "ساك" ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ দাঁত পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে ঘষা। এর দ্বারা মিসওয়াকের কাঠি বোঝায় এবং ধীরে চলাকেও বোঝাতে পারে। এর বহুবচন "سوك" এবং "مسواك"-এর বহুবচন "مساويك"। (লুগাতুল হাদিস ২/৪০১-৪০৩)

শরয়ি অর্থ:

আল্লামা হাত্তাব (রহ.) বলেন: মিসওয়াক হলো — দাঁত পরিষ্কার ও মুখ সুগন্ধ করার জন্য কাঠি ব্যবহার করা।

প্রশ্ন ৮৫: মিসওয়াকের হুকুম কী?

উত্তর ৮৫: মিসওয়াক করা সুন্নত ও মুস্তাহাব; তবে এটি অজুর অংশ নয়, যদিও নবী ﷺ প্রত্যেক অজুর সাথে মিসওয়াক করার ওপর জোর দিয়েছেন।মিসওয়াকের কাঠ সাধারণত নিম, জলপাই এবং বিশেষভাবে পিলু গাছ থেকে নেওয়া হয়। সবচেয়ে উত্তম মিসওয়াক হলো পিলু

(Salvadora Persica) গাছের মিসওয়াক। আরবিতে এই গাছকে "শাজারাতুল আরাক" বলা হয়। এ গাছ সাধারণত গরম, শুষ্ক ও মরুভূমি অঞ্চলে জন্মে।কুরআনে পিলুকে "খামত" বলা হয়েছে: "আমি তাদের (সবুজ) বাগানের পরিবর্তে এমন দুই বাগান দিলাম যার ফল তিক্ত স্বাদের।" (সূরা সাবা ৩৪:১৬)

প্রশ্ন ৮৬: মিসওয়াকের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর ৮৬: মিসওয়াকের মূল উদ্দেশ্য — মুখ পরিষ্কার রাখা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: "মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা এবং রবের সন্তুষ্টির কারণ।" (সুনানে নাসায়ি, কিতাবুত তাহারাহ্, হাদিস: ৫; তুহফাতুল আশরাফ: ১৬২৭১; ইমাম বুখারি জায্ম-এর সীগা ব্যবহার করে , ১৯৩৪ নং হাদিসের পূর্বে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, মুসনাদে আহমাদ: ৬/৪৭, ৬২, ১২৪, ২৩৮; সুনানে দারিমি: ১৯; আলবানি এই হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।)

প্রশ্ন ৮৭: মিসওয়াকের কী ফজিলত আছে?

উত্তর ৮৭: আমর ইবনে সালিম আনসারি বলেন —আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "জুমার দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য গোসল, মিসওয়াক এবং সুগন্ধি ব্যবহার (যদি সম্ভব হয়) অপরিহার্য।" (সহিহ বুখারি: ৮৮০, সহিহ মুসলিম: ৮৪৬)

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত — তিনি এক রাতে নবী ﷺ-এর কাছে ছিলেন। রাতের শেষভাগে নবী ﷺ উঠলেন, বাইরে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন এবং সূরা আলে ইমরানের আয়াত পাঠ করলেন: "নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে..." থেকে "আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর" পর্যন্ত। তারপর ঘরে ফিরে এসে মিসওয়াক করলেন, অজু করলেন এবং নামাজ পড়লেন।

পরে শুয়ে আবার উঠলেন, আকাশের দিকে তাকালেন, একই আয়াত পড়লেন, তারপর মিসওয়াক ও অজু করে আবার নামাজ পড়লেন। (সহিহ মুসলিম: ২৫৬)

প্রশ্ন ৮৮: রোজাদার কি মিসওয়াক করতে পারে?

উত্তর ৮৮: ইমাম নাসাঈ এবিষয়ে অধ্যায় স্থাপন করেছেন: "রোজাদারের জন্য দিনের শেষভাগে (যোহর-আসর সময়) মিসওয়াক করার অনুমতি।" (সুনানে নাসায়ি, কিতাবুত তাহারাহ, আল-মু'জাম: ৭)

প্রশ্ন ৮৯: কিছু মানুষ রোজা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় রমযানের দিনে মিসওয়াক করা থেকে বিরত থাকে — এটা কি ঠিক? রমযানে কোন সময় মিসওয়াক করা উত্তম?

উত্তর ৮৯: এর কোনো দলিল নেই যে রমযানের দিনে বা অন্য কোনো দিনে মিসওয়াক করা থেকে বিরত থাকতে হবে। মিসওয়াক সুন্নত; অজুর সময়, নামাজের সময়, ঘুম থেকে জাগার পর এবং ঘরে প্রবেশের সময় — রমযান ও অন্য মাসে, রোজাদার ও অরোজাদার সবার জন্যই তা শরীয়তসম্মত ও জোরালো আমল। এতে রোজা ভাঙে না। হ্যাঁ — যদি মিসওয়াকের স্বাদ লালা বা থুথুতে অনুভূত হয়, তবে তা গিলে ফেলা যাবে না। আর মিসওয়াকে মাড়ি থেকে রক্ত বের হলে তা গিলে ফেলবে না। এই সতর্কতা নিলে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন ৯০: মাজমাযা (কুলি করা) ও ইস্তিনশাক (নাকে পানি দেওয়া) কী?

উত্তর ৯০: মাজমাযা: মুখে পানি নিয়ে দুই গালের ভেতরে ঘুরিয়ে কুলি করা।
ইস্তিনশাক: নাকে পানি টেনে নেওয়া এবং জোরে বের করা, যাতে নাকের ভেতরের ময়লা পরিষ্কার হয়।

প্রশ্ন ৯১: মাজমাযা ও ইস্তিনশাকের হুকুম কী?

উত্তর ৯১: কিছু লোক বলে — কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া শরীয়তে নেই; তারা দলিল হিসেবে আয়াত পড়ে: “হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াবে, তখন তোমাদের মুখ ও হাত কনুই পর্যন্ত ধুবে, মাথা মাসাহ করবে এবং পা টাখনু পর্যন্ত ধুবে।” (সূরা মায়িদা ৫:৬)

শায়খ আলবানি (রহ.)-এর মত: তিনি বলেন — কুলি ও নাকে পানি দেওয়া উভয়ই ওয়াজিব। কারণ কুরআনে মুখ ধোয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে, আর মুখের অংশের মধ্যেই কুলি ও নাকে পানি দেওয়া অন্তর্ভুক্ত।নবী ﷺ সর্বদা অজুতে এই দুই কাজ করেছেন এবং যারা তাঁর অজু বর্ণনা করেছেন, সবাই তা উল্লেখ করেছেন।

অতএব মুখ ধোয়ার আদেশের মধ্যে কুলি ও নাকে পানি দেওয়া অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর শায়খ আলবানি, লুকাইত ইবনে সাবুরা (রা.)-এর হাদিস উল্লেখ করেছেন। (তামামুল মিনাহ ফি তা’লিক ফিকহুস সুন্নাহ, পৃ. ১৯৩)

ইমাম নবাবি (রহ.) এই মাসআলায় মতভেদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন —
কুলি করা (মাজমাযা) ও নাকে পানি দেওয়া (ইস্তিনশাক) বিষয়ে আলেমদের চারটি মত আছে:
1. অজু ও গোসল — উভয় ক্ষেত্রেই এই দুই কাজ সুন্নত; এটিই আমাদের (শাফেয়ী) মাযহাব।

2. অজু ও গোসল — উভয় ক্ষেত্রেই এই দুই কাজ ওয়াজিব এবং উভয়ের সহিহ হওয়ার শর্ত; এটি ইবনে আবি লাইলা, হাম্মাদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মত। ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ মতও এটিই, এবং আতা (রহ.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত।

3. ইমাম আবু হানিফা (রহ.), তাঁর সাথীগণ এবং সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে — গোসলে ওয়াজিব, অজুতে নয়।

4. নাকে পানি দেওয়া (ইস্তিনশাক) অজু ও গোসল উভয় ক্ষেত্রেই ওয়াজিব, কিন্তু কুলি করা ওয়াজিব নয়; এটি আবু সাওর, আবু উবাইদ ও দাউদের মত। ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে একটি বর্ণনাও এ মত সমর্থন করে। ইমাম আহমদ বলেন — ইমাম ইবনুল মুনযিরও এ মতের পক্ষপাতী এবং আমিও এই মত গ্রহণ করি। (আল-মাজমূ‘ শরহুল মুহাযযাব, ইমাম নবাবি ১/৩৬২-৩৬৩, কিতাবুত তাহারাত, বাবুস সিওয়াক)

প্রশ্ন ৯২: রোজাদারের জন্য নাকে পানি দেওয়ার হুকুম কী?

উত্তর ৯২: লাকীত ইবনে সাবুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “নাকে পানি দিতে গভীরভাবে টানো — তবে রোজাদার হলে নয়।” (সুনান আবু দাউদ: ২৩৬৬)

অর্থাৎ রোজাদার কুলি ও নাকে পানি দেবে, তবে অতিরিক্ত টানবে না যাতে পানি গলায় চলে যায়। অতএব, অজু ও গোসল উভয় ক্ষেত্রেই কুলি ও নাকে পানি দেওয়া জরুরি — রোজাদার ও অরোজাদার উভয়ের জন্য। (মাজমু‘ ফাতাওয়া ১৫/২৮০)

প্রশ্ন ৯৩: নখ কাটার নির্ধারিত সময় কত?

উত্তর ৯৩: আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন — গোঁফ ছোটো করা, নখ কাটা, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা এবং বগলের লোম তুলে ফেলার জন্য আমাদের একটি সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে — যেন আমরা এগুলো চল্লিশ দিনের বেশি ফেলে না রাখি। (সহিহ মুসলিম: ২৫৮)

শায়খ ইবনে বায (রহ.)-এর মত: তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় — কিছু মহিলা মাসের পর মাস নখ বড় রাখে এবং নেল পলিশ লাগিয়ে এটাকে সৌন্দর্য মনে করে। এটা কি ঠিক?

তিনি বলেন: এটি জায়েয নয়। নখ যদি ৪০ দিন অতিক্রম করে যায় তবে তা কাটা ওয়াজিব।

নোট: নেল পলিশ লাগানো থাকলে অজু সহিহ হয় না, আর অজু না হলে নামাজও সহিহ হয় না।

প্রশ্ন ৯৪: মহিলা ও মেয়েদের জন্য মেহেদি লাগানো কি জায়েয?

উত্তর ৯৪: আলেমরা নারীদের নখে মেহেদি লাগানো বৈধ বলেছেন। শায়খ ইবনে বায (রহ.) বলেন: নখে মেহেদি বা সৌন্দর্যবর্ধক কোনো বস্তু লাগানোতে সমস্যা নেই — শর্ত হলো তা পাক হতে হবে এবং এমন হবে যাতে অজু ও গোসলে পানির পৌঁছাতে বাধা না দেয়। কিন্তু যদি তা ঘন স্তর তৈরি করে (যেমন নেল পলিশ), তবে অজু ও গোসলের সময় তা তুলে ফেলতে হবে; নইলে পানির পৌঁছানো বাধাগ্রস্ত হবে।

অতএব নেল পলিশের কারণে পানির প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা অপসারণ জরুরি। অতএব মেহেদি বা বর্তমান যুগে ব্যবহৃত নেল পলিশ-জাতীয় বস্তু দ্বারা নখের রং পরিবর্তন করতে কোনো অসুবিধা নেই — শর্ত হলো, অজু ও গোসলের সময় নেল পলিশ তুলে ফেলতে হবে। কারণ এগুলো এমন একটি স্তর সৃষ্টি করে যা অজু ও গোসলের সময় অঙ্গ পর্যন্ত পানির পৌঁছাতে বাধা দেয়। তবে যদি এমন হয় যে কোনো শক্ত স্তর জমে না — যেমন নখ লাল বা কালো করার মেহেদি — যার ঘন আবরণ থাকে না, তাহলে এতে কোনো সমস্যা বা গুনাহ নেই। কিন্তু যদি এমন পদার্থ হয় যা অঙ্গ পর্যন্ত পানির পৌঁছাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তবে অজু ও গোসলের সময় তা অপসারণ করা জরুরি; অন্যথায় অজু ও গোসল সহিহ হবে না। (ফাতাওয়া নূর ‘আলাদ দরব ৫/২৪৩–২৪৪)

প্রশ্ন ৯৫: পুরুষ ও নারী — উভয়ের জন্য নখ বড় রাখা কি নিষিদ্ধ?

উত্তর ৯৫: দুঃখজনকভাবে অনেক মুসলিম মেয়ে এবং কিছু যুবক ৪০ দিনের বেশি নখ বড় রাখে, যা বিড়ালের নখের মতো দেখায়। এটি প্রথমত সুন্নতের বিরোধী, দ্বিতীয়ত স্বাস্থ্যবিধির বিরোধী। সৌন্দর্যের জন্য নখ বড় রাখা মুসলমানদের কাজ নয়; বরং তা হারাম।

রাফি‘ ইবনে খাদীজ (রা.) বলেন — আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা শত্রুর মুখোমুখি হবো কিন্তু আমাদের কাছে ছুরি নেই। তিনি বললেন: যে যন্ত্র রক্ত প্রবাহিত করে এবং যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয় — তা দিয়ে যবেহ করে খাও। তবে দাঁত ও নখ ব্যবহার করো না। কারণ দাঁত হাড়ের মতো এবং নখ হাবশিদের ছুরি। (সহিহ বুখারি: ৫৫০৯)

প্রশ্ন ৯৬: নখ কাটার হিকমত কী?

উত্তর ৯৬: নখ কাটা মুস্তাহাব — এটি ফিতরাতের সুন্নত। নখ না কাটলে অস্বাভাবিকভাবে বড় হয়, এতে ময়লা জমে জীবাণু তৈরি হয় এবং অনেক সময় পবিত্রতার পানি নিচে পৌঁছায় না। (আল-মুগনি ১/৬৫)

প্রশ্ন ৯৭: কোন দিক থেকে নখ কাটা উচিত?

উত্তর ৯৭: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: তোমরা ডানহাতে খাও, ডানহাতে পান কর, ডানহাতে নাও এবং ডানহাতে দাও। কারণ শয়তান বামহাতে খায়, বামহাতে পান করে, বামহাতে নেয় এবং বামহাতে দেয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ্: ৩২৬৬)

প্রশ্ন ৯৮: কাটা নখ ফেলা ও দাফন করার বিধান কী?

উত্তর ৯৮: এ বিষয়ে আলেমদের মতভেদ আছে। ফেলা বা দাফন — উভয়ই জায়েয; তবে দাফন করা উত্তম। মনে রাখবেন, দাফনের বর্ণনাগুলো দুর্বল। আজকাল জাদুকররা অনেক সময় চুল ও নখ ব্যবহার করে। তাই সতর্কতা অবলম্বন করাই ভালো। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন ৯৯: রাতে নখ কাটা কি নিষিদ্ধ?

উত্তর ৯৯: কিছু লোক বলে রাতে নখ কাটলে মৃত্যু হয় — এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কুসংস্কার। শরীয়তে এর কোনো প্রমাণ নেই। ইসলামে পরিচ্ছন্নতা ইবাদতের শর্ত — তাই যেকোনো সময় নখ কাটা জায়েয। শায়খ ইবনে বায (রহ.) বলেন: দিন-রাত সবসময় নখ কাটা বৈধ ও শরীয়তসম্মত। (ফাতাওয়া আল-জামিউল কাবির, অধ্যায়: রাতে নখ কাটার বিধান)

প্রশ্ন ১০০: বগলের লোম উপড়ে ফেলা উত্তম, নাকি কামানো?

উত্তর ১০০: কামিয়ে ফেললেও মূল সুন্নত আদায় হয়ে যাবে — বিশেষত তাদের জন্য যাদের লোম উপড়ানো কষ্টকর। ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রহ.) তাঁর *'আদাবুশ শাফেয়ী ও মানাকিবুহু'* গ্রন্থে ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন: আমি ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর কাছে এসে দেখলাম একজন ব্যক্তি তাঁর বগলের লোম কামাচ্ছে। তখন ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বললেন: আমি জানি বগলের লোম উপড়ে ফেলা সুন্নত, কিন্তু আমার জন্য তা সহ্য করা কঠিন। (ফাতহুল বারি ১০/৩৪৪)

ইমাম নবাবি (রহ.) বলেন: বগলের লোম উপড়ে ফেলা সুন্নত — এ বিষয়ে আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে। (শারাহ মুসলিম ৩/১৪৯)

প্রশ্ন ১০১: বগলের লোম পরিষ্কার করার পদ্ধতি কী?

উত্তর ১০১: কামানো সাধারণ পদ্ধতি; তবে পাউডার, উপড়ে ফেলা বা অন্য যেকোনো উপায়ে পরিষ্কার করা জায়েজ।

প্রশ্ন ১০২: নাভির নিচের লোম (যৌনাঙ্গের লোম) দূর করার পদ্ধতি কী?

উত্তর ১০২: নিম্নোক্ত সব পদ্ধতিতে তা করা যায়:

1. উপড়ে ফেলা
2. ব্লেড/ক্ষুর দিয়ে কামানো (এটাই বেশি প্রচলিত)
3. চুন বা রাসায়নিক পাউডার — (ক্রিম, লোশন, স্প্রে ইত্যাদি)। (বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: ফাতহুল বারি ১০/৩৪৩)

প্রশ্ন ১০৩: আধুনিক জিনিস দিয়ে বগল বা নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা যাবে কি?

উত্তর ১০৩: শায়খ ইবনে বায (রহ.) বলেন: লোম পরিষ্কার করার জন্য হেয়ার রিমুভার বা বিভিন্ন ক্রিম ব্যবহার করা জায়েজ। তবে সহজ হলে — নাভির নিচের লোম কামানো এবং বগলের লোম উপড়ে ফেলা উত্তম। কিন্তু কষ্ট হলে হালাল যে-কোনো উপায়ে লোম দূর করা বৈধ। (মাজমু‘ ফাতাওয়া ইবনে বায ২৯/৪৯)

প্রশ্ন ১০৪: নাভির নিচের লোম কাটার সময়সীমা কত?

উত্তর ১০৪: সর্বোচ্চ ৪০ দিন। (সুনানে তিরমিযি: ২৭৫৮)

প্রশ্ন ১০৫: স্বামী-স্ত্রী কি একে অপরের নাভির নিচের লোম কাটতে পারে?

উত্তর ১০৫: মু‘আবিয়া ইবনে হায়দা (রা.) বলেন — আমি জিজ্ঞেস করলাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের গোপন অঙ্গ কাদের সামনে খুলতে পারি? তিনি বললেন: “তোমার স্ত্রী ও দাসী ছাড়া সর্বদা তা গোপন রাখো।” আমি বললাম: যদি লোকেরা একত্রে থাকে? তিনি বললেন: “যতটা পারো, তোমাদের লজ্জাস্থান যেন কেউ না দেখে।” আমি বললাম: যদি একা থাকি? তিনি বললেন: “মানুষের চেয়ে আল্লাহর কাছেই বেশি লজ্জা করা উচিত।” (সুনান ইবনে মাজাহ: ১৯২০)

প্রশ্ন ১০৬: বগল ও নাভির নিচের লোম না কাটলে নামাজে কোনো প্রভাব পড়ে?

উত্তর ১০৬: শায়খ ইবনে বায (রহ.) বলেন: নামাজ সহিহ থাকবে; কারণ এটি নামাজের শর্ত নয়। তবে সুন্নত হলো — নিয়মিত লোম পরিষ্কার করা এবং ৪০ দিনের বেশি না রাখা। (নূর আলদ দার্‌ব, বগল ও নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা কি নামাযের শর্ত?)

প্রশ্ন ১০৭: পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জার ফজিলত ও গুরুত্ব কী?

উত্তর ১০৭: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: رجال يحبون أن يتطهروا এই আয়াতটি কুবা এলাকার লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে; তারা পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করত।” (সুনান আবু দাউদ: ৪৪)

আনাস (রা.) বলেন — নবী ﷺ যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে যেতেন, আমি ও এক ছেলে তাঁর সাথে পানির পাত্র নিয়ে যেতাম। (সহিহ বুখারি: ১৫১)

ইমাম তিরমিযি বলেন — এই অধ্যায়ে জারির ইবনে আব্দুল্লাহ্ বাজালি, আনাস ও আবু হুরাইরা (রা..) হতেও হাদিস বর্ণিত আছে। এর প্রতিই উলামাদের আমল রয়েছে। তাঁরা পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা যথেষ্ট হলেও পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা উত্তম ও মুস্তাহাব মনে করেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনে মুবারক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-ও এ মতের পক্ষপাতী। (সুনান তিরমিযি: ১৯)

প্রশ্ন ১০৮: জমজমের পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা যাবে কি?

উত্তর ১০৮: শায়খ ইবনে বায (রহ.)-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: সহিহ হাদিসে জমজমের ফজিলত প্রমাণিত — এটি পানীয় ও আরোগ্যের মাধ্যম। সুন্নত হলো তা পান করা, যেমন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পান করতেন। তবে অজু, ইস্তিঞ্জা এবং প্রয়োজনে জানাবাতের গোসলও করা জায়েজ। (মাজমু‘ ফাতাওয়া ইবনে বায ১০/২৭)

কিছু আলেম ইজমার দাবি করে বলেন জমজম দিয়ে ইস্তিঞ্জা বা জানাবাতের গোসল করা যাবে না — কিন্তু এই ইজমার দাবির নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই।

নাজাসাত ও নাজাসাত অপসারণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসআলা ও নীতিমালা

মাসআলা ১০৯: নাজাসাত দূর করা ওয়াজিব।

মাসআলা ১১০: কবরের অধিকাংশ আযাব প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে বাঁচতে অবহেলা করার কারণে হয়ে থাকে।

মাসআলা ১১১: সবধরনের নাজাসাতের হুকুম এক নয়। তাই প্রতিটি ধরনের বিধান জানা অত্যন্ত জরুরি।

মাসআলা ১১২: অযথা সন্দেহ করার অভ্যাস গড়ে তোলা সঠিক নয়; বরং “ইস্তিসহাব” (পূর্বাবস্থাকে বহাল রাখা)–এর অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

(ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন: অভ্যাসগত বিষয়সমূহে মূলনীতি হলো — তা বৈধ ধরা হবে, সন্দেহের ভিত্তিতে অবৈধ নয়।) অতিরিক্ত সন্দেহ ও কুমন্ত্রণায় আক্রান্ত হওয়া ঈমান ও আমল — উভয়ের সুস্থতার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই সর্বদা "ইস্তিসহাব" নীতির ওপর চলা উচিত। ইস্তিসহাবের অর্থ হলো — সাধারণ অভ্যাসগত বিষয়ে মূল অবস্থা হচ্ছে বৈধ ও অনুমোদিত; যতক্ষণ না তা অবৈধ প্রমাণকারী কোনো স্পষ্ট দলিল পাওয়া যায়। নীতি: "নিশ্চয়তা সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না।" (اليقين لا يزول بالشك)

মাসআলা ১১৩: কিছু আলেমের মতে, যদি সূর্যের তাপ বা বাতাসের মাধ্যমে মাটিতে বিদ্যমান নাজাসাত দূর হয়ে যায়, তবে সেই মাটি পবিত্র গণ্য হবে। তবে যদি কোনো স্থানে ছায়ার নিচে থেকে মাটি কেবল শুকিয়ে যায়, তাহলে সেটিকে পবিত্র বলা হবে না। কারণ সাধারণত এমন শুকনো মাটিতে পানি পড়লে পূর্বের নাজাসাতজনিত দুর্গন্ধ আবার প্রকাশ পায়। অতএব, যদি এমন মাটিতে পানি পড়ার পর দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, তবে তা ধৌত করা আবশ্যক হবে। অন্যদিকে, যদি কোনো কাপড়ে দীর্ঘ সময় সূর্যের তাপ পড়ে এবং এর ফলে নাজাসাত ও দুর্গন্ধ সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়, তবে সেই কাপড়কে পবিত্র গণ্য করা হবে। ফুকাহায়ে কিরাম এবং ইবনু তাইমিয়া (রহ.) এই মতকেই অধিক গ্রহণযোগ্য (রাজিহ) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (আল-ইখতিয়ারাত আল-ফিকহিয়্যাহ: ৫/৩১২)

মাসআলা ১১৪: পেশাব লাগা বড় বিছানা বা গদি পরিষ্কার করার পদ্ধতি:
দুধপানকারী (খাবার গ্রহণকারী) শিশুর পেশাব পরিষ্কার করার পদ্ধতি হলো—

- যদি নাজাসাতের মধ্যে কোনো কঠিন অংশ বা জমাট বস্তু থাকে, তবে তা প্রথমে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- আর যদি তা তরল (বহনশীল) হয়, তবে কাপড় বা স্পঞ্জ জাতীয় কোনো বস্তু দিয়ে ভালোভাবে মুছে পরিষ্কার করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত দৃশ্যমান ময়লা দূর না হয়।
- এরপর নাজাসাত দূর হয়েছে—এমন প্রবল ধারণা (গালিব যন্ন) অর্জিত হওয়া পর্যন্ত সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ঢালতে হবে।

এক্ষেত্রে বিছানা নিংড়ানো আবশ্যক নয়। তবে যদি বিছানা এত মোটা ও ভারী হয় যে পেশাব ভেতরে শোষিত হয়ে গেছে এবং তা দূর করার জন্য নিংড়ানো প্রয়োজন মনে হয়, তাহলে নিংড়ানো আবশ্যক হবে। আর যদি পাথর বা টাইলসের মতো কোনো শক্ত জিনিসের উপর নাজাসাত লাগে, তবে তার রং, গন্ধ ও চিহ্ন দূর করে দিলেই যথেষ্ট।

মাসআলা ১১৫: শায়খ ইবনে উসাইমিন (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল— ওয়াশিং মেশিনে (Washing Machine) যদি নাপাক কাপড় পরিষ্কার পানিতে ধোয়া হয়, তবে কি তা পাক হয়ে যায়? তিনি ইতিবাচক জবাব দিয়ে বলেন— যদি ধোয়ার ফলে কাপড় থেকে নাজাসাতের চিহ্ন দূর হয়ে যায়, তবে সেটি পাক হওয়ার জন্য যথেষ্ট। (ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব – ইবনে উসাইমিন: ৪/১৯৬)

মাসআলা ১১৬: যদি সাবান, শ্যাম্পু, ক্রিম ইত্যাদি গোসলের ব্যবহৃত দ্রব্যে হারাম প্রাণীর হাড়, চর্বি ইত্যাদি উপাদান থাকে, এবং সেগুলোকে "ইস্তিহালা" (Total Change Process) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করে তাদের মূল প্রকৃতি ও সত্তা বিলুপ্ত করে ফেলা হয়, এবং পরবর্তীতে তা একটি নতুন রাসায়নিক পদার্থে পরিণত হয়— তাহলে তা গোসলের কাজে ব্যবহার করা জায়েয।

(এখানে ব্যবহারের কথা বলা হচ্ছে; খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে এর বৈধতা প্রমাণ করা হচ্ছে না।)

ইবনুল কাইয়্যিম, ইমাম আবু হানিফা, ইবনে হাজম ও ইবনে তাইমিয়্যার গবেষণা থেকে জানা যায় যে "ইস্তিহালা" একটি গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক ফিকহি নীতি। (দেখুন: ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন ২/১৪–১৫, এবং ১৯৯৫ সালে কুয়েতে অনুষ্ঠিত ইসলামী চিকিৎসা বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক সংস্থার গৃহীত সিদ্ধান্ত)

মাসআলা ১১৭: যদি নামাজ আদায়ের পর জানা যায় যে শরীর বা কাপড়ের কোনো অংশে নাজাসাত ছিল, তবে নামাজ পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন নেই। কারণ ভুলে যাওয়া (নিসইয়ান) বা অজ্ঞতার কারণে নাজাসাত দূর না করা ক্ষমাযোগ্য। ইমাম নবাবি (রহ.) এই মতকে জুমহুর (অধিকাংশ আলেম)-এর অভিমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (আল-মাজমূ' ৩/১৬৩) এ বিষয়ে ইবনে উসাইমিন (রহ.) কুরআনের এই আয়াত দ্বারা দলিল দিয়েছেন—
"আল্লাহ কোনো প্রাণীকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুল করি, তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না।"

এছাড়া তিনি এই হাদিস থেকেও দলিল দেন— রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজরত অবস্থায় জিবরীল (আ.)-এর মাধ্যমে জানতে পারেন যে তাঁর জুতায় নাজাসাত রয়েছে। তখন তিনি নামাজের মাঝখানেই জুতা খুলে পাশে রেখে দেন এবং নামাজ শেষ করার পর তা পুনরায় আদায় করেননি। (আশ-শারহুল মুমতি' ২/৩২৩)

মাসআলা ১১৮: টিস্যু দিয়েও ইস্তিঞ্জা বৈধ।

মাসআলা ১১৯ : আহলে ইলমদের মতে, সুঁইয়ের আগার সমপরিমাণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রস্রাবের ফোঁটা, অথবা ইঁদুরের ছোটো মল, কিংবা নাপাক শুকনো ধুলোর সূক্ষ্ম কণা, অথবা কাদার মধ্যে পাওয়া খুব সামান্য নাজাসাত—এসব ক্ষমাযোগ্য। কারণ এগুলো থেকে সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। *আশ-শারহুল মুমতি'* (১/৪৪৭)-এ ইবনু তাইমিয়ার এ মত উদ্ধৃত হয়েছে। সহিহ মুসলিম (হাদিস ৪০৫)-এ এ ধরনের বিষয়ে অতিরিক্ত কঠোরতা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ রয়েছে। তবে কেউ চাইলে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে এগুলো থেকে সতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু অন্যদের ওপর কঠোরতা আরোপ করতে পারে না। (বাদায়ে' আস-সানায়ে' ১/৭৯, আল-মুগনি: ১/৪৬, লাজনা দায়িমা: ৫/৩৯৬)

নোট: ইস্তিঞ্জা (পায়খানা-প্রস্রাবের পর পরিষ্কার করা) পানি ও পাথর—উভয়টি একসাথে ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক বলা অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা। কারো পক্ষে সম্ভব হলে করতে পারে, তবে শায়খ আলবানির গবেষণা অনুযায়ী আহলে কুবা সংক্রান্ত যে বর্ণনা রয়েছে, তা দুর্বল।

মাসআলা ১২০ : বীর্য নাপাক—এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য দলিল নেই। (বিস্তারিত দলিল পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে উল্লেখিত হয়েছে।)

মাসআলা ১২১: প্রশ্ন: কোনো শিশু যদি বিছানায় প্রস্রাব করে এবং তা শুকিয়ে যায়, এরপর কেউ সেখানে বসলে—নাজাসাত কি তার গায়ে লাগবে?

উত্তর: শায়খ সালেহ আল-ফাওযান ও শায়খ ইবনে জিবরিন (রহ.) বলেছেন—এ ধরনের শুকনো নাজাসাত বসা ব্যক্তির কাপড়কে নাপাক করবে না। (ফাতাওয়া আল-মারআহ আল-মুসলিমাহ: ১/১৯৪)

মাসআলা ১২২: ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) নাপাক বস্তু থেকে নির্গত ধোঁয়া ও বাষ্পকে "ইস্তিহালা" (রূপান্তর) প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত গণ্য করে তা পবিত্র বলেছেন। কারণ আগুন ও বাতাসের উপাদানে নাজাসাতের স্বভাব থাকে না। (মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/৭১; আল-মাওসু'আহ ২০/২৪০)

মাসআলা ১২৩: ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতকে অগ্রাধিকার দিয়ে বলেন— পানি ছাড়া অন্য যে-কোনো বস্তু, যা নাজাসাত দূর করতে সক্ষম, তা দিয়েও নাজাসাত অপসারণ করা জায়েজ। (জামি' আল-মাসায়িল ৯/৩১৩–৩১৪; মাজমূ' ২১/৪৭৫; আশ-শারহুল মুমতি')

মাসআলা ১২৪ : যদি বাথরুমের কাপড়, অন্যান্য কাপড় বা বিছানায় দেখা যায়, তবে তার বিধান কী?

মূলনীতি হলো—সবকিছু পবিত্র ধরা হবে, যতক্ষণ না তার নাজাসাত প্রমাণিত হয়। এ ধরনের সামান্য ও সাধারণ প্রকৃতির নাজাসাত ক্ষমাযোগ্য, কারণ তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বাঁচা কঠিন। (আসনাল মাতালিব ১/১৫; আত-তাজ ওয়াল ইকলিল ১/২০৬-২১৬)

মাসআলা ১২৫: বয়স্ক ব্যক্তি, রোগী বা এমন কেউ যার শরীরে স্থায়ীভাবে মল-মূত্র নির্গমনের ব্যাগ (ক্যাথেটার/পাউচ) লাগানো থাকে—সে কীভাবে নামাজ আদায় করবে?

উত্তর: যদি চিকিৎসাগতভাবে কষ্ট ছাড়াই নামাজের সময় তা খুলে ফেলা সম্ভব হয়, তবে খুলে পবিত্র অবস্থায় নামাজ আদায় করবে। কিন্তু যদি সে "সালসালুল বাওল" (নিরবচ্ছিন্ন প্রস্রাব/পায়খানা) রোগে আক্রান্ত হয় এবং বারবার খোলা তার পক্ষে অসম্ভব হয়, অথবা পরিষ্কার করার মতো সাহায্যকারী না থাকে, কিংবা আর্থিকভাবে সহকারী রাখার সামর্থ্য না থাকে—তাহলে সে ওই অবস্থাতেই নামাজ আদায় করবে। তবে তাকে প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করতে হবে—যেমন সালসালুল বাওল ও ইস্তিহাযার রোগী করে। যদি অজুও করতে অক্ষম হয়, তবে অজুর শর্ত রহিত হবে এবং তায়াম্মুম করবে। যখন তার অসুবিধা দূর হবে, তখন স্বাভাবিক শরয়ি দায়িত্বের মতো সব বিধান মানতে হবে। (চিকিৎসা ও রোগীদের সম্পর্কিত ফাতাওয়া)

মাসআলা ১২৬: প্রশ্ন: যদি কেউ বিনা অজুতে (হাদাস অবস্থায়) নামাজ পড়ে, তবে নামাজ পুনরায় আদায় করতে হয়; কিন্তু শরীর বা কাপড়ে নাজাসাত ছিল তা জানা না থাকলে পুনরায় পড়তে হয় না, এই তফাত কেন?

উত্তর: আহলে ইলম "মামুরাত" (যে কাজ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে) এবং "মাতরুক" (যে কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে) —এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। হাদাস (অজু ভঙ্গ) হলো করণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত—অর্থাৎ অজু করা বাধ্যতামূলক। আর নাজাসাত হলো বর্জনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত—অর্থাৎ নাজাসাত থেকে বিরত থাকা। তাই করণীয় কাজ না করলে নামাজ বাতিল হয়; কিন্তু নিষিদ্ধ বিষয় অজান্তে ঘটলে ক্ষমাযোগ্য। (মাজমূ' ১২/৩৯০)

মাসআলা ১২৭: হাতে বা মেশিনে পবিত্র ও নাপাক কাপড় একসাথে ধোয়া যাবে কি?

উত্তর: শায়খ ইবনে বায (রহ.) বলেন— যদি একসাথে ধোয়ার ফলে নাজাসাতের চিহ্ন দূর হয়ে যায়, তবে কাপড় পবিত্র হবে। তবে উত্তম হলো—আগে নাপাক কাপড়ের নাজাসাত দূর করে, পরে উভয়কে একসাথে ধোয়া। (মাজমূ' ১০/২০৫)

মাসআলা ১২৮: হারাম ও নাপাক বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েজ নয়। তবে কিছু আলেম চরম প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, বিকল্প না থাকলে সীমিত সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছেন। এ অনুমতি কেবল জরুরি অবস্থার সীমার মধ্যে থাকবে; সাধারণ অবস্থায় তা ব্যবহার করা যাবে না।

মাসআলা ১২৯: যেসব নাজাসাত (অপবিত্র বস্তু) দ্বারা মানুষ সরাসরি অপবিত্র হয় না, সেগুলো অনুমোদিত। যেমন— শিকারি পাখি (যেমন বাজপাখি বা শকুন)কে মৃত পশু খাওয়ানো, অথবা কোনো পশুকে নাপাক কাপড় পরানো। তবে যদি ঐ নাজাসাত মানুষের গায়ে বা কাপড়ে লেগে যায়, তাহলে সেই নাজাসাত থেকে নিজেকে পবিত্র করা (পরিষ্কার করা) আবশ্যক।

মাসআলা ১৩০: ঘুম থেকে উঠে হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করাবে না।

পোশাক সংক্রান্ত মাসআলা

মাসআলা ১৩১: কাপড়ের যে অংশে নাজাসাত (অপবিত্রতা) লেগেছে, কেবল সেই অংশটুকু ধোয়া ওয়াজিব। পুরো কাপড় ধোয়ার প্রয়োজন নেই।

মাসআলা ১৩২: নামাজ আদায়ের পর যদি জানা যায় যে শরীর, কাপড় বা জায়গায় অজ্ঞতা বা ভুলবশত নাজাসাত ছিল, তাহলে নামাজ পুনরায় আদায় করা জরুরি নয়। কারণ রাসূল ﷺ নামাজ পুনরায় পড়েননি। তবে যদি নামাজের মধ্যেই বিষয়টি জানা যায়, তাহলে নামাজের অবস্থাতেই নাজাসাত দূর করা যাবে। যেমন— নবী ﷺ নামাজরত অবস্থায় জুতা খুলে ফেলেছিলেন।

রক্ত কখন নাপাক এবং কখন নয়?

মাসআলা ১৩৩: জমহুর (অধিকাংশ আলেম)-এর মতে বহমান রক্ত (দাম মাসফূহ) নাপাক। কিন্তু ইমাম শাওকানি, নবাব সিদ্দীক হাসান খান এবং আরও কিছু আলেম রক্তকে নাপাক মনে করেন না।

মাসআলা ১৩৪: অল্প পরিমাণ রক্ত ক্ষমাযোগ্য (মা'ফু 'আনহু), কারণ এর উপর "দামে মাসফূহ" (বহমান রক্ত)-এর বিধান প্রযোজ্য নয়।

মাসআলা ১৩৫: ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.) এই বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন যে— হায়েযের রক্ত অথবা মানুষ, পশু কিংবা উকুনের সামান্য রক্ত ক্ষমাযোগ্য।

মাসআলা ১৩৬: পুঁজের মধ্যে যে রক্ত থাকে, সেটিও অল্প রক্তের অন্তর্ভুক্ত।

মাসআলা ১৩৭: জবাই করার সময় কসাইয়ের গায়ে যে রক্ত লাগে, তা ক্ষমাযোগ্য।

মাসআলা ১৩৮: ক্ষতস্থান থেকে প্রবাহিত রক্ত ক্ষমাযোগ্য। এটি থেকে বাঁচা কঠিন হওয়ায় নাজাসাতের সাধারণ বিধান থেকে এটিকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। এটি তাদের একটি দলিল, যারা রক্তকে নাপাক মনে করেন না। আর যারা নাপাক বলেন, তারাও এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম স্বীকার করেন।

মাসআলা ১৩৯: রক্ত নাপাক নয় — এই মতের পক্ষে হাসান বাসারি (রহ.) বলেন: "মুসলমানরা সবসময় নিজেদের ক্ষতসহ নামাজ আদায় করে এসেছে।"

মাসআলা ১৪০: ইবনু তাইমিয়া (রহ.) *আল-ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ*-তে বলেন: প্রাধান্যযোগ্য মত হলো — রক্ত পুঁজের মতো; শরীর থেকে বের হলে তা ক্ষমাযোগ্য। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে হয়েছে।)

মাসআলা ১৪১: "দাম ইয়াসির" (অল্প রক্ত) সাধারণভাবে মাঝারি বা স্বল্প পরিমাণ রক্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা ফিকহি পরিভাষায় সাধারণভাবে সামান্য বলে গণ্য হয়। অতিরিক্ত কুমন্ত্রণায় আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সহজতার দিকটি প্রাধান্য পাবে।

মাসআলা ১৪২: রক্ত দান (Blood Donation) করা জায়েজ। কিন্তু এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ নয়।

মাসআলা ১৪৩: ইনজেকশন বা চিকিৎসাজনিত কারণে অল্প রক্ত বের হলে অজু ভঙ্গ হয় না, কারণ তা অল্প পরিমাণের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাণী সংক্রান্ত মাসআলা

মাসআলা ১৪৪: মরা পশুর চামড়া নাপাক থাকে, যতক্ষণ না তা চামড়া প্রক্রিয়াকরণ (দাবাগাত/ট্যানিং) করা হয়।

মাসআলা ১৪৫: জীবিত পশুর দেহ থেকে কাটা মাংস মৃত পশুর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যেমন — উটের কুঁজ বা ভেড়ার লেজের চর্বিযুক্ত অংশ ইত্যাদি।

মাসআলা ১৪৬: হারাম প্রাণীর মাংস নাপাক। অর্থাৎ যে প্রাণী খাওয়া হারাম, তার মাংসও নাপাক।

মাসআলা ১৪৭: সন্দেহজনক (শুবহা) বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরি।

মাসআলা ১৪৮: বিড়ালের উচ্ছিষ্ট (ঝুটা) পবিত্র।

দাউদ ইবনে সালিহ ইবনে দিনার তাম্মার তাঁর মায়ের সূত্রে বর্ণনা করেন— তাঁর মালকিন তাঁকে হরিসা (এক ধরনের খাবার) দিয়ে উম্মুল মু'মিনীন সাইয়্যিদা আয়িশা (রা.)-এর কাছে পাঠালেন। তিনি দেখলেন, সাইয়্যিদা আয়িশা (রা.) নামাজ পড়ছেন। তিনি ইশারা করলেন খাবারটি রেখে দিতে। এমন সময় একটি বিড়াল এসে খাবার থেকে কিছু খেয়ে নিল। নামাজ শেষ করার পর আয়িশা (রা.) সেই স্থান থেকেই খেতে লাগলেন, যেখান থেকে বিড়াল খেয়েছিল। আর বললেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— "এটি (বিড়াল) নাপাক নয়; এটি তোমাদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করা প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত।" আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তার অবশিষ্ট পানি দিয়ে অজু করতে দেখেছি। (সুনান আবু দাউদ: ৭৬)

ক। বিড়ালের উচ্ছিষ্ট একবার ধোয়ার বিষয়ে যে বর্ণনা রয়েছে:

নোট: এটি মারফূ' হাদিস নয়; বরং এটি আবু হুরাইরা (রা.)-এর বক্তব্য ও ইজতিহাদ। এ ইজতিহাদ নবী ﷺ-এর হাদিসের বিপরীত, যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে— "এটি নাপাক নয়; এটি তোমাদের ঘরে চলাফেরা করা প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত।" তাই ইবনে হাজার (রহ.) বলেছেন — আমল করা হবে সহিহ হাদিস অনুযায়ী।

খ। বিড়ালকে কুকুরের উপর কিয়াস করার কোনো দলিল নেই।

নোট: কুকুরের লালা ছাড়া অন্য প্রাণীর লালা পরিষ্কারের ক্ষেত্রে তিনবার ধোয়ার নির্দিষ্ট শর্ত নেই। বরং যতক্ষণ না পরিষ্কার হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়, ততক্ষণ ধোয়া হবে — চাই একবারে হোক, বা তিনবারের বেশি ধোয়ার মাধ্যমে হোক।

ব্যবহারের ক্ষেত্রে পবিত্র ও অপবিত্রের পরিচয়

মাসআলা ১৪৯: হালাল (মাকূলুল-লাহম) ও হারাম/অখাদ্য (গয়র মাকূলুল-লাহম) — উভয় শ্রেণির পশুর লোম পবিত্র। অর্থাৎ, হালাল ও হারাম—দুই ধরনের প্রাণীর লোম/রোম তাহির ও পাক। তবে কুকুর ও শূকরের লোমকে কেউ কেউ পবিত্র মানেন না—এতে মতভেদ রয়েছে।

মাসআলা ১৫০: কাফিরদের দেশে তৈরি লোম, পশম ও পালক দিয়ে বানানো বিছানা, টুপি, কাপড়, কার্পেট ইত্যাদি—সবই হালাল ও পাক।

মাসআলা ১৫১: চামড়া দিয়ে তৈরি জিনিসপত্র আর লোম/পশম/পালক দিয়ে তৈরি জিনিসপত্রের বিধান ভিন্ন ভিন্ন। জবাইযোগ্য হালাল প্রাণী—জীবিত হোক বা মৃত—তার লোম থেকে পশম (উল) সংগ্রহ করা জায়েয।

মাসআলা ১৫২: জীবিত হালাল প্রাণীর লোম বা উল থেকে পৃথক করা অংশসমূহ পবিত্র ও পাক। এগুলো দিয়ে বস্ত্র (কাপড়) বানানোও জায়েয। ইবনু মুনযির, ইবনু রুশদ, ইমাম নবাবি ও ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুমুল্লাহ) — এই বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) নকল করেছেন।

মাসআলা ১৫৩: যে মৃত প্রাণী জীবিত অবস্থায় 'তাহির প্রাণী'-এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ মূলত নাপাক নয়), তার লোম ও উল থেকে পৃথক করা অংশসমূহ পাক—যদিও সে প্রাণী অখাদ্য (গয়র মাকূলুল-লাহম) হয়। এটাই জমহুর (হানাফি, মালিকি, হাম্বলি) মাজহাব এবং সালাফের একটি দলও এ মতের ওপর। (রেফারেন্স: *আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ*)

মাসআলা ১৫৪: "ইনফাহা/ইনফিহা (انفحة / أنفحة)"—এর হুকুম কী? "ইনফাহা" বলতে বোঝায়—এক ধরনের হালকা হলুদাভ সাদা পদার্থ, যা বাছুরের (বা গর্ভবতী প্রাণীর) পেট/জঠর থেকে বের হয়। এর কয়েক ফোঁটা দুধে পড়লে দুধ জমে পনির হয়ে যায়। ইনফাহা এবং এতে মেশানো দুধ ও পনির—সবই পাক। কারণ সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) ইরাক বিজয়ের সময় এগুলো খেয়েছেন। (ইবনু তাইমিয়া রহ.)

মাসআলা ১৫৫: মাছি, টিড্ডি/পঙ্গপাল, বিচ্ছু—যেসব প্রাণীর দেহে প্রবাহমান রক্ত নেই—এরা মরে গেলে নাপাক হয় না। এদের দ্বারা দূষিত পানি ইত্যাদিও নাপাক হয় না।

মাসআলা ১৫৬: হরিণের কস্তুরি (মৃগনাভি) পাক। কারণ এটি ডিম, বাচ্চা, দুধ ও উলের ন্যায় "শরীরজাত উৎপাদিত বস্তু"—এর স্থলাভিষিক্ত।

মাসআলা ১৫৭: চীন ও হিন্দুস্তান ইত্যাদি অ-ইসলামি দেশে তৈরি জুতা ইত্যাদি ব্যবহারযোগ্য ও হালাল—শর্ত এই যে, সেগুলো দাবাগা দেওয়া (চামড়া ট্যান/পাক) করা হয়েছে।

মাসআলা ১৫৮: ইমাম সানআনি (রহ.) বলেন— হালাল, হারাম ও বন্য প্রাণীর চামড়া—সবই হালাল ও পাক, যদি দাবাগা দেওয়া হয়।

মাসআলা ১৫৯: হাড় দিয়ে তৈরি চিরুনি/চিরুনির মতো সামগ্রী এবং অনুরূপ জিনিসপত্র ব্যবহার করা জায়েয ও ব্যবহারোপযোগী।

মাসআলা ১৬০: মৃত মানুষ (মুমিন) নাপাক নয়। এই কারণে মৃত মানুষের কোনো অঙ্গ (অঙ্গদান) জীবিত মানুষের দেহে "উপহার" হিসেবে দেওয়া যেতে পারে—তবে শর্ত হলো:

1. এতে জীবিত ব্যক্তির উপকার নিশ্চিতভাবে প্রত্যাশিত হতে হবে,
2. ওয়ারিশগণ এটি দান হিসেবে দেবেন—কোনো দুনিয়াবি/আর্থিক বিনিময়ে নয়,
3. দুইজন বিশ্বস্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সম্ভাব্য উপকারিতার সত্যায়ন করবেন।

মাসআলা ১৬১: খামর/মদ তাহির ও পাক। এ কারণে স্প্রে ইত্যাদিতে বা ওষুধে যে অ্যালকোহল মেশানো হয়—তা পবিত্র। অনুরূপভাবে অচেতন করার ইনজেকশন/ওষুধে অ্যালকোহল থাকলেও তা জায়েয—তবে শর্ত:

- বিকল্প "পরিষ্কার/সমমান" চিকিৎসা না থাকে,
- এবং বিশ্বস্ত চিকিৎসকের মতে এটি একমাত্র প্রয়োজনীয় পথ হওয়া।

মাসআলা ১৬২: নাপাকি থেকে পবিত্রতা কীভাবে অর্জিত হবে?

তলোয়ার ইত্যাদি মসৃণ/চকচকে জিনিস (যা ঘষে পালিশ করা যায়) পবিত্র করার পদ্ধতি—সেগুলোকে ভালোভাবে মুছে দেওয়া, যাতে নাপাকির প্রভাব বিলুপ্ত হয়।

মাসআলা ১৬৩: যদি কোনো কূপে কোনো প্রাণী পড়ে মারা যায়, এবং পানিতে কোনো পরিবর্তন না ঘটে—তবে কূপের পানি পাক। আর যদি পরিবর্তন ঘটে—তবে পরিবর্তন/দুর্গন্ধ/রং ইত্যাদি দূর হওয়া পর্যন্ত পানি তুলে ফেলতে হবে।

মাসআলা ১৬৪: নবী ﷺ স্থির পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"তোমাদের কেউ স্থির পানিতে পেশাব করবে না; এবং পেশাব করে আবার সেই পানিতেই গোসলও করবে না।" (সহিহ বুখারি: ২৩৯; সহিহ মুসলিম: ২৮২) আর আলেমদের মতে, এর একটি কারণ হলো—এতে ওসওয়াসা জন্ম নেয়।

মাসআলা ১৬৫: কাদা/কর্দম (মাটি-জল মিশ্রিত কাদা) স্বয়ং নাপাক নয়, যতক্ষণ না তাতে নাপাকি মেশার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

মাসআলা ১৬৬: যদি বাধ্য হয়ে তিনটি পাথর দিয়ে ইস্তিঞ্জা করার পর সন্দেহ হয়—কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে কি না— তবে সন্দেহ দূর করে পবিত্রতার নিশ্চয়তা গ্রহণ করবে। কারণ শরিয়তে তিন পাথরে পবিত্রতা অর্জিত হয়ে যায়।

মাসআলা ১৬৭: কাপড় ধোয়ার মেশিনে (washing machine) ধোয়ার সময়—ধোয়া কাপড়ে থাকা নাপাকি "ছড়িয়ে পড়েছে" এমন ওসওয়াসা সৃষ্টি হতে পারে। এ ওসওয়াসা দূর করতে—

- পর্যাপ্ত পানি ব্যবহার করতে হবে,
- এবং শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে নাপাকির হুকুম লাগাতে তাড়াহুড়া করা যাবে না। (ইবনু জিবরিন রহ.)

পাত্রের পবিত্রতা ও অপবিত্রতার মাসায়েল

মাসআলা ১৬৮: পুরুষ ও মহিলা- উভয়ের জন্য সোনা ও রুপার পাত্রে খাওয়া-পান করা হারাম।

ক। এই কিয়াস অনুযায়ী সোনা ও রুপা দিয়ে তৈরি সব ধরনের পাত্র-বাসন ব্যবহারও হারাম।

নোট: যদি কোনো পাত্রে সোনা বা রুপার প্রলেপ (coating) লাগানো থাকে, তবুও সে পাত্রে খাওয়া-পান করা নিষেধ। কারণ মানুষ সেটাকেই সোনা-রুপার পাত্র মনে করবে—এ ধরনের সন্দেহ থেকে মুসলমানকে বেঁচে থাকা জরুরি।

খ। সোনা ও রুপা দ্বারা প্রস্তুতকৃত সব প্রকার পাত্র-বাসনের ব্যবহার হারাম। সোনা ও রুপা দিয়ে তৈরি কলম, লাঠি, এবং এই জাতীয় অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রীতে সোনা-রুপা ব্যবহার করাও নাজায়েয।

মাসআলা ১৬৯: নারীদের জন্য সোনা ও রুপার অলংকার পরিধান করা হালাল।

মাসআলা ১৭০: পুরুষের জন্য সোনা ও রুপার ঘড়ি পরা জায়েয নয়। তবে নারীদের জন্য সোনা-রুপা দ্বারা প্রস্তুতকৃত সব জিনিসের ব্যবহার জায়েয।

মাসআলা ১৭১: পুরুষদের জন্য সোনা ও রুপার চশমা (ফ্রেম) এবং কলম ইত্যাদিও জায়েয নয়; বরং নাজায়েয।

মাসআলা ১৭২: প্রকৃত বাধ্যবাধকতা (অত্যাবশ্যকতা) দেখা দিলে এবং বিকল্প কোনো সমাধান না থাকলে—সোনা বা রুপার দাঁত লাগানো জায়েয।

দলিল:

হযরত আরফাজা ইবনু আস'আদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত— জাহেলিয়াতের যুগে "ইয়াওমুল কিলাব" যুদ্ধের দিন তাঁর নাক কেটে যায়। তিনি রুপার নাক বানালেন; কিন্তু তাতে দুর্গন্ধ দেখা দিল। তখন নবী করিম ﷺ তাঁকে সোনার নাক বানাতে নির্দেশ দিলেন। *(সুনান আন-নাসাঈ: ৫১৬৪)*

মাসআলা ১৭৩: ইবনু তাইমিয়া (রহ.)-এর অবস্থান হলো— শুধু বাধ্যবাধকতা নয়, বরং প্রয়োজন ও দরকারের ভিত্তিতেও সোনা-রুপার অল্প পরিমাণ ব্যবহার বৈধ হতে পারে।

নোট: এই বিষয়ে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। তাই প্রয়োজন বা অজুহাত দেখিয়ে এর হালাল ও বৈধতার দরজা খুলে দেওয়া উচিত নয়। প্রথমে আলেমদের নিকট থেকে এর বৈধতার সঠিক অবস্থা জেনে নিতে হবে। তারপর পূর্ণ মানসিক স্বস্তি ও নিশ্চিয়তার সঙ্গে কেবল অল্প পরিমাণে সোনা ও রূপা ব্যবহার করা যেতে পারে।

মাসআলা ১৭৪: পিতল ও তামা ব্যবহার করা জায়েজ।

মাসআলা ১৭৫: অপচয়, অহংকার ও গর্বের মতো নিষিদ্ধ কাজ ও কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে সোনা ও রূপা ছাড়া অন্য যে-কোনো উৎকৃষ্ট ও দামী জিনিস ব্যবহার করা জায়েজ।

পানির পবিত্রতা-অপবিত্রতা সংক্রান্ত বিধান

মাসআলা ১৭৬: যদি পানির পরিমাণ দু'কুল্লা বা তার বেশি হয়, অথবা তা প্রবাহমান পানি হয়, এবং তাতে নাপাকি পড়লেও পানির রং, স্বাদ, গন্ধ- কোনোটিই পরিবর্তিত না হয়— তবে সেই পানি নাপাক হবে না।

মাসআলা ১৭৭: পরিমাণ ও লিটার হিসাব

শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান আল-মুনাই' (রহ.) বলেন: আলেমদের নিকট যে "কুল্লা" প্রসিদ্ধ, তা হলো হাজর এলাকার কুল্লা। এই হাজর বসতি মদিনার নিকটবর্তী। এখানে "হাজর" বলতে বাহরাইনের হাজর বোঝানো হয়নি।

এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে — এক কুল্লায় ২৫০ রিতল (رطل) থাকে। আর এক রিতলের ওজন ৪০৮ গ্রাম। অতএব এক কুল্লার পরিমাণ হবে: ২৫০ × ৪০৮ = ১,০২,০০০ গ্রাম অর্থাৎ প্রায় ১০২ কিলোগ্রাম। (মাজাল্লাতুল বুহূস আল-ইসলামিয়্যাহ ৫৮/১৮৪)

মাসআলা ১৭৮: যদি পানিতে লোহার টুকরা, পাতা, শাকসবজি বা জাফরানের মতো কোনো বস্তু পড়ে যায়, তাহলে সে কারণে পানি গায়রে মুতাহহির (যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয় না) হয়ে যায় না — যতক্ষণ পর্যন্ত পানির রং, স্বাদ বা গন্ধ নাজাসাতের প্রভাবের কারণে পরিবর্তিত না হয়। পানি তার পবিত্রকারী বৈশিষ্ট্য হারায় না। তবে যদি সাবান বা সুগন্ধি এমনভাবে মিশে যায় যে পানির মৌলিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তাকে আর "পানি" না বলে অন্য কোনো তরল (liquid) নামে ডাকা হয়, তখন তা ভিন্ন কথা। কারণ এসব বিষয় সাধারণ প্রয়োজনীয়তার (عموم بلوى) অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো থেকে বাঁচা কঠিন। (স্থায়ী ফতোয়া কমিটি)

মাসআলা ১৭৯: একইভাবে, যদি পানিতে মাটি পড়ে যায়, তবুও তা অপবিত্রকারী হয় না; বরং পবিত্র ও পবিত্রকারী অবস্থায় থাকে। কারণ পানির অনুপস্থিতিতে অজু ও গোসলের বিকল্প হিসেবে মাটিকেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

মাসআলা ১৮০ : ব্যবহৃত পানি (যেমন: অজু ও গোসলের পর অবশিষ্ট পানি) — পবিত্রকারী ও পবিত্র।

মাসআলা ১৮১: নোট : প্রত্যেক বস্তুর ব্যাপারে মূলনীতি হলো—তার পবিত্রতার উপর নিশ্চিত ধারণা। কেবল সম্ভাবনা বা সন্দেহ-এর ভিত্তিতে কোনো কিছুকে নাপাক বলা যাবে না। হ্যাঁ, যদি তার নাপাক হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট নিশ্চয়তা থাকে—তবে তাকে নাপাক বলা যাবে।

মাসআলা ১৮২: যদি কোনো বস্তুর নাপাক হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ হয়— তবে নিশ্চয়তার ভিত্তিতে হুকুম দেওয়া হবে; অতএব নিছক দুর্বল/কল্পিত সন্দেহের উপর কোনো বিধান আরোপ করা যাবে না। [اليقين لا يزول بالشك] অর্থ: "নিশ্চয়তা সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না।"

মাসআলা ১৮৩: নাপাকি দূর করার সর্বোত্তম ও প্রধান মাধ্যম হলো—পানি। তবে প্রয়োজনের সময়— সূর্যের তাপ, বাতাস, মাটি, ঘষে ফেলা, মুছে ফেলা— এসবও নাপাকি দূর হওয়ার কারণ হতে পারে। প্রয়োজনে এসবের মাধ্যমেও নাপাকি দূর করা যাবে।

মাসআলা ১৮৪: বাষ্প (steam)-এর মাধ্যমেও নাজাসাত থেকে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। বর্তমান যুগে ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক দোকানগুলোতে কাপড় ধোয়ার শিনের মাধ্যমে বাষ্প ব্যবহার করে নাজাসাত দূর করা হচ্ছে। (ইবনে জিবরিন)

মাসআলা ১৮৫: ইমাম আবু হানিফা, ইবনে হাজম ও ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মতে "ইস্তিহালা" (সম্পূর্ণ রূপান্তর) একটি গ্রহণযোগ্য ফিকহি নীতি। এ নীতির ভিত্তিতে আধুনিক যুগে নোংরা পানির নাজাসাত দূর করার জন্য পানি বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তি (تنقية الماء) ব্যবহার করা বৈধ।

মাসআলা ১৮৬: পানির নাজাসাত দূর করা বা তা কমানোর জন্য প্রাচীনকালে পানিতে অধিক পরিমাণ পানি মেশানো হতো বা মাটি দেওয়া হতো। বর্তমান যুগে আধুনিক ও হালাল বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তির মাধ্যমে পানি পরিশোধন করা হলে সেই পানি অজু ও গোসলের জন্য ব্যবহারযোগ্য হবে। আধুনিক "রিসাইক্লিং" পদ্ধতিও বৈধ, এবং এভাবে পানি পবিত্র হয়ে যায়।

মাসআলা ১৮৭: যদি কাপড়ে নাজাসাত লাগে কিন্তু কোথায় বা কতটুকু লেগেছে জানা না যায়, তবে যতটুকু নিশ্চিত হওয়া যায়, ততটুকুই ধুয়ে নিলেই যথেষ্ট।

মাসআলা ১৮৮: ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন: পানির ব্যাপারে কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা না মুস্তাহাব, না শরীয়তসম্মত। এমনকি এ বিষয়ে প্রশ্ন

করাও পছন্দনীয় নয়। বরং নীতি হলো "ইস্তিসহাব" — অর্থাৎ স্পষ্ট দলিল না পাওয়া পর্যন্ত পানিকে তার মূল পবিত্র অবস্থায় ধরা হবে। যদি নাজাসাতের প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন তাকে নাপাক গণ্য করা হবে।

মাসআলা ১৮৯: কুকুরের লালা ছাড়া অন্য প্রাণীর লালার ক্ষেত্রে তিনবার ধোয়ার শর্ত নেই। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত পরিষ্কার হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া যায় ততবার ধুতে হবে — তা একবারেই হোক বা তিনবার বা তার বেশি।

মাসআলা ১৯০: ইবনে হাজম (রহ.) বলেন: কোনো বস্তুকে পবিত্র প্রমাণ করতে প্রমাণ চাওয়া হবে না; বরং যে ব্যক্তি তাকে নাপাক বা হারাম দাবি করবে, তার কাছ থেকেই প্রমাণ চাওয়া হবে। (আদ-দারারি আল-মুদি': ১/১৯৭, আর-রাওযাহ আল-আরাবিয়্যাহ: ১/৮৫)

মাসআলা ১৯১: "الأصل في الأشياء الطهارة" — এই মূলনীতির আলোচনায় ইবনে তাইমিয়া বলেন: সমস্ত বস্তু পবিত্র, যতক্ষণ না তার অপবিত্রতার সুস্পষ্ট দলিল পাওয়া যায়। যার নাজাসাত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত নয়, তা পবিত্র বলে গণ্য হবে। (মাজমু' ফাতাওয়া ২১/৫৪২–৫৯১)

মাসআলা ১৯২: ইমাম শাওকানি (রহ.) বলেন: মূলনীতি হলো প্রতিটি বস্তু পবিত্র। কোনো নির্দিষ্ট বস্তু নাপাক দাবি করলে, দাবিদারের কাছ থেকেই কুরআন ও সুন্নাহর দলিল চাওয়া হবে। (আস-সাইলুল জারার ১/১৩০–১৩১)

মাসআলা ১৯৩: যদি নাপাক পানি নিজে নিজে পবিত্র হয়ে যায় অথবা পরিশোধন যন্ত্রের মাধ্যমে বিশুদ্ধ হয়, তবে তা ব্যবহারযোগ্য হয়ে যায়।

মাসআলা ১৯৪: "সুর" (سؤر) শব্দটি শুধু পান করার পর অবশিষ্ট পানির ক্ষেত্রে নয়; বরং ব্যবহার করার পর অবশিষ্ট পানিও "সুর" নামে পরিচিত।

মাসআলা ১৯৫: কোনো ব্যক্তির ব্যবহারের পর অবশিষ্ট পানি — সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম, হায়েজ অবস্থায় হোক বা না হোক — সব ক্ষেত্রেই তা পবিত্র।

মাসআলা ১৯৬: হালাল পশুর অবশিষ্ট পানি পবিত্র। কারণ তার নাপাক হওয়ার কোনো দলিল নেই, বরং তার পবিত্রতার উপর ইজমা রয়েছে।

মাসআলা ১৯৭: খচ্চর ও গাধার অবশিষ্ট পানি, অন্য পানি না পাওয়া গেলে ব্যবহারযোগ্য। কারণ রাসূল ﷺ এদের উপর আরোহণ করেছেন এবং নবুওয়তের যুগে এগুলো বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এ অবস্থায় তাদের ঘাম ও লালা থেকে সম্পূর্ণভাবে বাঁচা কঠিন।

শৌচাগারের শিষ্টাচার

মাসআলা ১৯৮: বাইতুল-খলা/টয়লেটে প্রবেশের দোয়ার মধ্যে "বিসমিল্লাহ" যোগ করা যেতে পারে।

সাইয়্যিদুনা আলি ইবনু আবি তালিব (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— "জিনদের চোখ এবং মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝে পর্দা হলো— যখন তাদের কেউ টয়লেটে প্রবেশ করে, তখন সে 'বিসমিল্লাহ' বলে।" (সুনান তিরমিযি: ৬০৬)

আর সাইয়্যিদুনা আনাস (রাযি.) বলেন, নবী করিম ﷺ যখন বাইতুল-খলায় প্রবেশ করতেন, তখন এ দোয়া পড়তেন— اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে নাপাক/দুষ্ট জিন পুরুষ ও জিন নারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই।" (সহিহ বুখারি: ৬৩২২)

মাসআলা ১৯৯: বাইতুল-খলা থেকে বের হয়ে 'غفرانك' বলা সুন্নাত।
উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যিদা আয়িশা সিদ্দিকা (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ যখন বাইতুল-খলা (পায়খানা) থেকে বের হতেন, তখন বলতেন— **غفرانك**
অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার ক্ষমা চাই।" — (সুনান তিরমিযি)

মাসআলা ২০০: যিকর-ই-ইলাহি (আল্লাহর স্মরণ) সম্বলিত কোনো বস্তু বাইতুল-খলায় নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

মাসআলা ২০১: প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময় সালামের জবাব দেওয়া যাবে না। একইভাবে— কথাবার্তা করাও মাকরূহ; তবে প্রয়োজন দেখা দিলে কথা বলা জায়েয। বরং কিছু পরিস্থিতিতে কথা বলা ওয়াজিবও হতে পারে। যেমন: কেউ অন্ধ ব্যক্তি কূপে পড়ে যেতে যাচ্ছে, অথবা কাউকে সাপ ইত্যাদি দংশন করতে যাচ্ছে—এমন বিপদে সতর্ক করা।

মাসআলা ২০২: ইস্তিঞ্জা করার সময় মানুষের দৃষ্টির আড়ালে ও দূরে সরে যেতে হবে।

মাসআলা ২০৩: পায়খানা করার সময় দেয়াল/আড়াল/উঁচু জিনিসের কাছাকাছি যাওয়া পর্যন্ত কাপড় তোলা ঠিক নয়।

মাসআলা ২০৪: খোলা ময়দানে কিবলামুখী হয়ে বসা অনুচিত। তবে ঘরের মধ্যে এই নিষেধাজ্ঞা নেই। অবশ্যই সেখানেও এথেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

মাসআলা ২০৫: পেশাবের ছিটা থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা ওয়াজিব।

মাসআলা ২০৬: রাস্তা, মানুষের বসার জায়গা, এবং ছায়াযুক্ত স্থানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পন্ন করা নিষিদ্ধ/নাজায়েয।

মাসআলা ২০৭: স্থির পানিতে পেশাব করা নিষিদ্ধ।

মাসআলা ২০৮: গোসলখানায় (হাম্মামে) পেশাব করবে না; নচেৎ একই জায়গায় অজু করার সময় ওসওয়াসা তৈরি হয়।
নোট: কিছু আলেম বলেন—বর্তমান যুগের অনেক বাথরুমে বিছানো পাথর/টাইলস এত মসৃণ ও পরিষ্কার থাকে যে ওসওয়াসা হওয়ার সম্ভাবনা কম; তাই এ ধরনের আধুনিক হাম্মামে (বাথরুমে) অজু করতে কোনো দোষ নেই।

মাসআলা ২০৯: বাধ্যবাধকতা থাকলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যেতে পারে—শর্ত এই যে, ছিটা লাগার আশঙ্কা না থাকে। কারণ কিছু ক্ষেত্রে বসে পেশাব করলে উল্টো ছিটা লাগার সম্ভাবনা বেড়ে যায়—যেমন আবর্জনা/ময়লার স্থানে বসে পেশাব করলে।

পেশাব ও পায়খানা পরিষ্কার করার পদ্ধতি

মাসআলা ২১০: পেশাব ও পায়খানার নাপাকি দূর করা যায়—

- পানি দ্বারা,
- পাথর দ্বারা,
- কিংবা শক্ত/ঠোস বস্তু দ্বারা; তবে হাড় ও গোবর দিয়ে পরিষ্কার করা যাবে না।

মাসআলা ২১১: যদি "ইস্তিজমার" (পাথর/কাগজ ইত্যাদি দিয়ে মুছে পরিষ্কার) করা হয়— তাহলে সংখ্যা তিনের কম হবে না।

মাসআলা ২১২: পাথর বা ঢেলা দ্বারা পরিষ্কার করলে তা বিজোড় সংখ্যায় (৩, ৫ ইত্যাদি) হতে হবে।

মাসআলা ২১৩: গোবর, হাড়, সম্মানিত বস্তু এবং খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা জায়েজ নয়।

মাসআলা ২১৪: পায়খানা শেষে পরিষ্কারের জন্য প্রয়োজন ছাড়া ডানহাত ব্যবহার করা যাবে না।

মাসআলা ২১৫: পায়খানা শেষে নাজাসাত থেকে পবিত্রতা অর্জনের পর হাত ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

মাসআলা ২১৬: টয়লেটে প্রবেশের সময় বাম পা আগে প্রবেশ করাতে হবে এবং বের হওয়ার সময় ডান পা আগে বের করতে হবে।

মাসআলা ২১৭: বায়ু নির্গত হলে ইস্তিঞ্জা জরুরি নয়, তবে অজু ভেঙে যায়।

মাসআলা ২১৮: গর্ত, ফাটল, সুড়ঙ্গ বা প্রাণীর বিলের মধ্যে প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ। কারণ কখনো কখনো সেখানে বিচ্ছু, ইঁদুর বা অন্যান্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ থাকতে পারে। তাবেঈ কাতাদা (রহ.) বলেন — কখনো কখনো এসব গর্ত জিনদের বাসস্থানও হতে পারে।

মাসআলা ২১৯: সূর্য বা চাঁদের দিকে মুখ করে বা পিঠ দিয়ে বসায় কোনো গুনাহ নেই।

মাসআলা ২২০: একটি দুর্বল হাদিসের ভিত্তিতে বলা হয় যে পায়খানার সময় বাম দিকে বেশি ঝুঁকে বসা এবং ডান পা খাড়া রাখা উচিত। তবে দুর্বল হাদিস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিক থেকে এটি উপকারী বলা হয়।

মাসআলা ২২১: ইমাম সান'আনি ও "তুহফাতুল আহওযি"-এর লেখকের মতে — কিবলার দিকে মুখ করে পায়খানা করার নিষেধাজ্ঞা খোলা মাঠের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ভবন বা ঘরের ভিতরে নয়।

মাসআলা ২২২: টয়লেটে অবস্থানকালে প্রয়োজন ছাড়া ডানহাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা জায়েজ নয়।

মাসআলা ২২৩: টয়লেটে প্রবেশের সময় প্রথমে বাম পা প্রবেশ করাতে হবে।

মাসআলা ২২৪: পায়খানা শেষে পরিষ্কারের জন্য তিনটি পাথর ব্যবহার করা শরীয়তসম্মত। একই হুকুম টিস্যু পেপারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

মাসআলা ২২৫: ইস্তিজমার বা ইস্তিঞ্জার জন্য খাদ্যদ্রব্য ও সম্মানিত জিনিস (যেমন জ্ঞানবিষয়ক কাগজপত্র) ব্যবহার করা হারাম।

মাসআলা ২২৬: মিসওয়াকের জন্য পিলু গাছের কাঠ ব্যবহার করা সুন্নত অনুসরণের দিক থেকে উত্তম।

মাসআলা ২২৭: পেস্ট, মাজন এবং পিলু গাছের কাঠ, দুটোই একসাথে ব্যবহার **করা উত্তম।**

মাসআলা : আলকোহল সম্পর্কিত বিধান

আলকোহল একটি পদার্থ, যা খামির (yeast) মিশ্রিত না হলে নেশা সৃষ্টি করে না। সাধারণভাবে "শরাব"কেও আলকোহল বলা হয় এবং শরাব তৈরির উপাদানকেও আলকোহল বলা হয় — এজন্য এ বিষয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। যখন কেউ "আলকোহল" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন তার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে জেনে নেওয়া জরুরি।

যদি সে নেশাজাতীয় পদার্থ (মুখাম্মার) বোঝায়, তবে তা হারাম — এতে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব নেশায় নিয়ে যায় এমন সব অজুহাত ও উপায় থেকে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু যদি আল-কুহ্‌ল ব্যবহার্য বস্তুতে (যেমন প্রসাধনী) ব্যবহৃত হয় এবং তা শুঁকলে নেশা না হয়, তাহলে অনেক আলেম এ ধরনের জিনিস ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। তবে পান করা বৈধ নয়, কারণ নেশা করা ও পান করা হারাম।

মিসওয়াক সংক্রান্ত মাসআলা

মাসআলা ২২৮: এই মাসআলায় প্রশ্ন হলো— মূল উদ্দেশ্য কি দাঁত পরিষ্কার করা, নাকি বিশেষভাবে মিসওয়াকের কাঠ ব্যবহার করলেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে?
যদি মূল উদ্দেশ্য দাঁত পরিষ্কার করা হয়, তবে টুথপেস্ট ব্যবহার করেও তা অর্জন করা সম্ভব। এ দৃষ্টিকোণ থেকে টুথপেস্টও মিসওয়াকের ক্ষেত্রে উপকারী ও শরীয়তসম্মত। তবে পূর্ণ ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব (সুন্নতের অনুসরণের সওয়াব) অর্জিত হবে মিসওয়াকের কাঠ ব্যবহার করার মাধ্যমেই।

মাসআলা ২২৯: রাফেয়ি (রহ.) *আল-ফাতহ* গ্রন্থে বলেছেন যে, "সিওয়াক" শব্দটির মূল ধাতু "স-ও-ক", যার অর্থ ঘষা বা মাজা। অর্থাৎ দাঁত ঘষে পরিষ্কার করা। যে কোনো বস্তু দ্বারা দাঁতের ময়লা দূর করা যায়, সেটাই মিসওয়াকের অন্তর্ভুক্ত। যদি মিসওয়াকের উদ্দেশ্য মুখ পরিষ্কার করা হয়, তবে তা প্লাস্টিকের ব্রাশ দিয়েও অর্জিত হতে পারে— তা কাপড় হোক বা কাঠ। নিম, খেজুর বা অন্য যেকোনো গাছের কাঠ দিয়েও মিসওয়াক করা বৈধ। তবে সুন্নতের অনুসরণের দিক থেকে কাঠের মিসওয়াক ব্যবহার করাই উত্তম।

মাসাহ সংক্রান্ত বিধান ও মাসআলা

মাসআলা ২৩০: লম্বা বুট জুতা, যা টাখনু ঢেকে রাখে, তার হুকুম মোজা (খুফ)-এর মতোই। অতএব, যদি জুতা বা বুট টাখনু ঢেকে রাখে, তবে মোজার মতোই তার উপর মাসহ করা যাবে একই শর্তে। অন্যথায় তা খুলে ধুতে হবে। শায়খ আলবানি টাখনু ঢাকার শর্তটি গ্রহণ করেননি।

মাসআলা ২৩১: কাপড়ের মোজার উপরও মাসহ করা জায়েজ। সাওবান (রা.) বলেন — রাসূল ﷺ একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। তাদের শীত লেগে যায়। তারা ফিরে এলে রাসূল ﷺ তাদের অজুর সময় পাগড়ি ও মোজার উপর মাসহ করার নির্দেশ দেন। (সুনান আবু দাউদ: ১৪৬) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এ মত গ্রহণ করেছিলেন।

মাসআলা ২৩২: মাসাহ করার নির্ধারিত সময় শুরু হয় মোজা পরার সময় থেকে নয়; বরং মোজা পরে অজু ভেঙে যাওয়ার পর নতুন অজু করার সময় থেকে সময় গণনা শুরু হয়। মুসাফিরের জন্য তিন দিন ও তিন রাত, আর মুকিমের জন্য এক দিন ও এক রাত।

মাসআলা ২৩৩: মোজা খুলে ফেললে মাসাহ বাতিল হয় না, যেমন চুল, নখ, হাত বা আঙুল কাটা গেলে অজু ভেঙে যায় না।

মাসআলা ২৩৪: পাগড়ির মাসাহের বিধান "শমাগ" বা "গুতরা"র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; তাই এগুলোর উপর মাসাহ জায়েজ নয়।

মাসআলা ২৩৫: ক্ষতের উপর বাঁধা ব্যান্ডেজ বা প্লাস্টারের উপর মাসহ করা জায়েজ; কারণ এর বিধান তায়াম্মুম ও মোজার উপর মাসাহের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মাসআলা ২৩৬: অজুর অঙ্গে প্লাস্টার থাকলে কী করবে?
১) অঙ্গ খোলা থাকলে ও পানি ক্ষতি না করলে, ধোয়া জরুরি।
২) পানি ক্ষতিকর হলে কিন্তু মাসাহ করা সম্ভব হলে, মাসাহ করবে।
৩) পানি ও মাসাহ — দুটোই ক্ষতিকর হলে, তায়াম্মুম করবে।
৪) যদি এমন ব্যান্ডেজ থাকে যা খোলা কঠিন, তবে তার উপর মাসাহ করবে।

মাসআলা ২৩৭ : যদি কারও হাত বা অজুর কোনো অঙ্গ ভেঙে যায় এবং সেখানে কৃত্রিম (Artificial) অঙ্গ বসানো হয়, তবে ঐ অঙ্গে অজুর হুকুম রহিত হবে। ফিকহি নীতি: " اذا فات الشرط فات المشروط" — শর্ত না থাকলে সংশ্লিষ্ট বিধানও থাকে না। হাত না থাকলে হাত ধোয়ার হুকুমও থাকবে না। তবে কৃত্রিম অঙ্গের সঙ্গে যদি আসল অঙ্গের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই অংশ ধুতে হবে।

মাসআলা ২৩৮: কৃত্রিম হাত বা পায়ে অজু বা গোসলের প্রয়োজন নেই। তবে আসল অঙ্গের অংশ থাকলে তা ধুতে হবে।

মাসআলা ২৩৯: নাকে অলংকারের জন্য ছিদ্র করা নিয়ে দুই মত আছে:
১) অকারণে নাজায়েজ।
২) জায়েজ — যদি সমাজে তা প্রচলিত রীতি হয় (যেমন কানে ছিদ্র করা), এবং ফাসেক বা অমুসলিমদের অনুকরণের নিয়ত না থাকে।

খাবারে পড়ে যাওয়া কীটপতঙ্গের বিধান

কখনো কিছু পিঁপড়া শরবত বা জুসে পড়ে যায় এবং সেখানেই মারা যায়। তাহলে যখন পিঁপড়া, মাছি, মশা ইত্যাদি কীটপতঙ্গ খাবার বা পানীয়ের মধ্যে জীবিত বা মৃত অবস্থায় পড়ে যায়, তখন কি আমরা সেই খাবার বা পানীয় খেতে পারি? নাকি খাওয়ার বা পান করার আগে সেগুলো বের করে ফেলতে হবে? (আল-ইসলাম প্রশ্নোত্তর)

প্রথমত:

শরিয়ত অপবিত্র ও নিকৃষ্ট বস্তুসমূহকে হারাম করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তুসমূহ তাদের উপর হারাম করেন।" (সূরা আ'রাফ: ১৫৭)

ওহি নাযিলের যুগে আরবরা কীটপতঙ্গযুক্ত খাবারকে অপবিত্র ও ঘৃণ্য মনে করত। কুরআনের প্রথম সম্বোধিতরাও তারাই ছিলেন। ইমাম ইবনে কুদামাহ (রহ.) বলেন: "তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয়েছে।" (সূরা মায়েদা: ৩) উল্লিখিত এই বস্তুগুলোর বাইরে অন্যান্য বস্তুসমূহের ব্যাপারে নীতি হলো— যেগুলো আরবরা পবিত্র ও ভালো মনে করত, সেগুলো হালাল হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করেন।" অর্থাৎ শরিয়ত নির্ধারিত হালালের পাশাপাশি যেসব জিনিস তারা উত্তম ও ভালো মনে করত। আরও একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে? আপনি বলুন: তোমাদের জন্য সব পবিত্র বস্তু হালাল করা হয়েছে।" (সূরা মায়েদা: ৪)

যদি প্রশ্নটি কেবল শরিয়ত নির্ধারিত হালাল বিষয়েই হতো, তাহলে এভাবে উত্তর দেওয়া হতো না। আর যেসব বস্তু আরবরা অপবিত্র ও নিকৃষ্ট মনে করত, সেগুলো হারাম হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তিনি তাদের উপর অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করেন।"

খাদ্যের ভালো-মন্দ নির্ধারণের মানদণ্ড

খাবারের ক্ষেত্রে কোনটি উত্তম আর কোনটি নিকৃষ্ট — তার মানদণ্ড হবে হিজাজ অঞ্চলের মানুষ, বিশেষত নগরবাসী আরবরা। কারণ কুরআন তাদের উপর নাযিল হয়েছে এবং তারাই কুরআন ও সুন্নাহর প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি। অতএব কুরআন ও সুন্নাহর শব্দার্থ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের প্রচলিত ধারণাই মানদণ্ড হবে। গ্রামাঞ্চলের লোকদের মানদণ্ড ধরা হবে না, কারণ প্রয়োজন ও দুর্ভিক্ষের সময় তারা যা পেত, তাই খেত।

সুতরাং নিম্নোক্ত প্রাণীগুলো অপবিত্র কীটপতঙ্গের অন্তর্ভুক্ত:

অন্ত্রের কৃমি, গুবরে পোকা, স্যাঁতসেঁতে স্থানে বসবাসকারী পোকা, ভোমরা, ইঁদুর, টিকটিকি, গিরগিটি, মাটিখোঁড়া পোকা, বন্য ইঁদুর, বিচ্ছু, সাপ। এটি ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মত। (আল-মুগনি থেকে উদ্ধৃতি সমাপ্ত)

দ্বিতীয়ত:

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে, এসব কীটপতঙ্গ অপবিত্র হওয়ায় সেগুলো খাবার থেকে আলাদা করা জরুরি। তবে এ শর্তে যে—

- সেগুলো সরানো সম্ভব হতে হবে
- এতে অতিরিক্ত কষ্ট না হয়
- কীটপতঙ্গ দৃশ্যমান হতে হবে
- এবং খাবার থেকে পৃথক করা সম্ভব হতে হবে।

শায়খ তাকিউদ্দিন (ইবনে তাইমিয়া)-এর মত

তিনি মত দিয়েছেন যে— খাবার ইত্যাদিতে অল্প পরিমাণ নাজাসাত, এমনকি ইঁদুরের ছোটো মলও, সাধারণভাবে ক্ষমাযোগ্য। তিনি "আল-ফুরু'" গ্রন্থে বলেন — এই মতকে "আন-নাযম" গ্রন্থকার সমর্থন করেছেন। "মাজমা' আল-বাহরাইন"-এও এই মত উল্লেখ রয়েছে। তার বক্তব্যের সারাংশ:

কাপড় ও খাবারে সামান্য নাজাসাত ক্ষমাযোগ্য হওয়াই অধিক উপযুক্ত; কারণ তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বাঁচা অত্যন্ত কঠিন। এটি "عموم بلوى" — অর্থাৎ সর্বজনীনভাবে ব্যাপকভাবে সংঘটিত কষ্টকর অবস্থা। বিশেষত—

- মিষ্টি তৈরির কারখানা
- শরবত প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান
- জলপাই তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।

এসব স্থানে ইঁদুরের অবশিষ্ট খাবার, মাছির রক্ত ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকা অত্যন্ত কঠিন। আমাদের অনেক আলেম এসব নাজাসাতযুক্ত বস্তু থেকে প্রস্তুত খাদ্যকে পবিত্র হিসেবে গণ্য করেছেন। والله أعلم (আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী) — (আল-ইসলাম প্রশ্নোত্তর)

PART – 3

তৃতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

কিতাবুত তাহারাত – ৩য় খণ্ড

(সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, প্রশ্নোত্তর আকারে)

পবিত্রতার প্রকারভেদ আলোচনা

- **তাহারাতে হাকিকিয়্যাহ:** নাপাক বস্তু (নাজাসাত) থেকে পবিত্রতা অর্জন।
- **তাহারাতে হুকমিয়্যাহ:** হাদাস (অজু ভঙ্গকারী অবস্থা) থেকে পবিত্রতা অর্জন।

প্রশ্ন ২৪০: হাদাসের আভিধানিক অর্থ ও পরিভাষিক সংজ্ঞা দিন।

উত্তর ২৪০: হাদাসে আসগর (ছোটো হাদাস):

পরিভাষায় হাদাসে আসগর বলতে ঐ হুকমি নাপাক অবস্থাকে বোঝায় (অর্থাৎ অপবিত্রতার অবস্থা), যার ফলে অজু ভেঙে যায়। ফিকহি পরিভাষায় এ অবস্থাকে "মুহদিস হওয়া" বলা হয়। এ অবস্থায় অজু করা আবশ্যক হয়ে যায়।

হাদাসে আসগরের উদাহরণসমূহ:

1. পায়খানা করা (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া)।
2. পেশাব করা।
3. বায়ু নির্গত হওয়া।
4. ওয়াদি — পেশাবের আগে বা পরে বের হওয়া সাদা পানি, যা কামনা ছাড়াই বের হয়।
5. মাযি — অনিচ্ছাকৃতভাবে যৌনাঙ্গ থেকে নির্গত পাতলা তরল; যা কখনো কামনার সাথেও বের হতে পারে।
6. অচেতনতা বা গভীর নিদ্রা।

উপরোক্ত সব বিষয়কে হাদাসে আসগর বলা হয়।

প্রশ্ন ২৪১: হাদাসে আকবার কী?

উত্তর ২৪১: হাদাসে আকবার হলো এমন অবস্থা, যার কারণে গোসল ফরজ হয়ে যায়। এর বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ গোসল অধ্যায়ে আসবে।

প্রশ্ন ২৪২: রাফউল হাদাস (হাদাস দূর করার পদ্ধতি) কী?

উত্তর ২৪২: ❖ হাদাসে আসগর (ছোটো নাপাক অবস্থা) দূর করার পদ্ধতি: অজু। ❖ হাদাসে আকবার (বড়ো নাপাক অবস্থা) দূর করার পদ্ধতি: গোসল।

প্রশ্ন ২৪৩: হাদাসের কারণসমূহ কী?

উত্তর ২৪৩: হাদাসে আসগরের কারণ: পেশাব, পায়খানা, বায়ু নির্গমন, মাযি, ওয়াদি, গভীর নিদ্রা, অচেতনতা ইত্যাদি।

হাদাসে আকবারের কারণ: জানাবাত (সহবাস বা বীর্যপাতজনিত অপবিত্রতা), ঋতুস্রাব (হায়েয), নিফাস (প্রসূতি রক্তস্রাব) ইত্যাদি।

প্রশ্ন ২৪৪: অজু সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য দিন।

উত্তর ২৪৪: ❖ উটের মাংস ব্যতীত অন্য যে কোনো মাংস, মাছ বা ডিম খেলে অজু ভাঙে না।

- ❖ আগুনে রান্না করা খাদ্য খেলে অজু করা ওয়াজিব নয়।
- ❖ দুধ পান করলে অজু করা জরুরি নয়; তবে কুলি করা মুস্তাহাব।
- ❖ উটের মাংস খেলে অজু করা ওয়াজিব।

প্রশ্ন ২৪৫: অজুর সাধারণ ভুলত্রুটি (আখতা'উল উযূ) বর্ণনা করুন।

উত্তর ২৪৫:

1. মনে করা যে প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করা ফরজ।
2. মনে করা যে প্রত্যেক অজুর আগে লজ্জাস্থান ধোয়া ফরজ।
3. অজুর নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা।
4. "বিসমিল্লাহ" ভুলে গেলে পুনরায় অজু করা।
5. হাতের তালু না ধুয়ে সরাসরি কনুই পর্যন্ত হাত ধুতে শুরু করা।

6. মনে করা যে প্রতিটি অঙ্গ তিনবার না ধুলে অজু পূর্ণ হয় না।
7. অজুর সময় আঙুলের ফাঁকে পানি না পৌঁছানো, সংকীর্ণ আংটি ভালোভাবে না নাড়ানো।
8. কুলি ও নাকে পানি দেওয়াকে জরুরি মনে না করা।
9. কানের লতি পর্যন্ত না ধুয়ে শুধু সামনের দিক থেকে মুখ ধোয়া।
10. মনে করা যে অজুর সময় কথা বললে অজু ভেঙে যায়।
11. পুরো মাথা মাসাহ না করা।
12. ঘাড় মাসাহ করা।
13. নারীদের নেইলপলিশযুক্ত নখের ওপর মাসাহ করা।
14. মনে করা যে কোনো অঙ্গ শুকিয়ে গেলে অজু শুদ্ধ নয়।
15. মাথা মাসাহের আগে হাত চুম্বন করা বা চোখে লাগানো।
16. মনে করা যে কান মাসাহের জন্য নতুন পানি নেওয়া বাধ্যতামূলক।
17. কেবল কানের ভেতরের অংশ মাসাহ করা।
18. অজুর সময় নির্দিষ্ট দুআ ও যিকির পড়া।

প্রশ্ন ২৪৬: অজুর আভিধানিক ও পরিভাষাগত অর্থ আলোচনা করুন।

উত্তর ২৪৬: ১. অজুর আভিধানিক অর্থ: "উযূ" শব্দটি "ওয়াযাআ" ধাতু থেকে গৃহীত, যার অর্থ সৌন্দর্য, উজ্জ্বলতা ও পবিত্রতা।

"উযূ" (ওয়াও-এ পেশসহ) অজু করার ক্রিয়াকে বোঝায়। "ওয়াযু" (ওয়াও-এ যবরসহ) সেই পানিকে বোঝায়, যা অজুর জন্য প্রস্তুত করা হয়। "মীযা" (মীম-এ কাসরাহসহ) সেই স্থানকে বোঝায়, যেখানে অজু করা হয়। (সূত্র: জাওহারির 'আস-সিহাহ', ১/৮১; ইবনে মানযূরের 'লিসানুল আরব', ১/১৯৪)

২. অজুর পরিভাষাগত সংজ্ঞা:

আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ধৌত করা।

প্রশ্ন ২৪৭: ওজুর ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ বলুন।

উত্তর ২৪৭: ১. **ইসলাম** — হানাফিদের নিকট এটি ওয়াজিব হওয়ার শর্ত; অন্যদের মতে ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সুস্থতা।

২. **বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া** — পাগল হলে অজু ওয়াজিব নয় এবং তার অজু শুদ্ধও নয়।

৩. **বালেগ হওয়া** — বালেগ না হলে অজু ওয়াজিব নয়; তবে করলে তা সহিহ।

৪. **পানির অস্তিত্ব** — হানাফি ও শাফেয়িদের মতে পানির অস্তিত্ব শর্ত; হাম্বালিদের মতে পবিত্র পানির অস্তিত্ব শর্ত।

৫. **অজু-বিরোধী বিষয় থেকে মুক্ত থাকা** — যেমন ঋতুস্রাব ও নিফাস।

৬. **পানি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া** — পানি পৌঁছাতে বা ব্যবহার করতে অক্ষম হলে ওয়াজিব নয়।

৭. **পানি পবিত্র হওয়া** এবং ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া।

প্রশ্ন ২৪৮: অজুর সহিহ হওয়ার শর্তসমূহ আলোচনা করুন।

উত্তর ২৪৮: ১. অজুর অঙ্গসমূহে পানি পৌঁছানো আবশ্যক; পানি পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করে এমন বস্তু অপসারণ করা জরুরি। কোনো অঙ্গ শুকনো থেকে গেলে অজু সহিহ হবে না।

২. অজুর পদ্ধতি জানা জরুরি; ফরজ ও সুন্নতসমূহের ধারাবাহিকতা জানা আবশ্যক।

৩. নিয়ত — অন্তরে অজুর নিয়ত করা শর্ত এবং রুকন উভয়ই। "নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" নামাজ আদায়ের আগে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করতে হবে।

৪. ওজরগ্রস্ত ব্যক্তির (যেমন অবিরাম রক্তস্রাব) জন্য বিশেষ শর্ত রয়েছে; তা সংশ্লিষ্ট আলোচনায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

৫. শর্ত নয় যে নামাজের সময় প্রবেশ করতেই হবে; তবে কিছু ফাকিহ বলেন, যারা স্থায়ী হাদাসে (অর্থাৎ যাদের ক্রমাগত অজু ভঙ্গের সমস্যা থাকে) আক্রান্ত এবং যাদের পেশাবের থলি লাগানো আছে, তাদের জন্য নির্ধারিত সময় শুরু হওয়ার আগে অজু করে নেওয়া সহিহ নয়।

প্রশ্ন ২৪৯: অজুর ফরজসমূহ (ওয়াজিবাত) উল্লেখ করুন।

উত্তর ২৪৯: ১. নিয়ত করা — পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা (হাদাস দূর করার উদ্দেশ্যে)।

২. বিসমিল্লাহ বলা — যদি মনে থাকে। যদি মনে থাকে, "বিসমিল্লাহ" বলা ওয়াজিব, তবে ভুলে গেলে ক্ষমাযোগ্য এবং অজু সহিহ হবে; তবে সে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।

৩. কুলি করা — একবার করা ওয়াজিব; তিনবার করা সুন্নত। (তামামুল মিন্নাহ)

৪. নাকে পানি দেওয়া ও পরিষ্কার করা — একবার।

৫. মুখমণ্ডল ধোয়া — একবার।

৬. দাড়িতে খিলাল করা।

৭. দুই হাত আঙুলের ডগা থেকে কনুই পর্যন্ত ধোয়া — একবার।

৮. হাতের আঙুলসমূহে খিলাল করা।

৯. সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা এবং কান মাসাহ করা — একবার।

১০. দুই পা টাখনু পর্যন্ত ধোয়া — একবার।

১১. পায়ের আঙুলসমূহে খিলাল করা।

১২. তারতিব (ক্রমরক্ষা) — অজুর অঙ্গসমূহ নির্ধারিত ক্রমে সম্পাদন করা। (শায়খ আলবানি-এর মতে এটি ফরজের অন্তর্ভুক্ত; তবে জমহুর আলেমদের মতে এটি সুন্নত, ফরজ নয়।)

১৩. মুওয়ালাত (ধারাবাহিকতা বজায় রাখা) — এক অঙ্গ ধোয়ার পর অন্য অঙ্গ ধোয়ার মাঝে এত দীর্ঘ বিরতি না দেওয়া, যাতে পূর্ববর্তী অঙ্গ শুকিয়ে যায় বা প্রচলিত রীতিতে বিলম্ব বলে গণ্য হয়। এটিও ফরজের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ২৫০: অজুর সুন্নতসমূহ উল্লেখ করুন।

উত্তর ২৫০: ১. বিসমিল্লাহ বলা — সুন্নত। (কিছু আলেমের মতে এটি ওয়াজিব; ভুলে গেলে গুনাহ নেই — হাম্বলি মাযহাব)

২. মিসওয়াক করা।

৩. অজুর প্রতিটি অঙ্গ ডান দিক থেকে শুরু করা। কিছু আলেমের মতে এটি ওয়াজিব, কারণ নবী ﷺ বলেছেন: "তোমাদের ডান দিক থেকে শুরু কর।" এখানে আদেশসূচক বাণী এসেছে, যা ওয়াজিব হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। অন্যদের মতে এটি মুস্তাহাব।

৪. অজুর শুরুতে কবজি পর্যন্ত হাত ধোয়া (তালুসহ) — সুন্নত। ঘুম থেকে উঠলে এটি ওয়াজিব। (ইবনে বায)

৫. অজুর অঙ্গসমূহ একবার ধোয়া ওয়াজিব; তিনবার ধোয়া সুন্নত।

৬. কুলি ও নাকে পানি দেওয়া — একবার ওয়াজিব। (আল-মানহাজ লিল-আলবানি, আস-সাইল আল-জারার লিশ-শাওকানি) গার্গারা করা এবং গলা পর্যন্ত পানি পৌঁছানো সুন্নত (ইবনে উসাইমিন ও ইবনে কুদামা)। তবে রোজা অবস্থায় অতিরঞ্জন করা নিষিদ্ধ; নবী ﷺ এথেকে নিষেধ করেছেন।

৭. নাকে পানি দেওয়া ও তা ঝাড়া — সুন্নত; কিছু আলেমের মতে ওয়াজিব।

৮. দাড়ি ও আঙুলে খিলাল করা — সুন্নত মুস্তাহাব। (কিছু আলেমের মতে দাড়ি ও আঙুলে খিলাল করা ওয়াজিব; শায়খ আলবানি এই মতের পক্ষে দলিল পেশ করেছেন।)

৯. অঙ্গ ঘষে ধোয়া — মুস্তাহাব। তবে যাদের চামড়া শক্ত, এবং পানি সহজে পৌঁছায় না, তাদের জন্য ঘষা ওয়াজিব (ইবনে বায)।

১০. তিনবারের বেশি ধোয়া মাকরূহ।

১১. অল্প পানি ব্যবহার করা — সুন্নত।

১২. অজুর পর নির্দিষ্ট দুআ পড়া — সুন্নত।

১৩. তাহিয়্যাতুল উযূ (অজুর পর দুই রাকাত নামাজ) — মুস্তাহাব।

১৪. তারতিব (ক্রমরক্ষা) — শায়খ আলবানির গবেষণা অনুযায়ী এটি ওয়াজিব; জমহুরের মতে সুন্নত।

১৫. তাজদিদে উযূ (নবায়নকৃত অজু) — পূর্ববর্তী অজু দ্বারা এক নামাজ আদায় করা হয়ে গেলে নতুন অজু করা মুস্তাহাব।

১৬. আংটি, চুড়ি, ঘড়ি ইত্যাদি নাড়ানো, যাতে নিচে পানি পৌঁছায় — সুন্নত। যদি তা শক্ত হয় এবং পানি না পৌঁছানোর আশঙ্কা থাকে, তবে নাড়ানো ওয়াজিব (ইবনে উসাইমিন ও আলবানি)।

১৭. মাথা একবার মাসাহ করা ওয়াজিব; তবে তিনবার মাসাহ করা সুন্নত। (শায়খ আলবানি আবু দাউদের এই সংক্রান্ত একটি হাদিসকে সহিহ বলেছেন, আর সুবুলুস সালামে ইমাম সানআনি এই মতই গ্রহণ করেছেন।)

১৮. এক মুদ-এর ২/৩ (পরিমাণ) পানি দ্বারা অজু করা সুন্নত; এক মুদ-এর ১/৩ পরিমাণ পানির বর্ণনাও এসেছে। (তামামুল মিন্নাহ)

১৯. গুররা (উজ্জ্বলতা) অর্জনের অর্থ হলো ভালোভাবে ধোয়া, সীমালঙ্ঘন করা নয় (ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়্যিম)।

২০. ছোটো আঙুল দ্বারা খিলাল করা — সুন্নত। (সহিহ আবু দাউদ)

প্রশ্ন ২৫১: অজুতে বৈধ (মুবাহ) বিষয়সমূহ উল্লেখ করুন।

উত্তর ২৫১: ১. কথা বলা।

২. অন্যের সাহায্য নেওয়া।

৩. কাপড় দ্বারা অজুর অঙ্গ মুছে ফেলা।

প্রশ্ন ২৫২: অজুতে অননুমোদিত (গাইরে মাশরু') কাজসমূহ উল্লেখ করুন।

উত্তর ২৫২: ১. প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার সময় নির্দিষ্ট দুআ পড়া।

২. ঘাড় মাসাহ করা।

প্রশ্ন ২৫৩: অজু ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ (নাওয়াকিযুল উযূ) আলোচনা করুন।

উত্তর: অজু ভঙ্গ বা নষ্টকারী বিষয়সমূহ হলো:

১. পেশাব।

২. পায়খানা।

৩. বায়ু নির্গমন।

৪. মাযি।

৫. ওয়াদি।

৬. লজ্জাস্থান থেকে যে কোনো বস্তু বের হওয়া — যেমন পাথর, কৃমি, অর্শরক্ত ইত্যাদি।

৭. নারীর লজ্জাস্থানের স্বাভাবিক স্রাব (যদি তা বীর্যের সদৃশ না হয়)। (শায়খ ইবনে উসাইমিনর মতে এতে অজু আবশ্যক নয়; ইবনে বায-এর মতে অজু করা উচিত।)

৮. পেশাব বা পায়খানা স্বাভাবিক রাস্তা ছাড়া অন্য পথ দিয়ে বের হওয়া।

৯. স্বাভাবিক রাস্তা ব্যতীত অন্য স্থান থেকে রক্ত বা বমি বের হলে অজু ভাঙে না। (শায়খ ইবনে বায, ইবনে উসাইমিন, ইবনে তাইমিয়া প্রমুখের ফতোয়া) আল্লামা আলবানির নিকট অজু করা মুস্তাহাব।

১০. গভীর ও ভারী নিদ্রা — অজু ভঙ্গ করে। (শায়খ আলবানি-এর মতে, শোয়া বা বসা যেভাবেই হোক; তবে যদি গভীর না হয়, অজু ভঙ্গ হয় না — ইবনে বায ও ইবনে উসাইমিন)

১১. বুদ্ধি সম্পূর্ণ বা আংশিক লোপ পাওয়া — যেমন পাগলামি, অজ্ঞানতা, নেশা বা মাথা ঘোরা।

১২. সরাসরি লজ্জাস্থান স্পর্শ করা (মধ্যস্থতাকারী ছাড়া)।

- প্রথম মত: অজু ভঙ্গ হয়।
- দ্বিতীয় মত: অজু ভঙ্গ হয় না।
- তৃতীয় মত (শায়খ আলবানি): কামনাসহ স্পর্শ করলে ভঙ্গ হয়।

১৩. নারীকে স্পর্শ করা।

- প্রথম মত: অজু ভঙ্গ হয়।
- দ্বিতীয় মত (রাজেহ): ভঙ্গ হয় না।
- তৃতীয় মত: কামনাসহ স্পর্শ করলে ভঙ্গ হয়।
- চতুর্থ মত: কামনা থাকলেও ভঙ্গ হয় না (আলবানির দলিল অনুযায়ী)।

১৪. উটের মাংস খেলে অজু ভঙ্গ হয়।

১৫. মুরতাদ হলে অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। (ইবনে বায, ইবনে তাইমিয়া)।

প্রশ্ন ২৫৪: যেসব বিষয়কে অজু ভঙ্গকারী গণ্য করা হয় না, সেগুলো আলোচনা করুন।

উত্তর ২৫৪: ১. শায়খ আলবানির মতে, কামনাহীনভাবে লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় না।

২. নারীকে স্পর্শ করা, যদি বীর্যপাত না ঘটে।

৩. ক্ষত, নাক বা অন্য স্থান থেকে রক্ত বের হওয়া।

৪. হালকা ঘুম — যাতে চেতনা অবশিষ্ট থাকে (ইবনে বায ও ইবনে উসাইমিন)।

৫. হাদাস হয়েছে কি না, এ ব্যাপারে সন্দেহ।

৬. পেশাবের ফোঁটা অনুভব হওয়া, কিন্তু বাস্তবে কিছু বের না হওয়া।

৭. নখ কাটা, চুল কাটা, মোজা বা জুতা খুলে ফেলা।

৮. স্থায়ী হাদাসে আক্রান্ত ব্যক্তি অজুর পর পুনরায় হাদাস হলে তা অজু ভঙ্গকারী নয়।

৯. আগুনে রান্না করা খাদ্য খেলে অজু ভঙ্গ হয় না; তবে অজু করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

১০. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার দ্বারা অজু ভঙ্গ হয় না; তবে অজু করা মুস্তাহাব।

১১. নামাজে উচ্চস্বরে হাসি অজু ভঙ্গ করে না (এ বিষয়ে হাদিস দুর্বল)।

১২. গুনাহ করা—যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা, গান শোনা—অজু ভঙ্গ করে না; তবে এগুলো থেকে বিরত থাকা অবশ্যই জরুরি।

প্রশ্ন ২৫৫: কোন কাজের জন্য অজু ওয়াজিব?

উত্তর ২৫৫: ১. নামাজ আদায়ের জন্য—ফরজ হোক বা নফল।

২. বায়তুল্লাহর তাওয়াফ।

তাওয়াফের জন্য অজু শরীয়তসম্মত হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে; তবে এটি ফরজ ও শর্ত কি না—এ ব্যাপারে মতভেদ আছে।

- জমহুর আলেমদের মতে, তাওয়াফের জন্য অজু ফরজ ও শর্ত।
- দ্বিতীয় মত: তাওয়াফের জন্য অজু শর্ত বা ফরজ নয়।

নোট: তৃতীয় মত হলো—ভুল ও মতভেদ থেকে বাঁচার জন্য অজু করে নেওয়া উত্তম। শায়খ ইবনে উসাইমিন বলেছেন, এটি মুস্তাহাব; কারণ অজু ছাড়া তাওয়াফ করলে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু অজু করে তাওয়াফ করলে কোনো মতভেদ নেই। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

৩. মুসহাফ (কুরআন) স্পর্শ করা।

- প্রথম মত: অজু ছাড়া স্পর্শ করা জায়েজ নয় (জমহুরের মত)।
- দ্বিতীয় মত: শায়খ আলবানির গবেষণায় এটি মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

প্রশ্ন ২৫৬: কখন অজু করা শরীয়তসম্মত (মাশরু‘)?

উত্তর ২৫৬: ১. যিকিরের জন্য (আযানের সময়ও এটি যিকিরের অন্তর্ভুক্ত)।

২. প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করা মুস্তাহাব।

৩. ঘুম থেকে জাগার পর।

৪. যখনই অজু ভঙ্গ হয়।

৫. বমির পর।

৬. তাওয়াফের জন্য (উপরে উল্লেখিত মতভেদসহ)।

৭. গোসলের আগে অজু করা মুস্তাহাব; দ্বিতীয় মত অনুযায়ী ওয়াজিব।

৮. মুখস্থ কুরআন তিলাওয়াতের জন্য।

৯. মুসহাফ স্পর্শ করার জন্য।

১০. যে শিশু এখনও বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছেনি, তাকে শিক্ষার সুবিধার্থে আলেমরা অজু ছাড়াই কুরআন ধরার অনুমতি দিয়েছেন।

১১. ঘুমানোর আগে অজু করা সুন্নত।

১২. অপবিত্র (জুনবি) ব্যক্তির জন্য খাওয়া, পান করা ও ঘুমানোর সময় অজু করা মুস্তাহাব।

১৩. পুনরায় সহবাসের আগে অজু করা মুস্তাহাব।

প্রশ্ন ২৫৭: অজুর সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি আলোচনা করুন।

উত্তর ২৫৭: অজুর সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি:

ধাপ ১–২

অজু শুরু করার আগে অন্তরে অজুর নিয়ত করে "বিসমিল্লাহ" বলা।

ধাপ ৩–৪

দুই হাত কবজি পর্যন্ত ভালোভাবে ধুতে হবে এবং আঙুলের ফাঁকে খিলাল করতে হবে। (তিনবার)

ধাপ ৫

কুলি করতে হবে (তিনবার)। রোজা অবস্থায় অতিরঞ্জন করা যাবে না। পানি মুখে নিয়ে ভালোভাবে ঘুরিয়ে বের করে দিতে হবে।

ধাপ ৬

নাকে পানি দিতে হবে (তিনবার)। রোজা অবস্থায় অতিরঞ্জন করা যাবে না। পানি নাকের ভেতরে টেনে নিয়ে পরে ঝেড়ে ফেলতে হবে।

ধাপ ৭

মুখমণ্ডল ধোয়া (তিনবার)। এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত এবং কপাল থেকে থুতনি পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুখ ধোয়া।

ধাপ ৮–১০

আঙুলের ডগা থেকে কনুই পর্যন্ত দুই হাত ভালোভাবে ধোয়া (সর্বোচ্চ তিনবার)। প্রথমে ডান হাত ধোয়া। আঙুলে খিলাল করা।

ধাপ ১১

মাথা মাসাহ করা (একবার)। দুই হাত ভিজিয়ে কপাল থেকে শুরু করে পিছনে নিয়ে গিয়ে পুনরায় সামনে ফিরিয়ে আনা। (একবার মাসাহ করাই যথেষ্ট; তিনবার করাও জায়েজ।)

ধাপ ১২

মাথার মাসাহের একই পানিতে কান মাসাহ করা (একবার)। শাহাদাতের আঙুল দিয়ে কানের ভেতর এবং বুড়ো আঙুল দিয়ে বাইরের অংশ মাসাহ করতে হবে।

নোট: মাথা একবার মাসাহ করাই যথেষ্ট।

ধাপ ১৩–১৫

দুই পা টাখনু পর্যন্ত ভালোভাবে ধোয়া (তিনবার)।

পায়ের আঙুলে খিলাল করা।

প্রথমে ডান পা, পরে বাম পা।

অজুর পরের দুআ পাঠ করা।

তাহিয়্যাতুল উযূ (দুই রাকাত নামাজ)।

প্রশ্ন ২৫৮: অজু কোন ক্রমে করতে হবে ?

উত্তর ২৫৮: রুমহান বর্ণনা করেন যে, তিনি উসমান ইবনে আফফান (রা.)-কে অজু করতে দেখেছেন। তিনি পানি চাইলেন এবং—

১. প্রথমে দুই হাতের তালুতে তিনবার পানি ঢেলে ধুলেন।

২. তারপর ডানহাত পাত্রে ঢুকিয়ে কুলি করলেন ও নাক পরিষ্কার করলেন।

৩. তিনবার মুখ ধুলেন।

৪. কনুই পর্যন্ত তিনবার দুই হাত ধুলেন।

৫. মাথা মাসাহ করলেন।

৬. টাখনু পর্যন্ত তিনবার দুই পা ধুলেন।

এরপর তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমার মতো অজু করবে, তারপর দুই রাকাত নামাজ মনোযোগ সহকারে আদায় করবে—যাতে তার মন অন্যদিকে বিভ্রান্ত না হয়—তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (সহিহ বুখারি, কিতাবুল উযূ, হাদিস নং ১৫৯)

প্রশ্ন ২৫৯: মাথা মাসাহ কীভাবে করতে হবে?

উত্তর ২৫৯: মাথা মাসাহ করার বিষয়ে কারও মতভেদ নেই; তবে কতটুকু অংশ মাসাহ করতে হবে—এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে:

১. সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা (রাজেহ মত)।

২. মাথার কিছু অংশ মাসাহ করা।

নোট: নারীদের ক্ষেত্রেও পুরুষের মতো পুরো মাথা মাসাহ করতে হবে; কেবল চুলের গোঁড়ায় বা খোঁপায় স্পর্শ করলেই যথেষ্ট নয়।

ইমাম বাগাভি বলেন: কুরআনের বাহ্যিক অর্থ থেকে বোঝা যায়, পুরো মাথা মাসাহ করা ফরজ। তবে সুন্নাহ এই ফরজের পরিমাণ নির্দিষ্ট করেছে। কম অংশ মাসাহ করলেও ফরজ আদায় হয়ে যায়; কিন্তু উত্তম হলো সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা—কপাল থেকে শুরু করে পিছনে নিয়ে গিয়ে পুনরায় সামনে ফিরিয়ে আনা।

প্রশ্ন ২৬০: কানের মাসাহ কীভাবে করতে হবে?

উত্তর ২৬০: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অজুর পানি আনা হলো। তিনি অজু করলেন। প্রথমে কনুই পর্যন্ত তিনবার দুই হাত ধুলেন, তারপর কুলি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিলেন, এরপর তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন, তারপর কনুই পর্যন্ত তিনবার দুই হাত ধুলেন। অতঃপর মাথা ও দুই কানের ভেতর ও বাইরের অংশ মাসাহ করলেন। (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুত তাহারাত, হাদিস নং ১২১; শায়খ আলবানি একে সহিহ বলেছেন।)

দুই কান মাথারই অংশ; অতএব মাথার সঙ্গে সেগুলোর মাসাহ করাও আবশ্যক। এ বিষয়ে পাঁচটি মত পাওয়া যায়—

১. **প্রথম মত:** অধিকাংশ আলেমের মতে, মাথার সঙ্গে কান মাসাহ করতে হবে; কারণ কান মাথার অংশ। এই মত পোষণ করেছেন—সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আতা ইবনে আবি রাবাহ, হাসান বাসারি, মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবরাহিম নাখঈ প্রমুখ। এছাড়া সুফিয়ান সাওরি, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল, ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এবং আহলুর রায়-এরও এই মত।

২. **দ্বিতীয় মত:** ইমাম যুহরির মতে, কানের পেছনের অংশ মাথার অন্তর্ভুক্ত এবং সামনের অংশ মুখমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত।

৩. **তৃতীয় মত:** ইমাম শা'বি বলেন, কানের বাইরের অংশ মাথার অন্তর্ভুক্ত এবং ভেতরের অংশ মুখমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত।

৪. **চতুর্থ মত:** হাম্মাদ-এর মতে, কানের ভেতর ও বাইরের উভয় অংশ ধুতে হবে। এই মত সাঈদ ইবনে জুবাইর ও ইবরাহিম নাখঈ থেকেও বর্ণিত।

৫. **পঞ্চম মত:** ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ বলেন, কানের সামনের অংশ মুখ ধোয়ার সময় মাসাহ করতে হবে এবং পেছনের অংশ মাথা মাসাহের সময় মাসাহ করতে হবে।

(সূত্র: শারহুস সুন্নাহ, ১/৪৪১; কিতাবুত তাহারাত, "বাবু মাসহির রা'স ওয়াল উদুনাইন", প্রকাশক: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, দামেস্ক-বৈরুত)

প্রশ্ন ২৬১: কানের মাসাহ করার পদ্ধতি?

উত্তর ২৬১: কানের ভেতর ও বাইরের উভয় অংশ মাসাহ করা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। শাহাদাতের আঙুল দ্বারা কানের ভেতরের অংশ মাসাহ করতে হবে এবং বুড়ো আঙুল দ্বারা কানের বাইরের অংশ মাসাহ করতে হবে। (শারহুস সুন্নাহ, ১/৪৪০)

প্রশ্ন ২৬২: মাথা ও কান কি একই ভেজা হাতে মাসাহ করতে হবে, নাকি নতুন পানি নিতে হবে?

উত্তর ২৬২: জমহুর আলেমদের মতে, যে ভেজা হাতে মাথা মাসাহ করা হয়েছে, সেই হাত দিয়েই কান মাসাহ করাই যথেষ্ট। নতুন পানি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এই মতই রাজেহ। তবে যদি মাথা মাসাহ করতে গিয়ে হাতের পানি শুকিয়ে যায়, তাহলে নতুন পানি নিয়ে কান মাসাহ করার অনুমতি রয়েছে।

প্রশ্ন ২৬৩: ঘাড় মাসাহ করা কি প্রমাণিত?

উত্তর ২৬৩: ঘাড় মাসাহ করার বিষয়ে কোনো সহিহ হাদিস প্রমাণিত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর বর্ণিত অজুর পদ্ধতিতে ঘাড় মাসাহের কোনো উল্লেখ নেই। সাহাবায়ে কিরাম (রা.)–দের মধ্যেও কেউ ঘাড় মাসাহ করেছেন—এমন প্রমাণ নেই।

যদিও কিছু লোক একে মুস্তাহাব বলে থাকেন, তবে কোনো সহিহ হাদিস দ্বারা এটি প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন ২৬৪: পাগড়ি ও মোজার ওপর মাসাহ করার অনুমতি আছে কি?

উত্তর ২৬৪: আমর ইবনে উমাইয়া আদ-যামারি (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে তাঁর পাগড়ি ও মোজার ওপর মাসাহ করতে দেখেছেন।

প্রশ্ন ২৬৫: পাগড়ির ওপর মাসাহের জন্য কি মোজার মতো পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা শর্ত?

উত্তর ২৬৫: ইমাম বাগাভি বলেন, পাগড়ির ওপর মাসাহের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

আবু বকর, উমর এবং আনাস (রা.) পাগড়ির ওপর মাসাহ করেছেন। ইমাম আওযায়ি, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ.) এবং ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ (রহ.) এই মতের পক্ষে।

অন্যদিকে কিছু সাহাবি ও তাবেয়ী বলেন, পাগড়ির সঙ্গে মাথার কিছু অংশও মাসাহ করতে হবে; কেবল পাগড়ির ওপর মাসাহ যথেষ্ট নয়। মুগীরা ইবনে শু'বা–এর হাদিস সম্পর্কে তাঁরা বলেন, কপালের চুলে মাসাহ করার বিধান দ্বারা পূর্ণ মাথা মাসাহের ফরজ রহিত হয়েছে।

আবার কেউ বলেন, এ হাদিস প্রমাণ করে যে পূর্ণ মাথা মাসাহ ফরজ নয়। যাঁরা পাগড়ির ওপর মাসাহের পক্ষপাতী, তাঁরা বলেন—পাগড়ি তখনই মাসাহযোগ্য হবে, যখন তা অজু অবস্থায় পরিধান করা হয়েছে। যদি অপবিত্র অবস্থায় পাগড়ি বাঁধা হয়, তবে তার ওপর মাসাহ করলে অজু সম্পূর্ণ হবে না। (শারহুস সুন্নাহ, ১/৪৫৩; "বাবু মাসহ আলাল খুফফাইন", প্রকাশক: আল-মাকতাব আল-ইসলামি)

রাজেহ মত: পাগড়ির ক্ষেত্রে মোজার মতো পবিত্র অবস্থায় পরিধানের শর্ত নেই। শায়খ আলবানি ও আল্লামা শাওকানি-এর মতে, পাগড়ির ওপর মাসাহের জন্য পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা শর্ত নয়।

প্রশ্ন ২৬৬: মোজার ওপর মাসাহ কীভাবে করতে হবে?

উত্তর ২৬৬: মোজার ওপর মাসাহ করার পদ্ধতি হলো—যদি অজু অবস্থায় মোজা পরা হয়ে থাকে, তাহলে তার ওপর মাসাহ করা যাবে। কিন্তু যদি কেউ অজু ছাড়া মোজা পরে থাকে, তাহলে সে মোজা খুলে প্রথমে অজু করবে, এরপর পুনরায় মোজা পরবে। এরপর যদি অজু ভঙ্গ হয়, তবে সে পা ধোয়ার পরিবর্তে মোজার ওপর মাসাহ করবে। এটি সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং এটিই উত্তম পদ্ধতি। (সহিহ বুখারি, কিতাবুল উযূ, হাদিস নং ২০৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৭৪)

উত্তম পদ্ধতি হলো এই যে, দুই হাত ভিজিয়ে আঙুলগুলো প্রসারিত করে ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের মোজার ওপরের অংশে এবং বাম হাত দিয়ে বাম পায়ের মোজার ওপরের অংশে মাসাহ করতে হবে। আঙুলের ডগা থেকে পায়ের পিঠ বরাবর উপরের দিকে হাত বুলাতে হবে, যেন আঙুলে লেগে থাকা পানি মোজার ওপর ছড়িয়ে যায়। এইভাবে দুই হাত দিয়ে একই সঙ্গে দুই পায়ের মোজায় মাসাহ সম্পন্ন হবে।

উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে জানা যায়—যে ব্যক্তি অজু অবস্থায় মোজা পরিধান করেছে, অতঃপর অজু ভেঙে গেলে পুনরায় অজু করে মোজার ওপর শুধু মাসাহ করলেই যথেষ্ট হবে; এর দ্বারা তার অজু সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি সে এর পরে নিজের মোজা খুলেও ফেলে, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। কিছু লোক বলেন—যদি কেউ অজুর পর মোজার ওপর মাসাহ করে, তারপর মোজা খুলে ফেলে, তাহলে তার অজু ভেঙে যায়; অতএব তাকে নতুন অজু করতে হবে। আবার কেউ বলেন—মোজা খুলে ফেলার পর কেবল পা ধুয়ে নিলেই যথেষ্ট। কিন্তু সঠিক ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো—অজু অবস্থায় মোজা খুলে ফেললে অজু ভঙ্গ হয় না। কারণ যখন সে মোজা পরেছিল তখন সে অজু অবস্থাতেই ছিল; সুতরাং মোজা খুলে ফেললে তার কোনো ক্ষতি হবে না। এ মাসআলায় আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

❖ **নোট:** মোজা ও জুরাবের ওপর মাসাহ করার পদ্ধতি একই।

প্রশ্ন ২৬৭: জুতার ওপর মাসাহ করা যায় কি?

উত্তর ২৬৭: সাহাবি মুগিরা ইবনে শু'বা (রা.) বর্ণনা করেন: নবী করিম ﷺ অজু করলেন এবং মোজা ও জুতার ওপর মাসাহ করলেন। (সুনান তিরমিযি : ৯৯)

অর্থাৎ, যখন জুতা ও জুরাব (Socks) পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা হয়, তখন তার ওপর মাসাহ করা সঠিক। যারা বলেন—পায়ে পরিধেয় বস্তু চামড়ার হওয়া আবশ্যক, অথবা যদি উল বা সুতার হয় তবে মোটা হওয়া জরুরি—এসব কথার কোনো দলিল নেই। নবী করিম ﷺ উম্মতের সহজতার জন্য মোজা, জুরাব ও জুতার ওপর মাসাহের নির্দেশ দিয়েছেন; যেমন মাথা ও কানের মাসাহ করা হয়। এটি উম্মতের জন্য সহজীকরণ। অতএব এসব বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয়।

❖ **নোট:** জুরাবের ওপর মাসাহের অনুমতি রয়েছে; আর জুতা যদি টাখনুর নিচে হয়, তবুও তার ওপর মাসাহ করা বৈধ নয়। তবে শায়খ আলবানি রহ. এটাকে বৈধ বলেছেন, কারণ কষ্ট ও প্রয়োজনের কারণ এখানে বিদ্যমান।

প্রশ্ন ২৬৮: অজু সমাপ্ত করার পরের দুআ কী?

উত্তর ২৬৮: প্রথম দুআ:

أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله

দ্বিতীয় দুআ:

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

প্রশ্ন ২৬৯: অজুর পর লজ্জাস্থানের স্থানে পানি ছিটানো কেমন?

উত্তর ২৬৯: সাইয়্যিদনা সুফিয়ান আস-সাকাফি (রাঃ) বর্ণনা করেন: নবী কারিম ﷺ যখন অজু করতেন, তখন এক মুঠো পানি নিতেন এবং এভাবে করতেন। শু'বা (রহ.) তার পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন— তিনি সেই পানি নিজের লজ্জাস্থানে ছিটিয়ে দিতেন। (খালিদ ইবনে হারিস বলেন) আমি এ বিষয়টি ইবরাহীম (রহ.)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি এটি পছন্দ করেন। ইবনুস-সুন্নি বলেন: "হাকাম" (হাকাম ইবনে সুফিয়ান ইবনে উসমান ইবনে আমির ইবনে মু'তিব) হলেন সাফওয়ান আস-সাকাফি (রাঃ)-এর পুত্র। (সুনান আন-নাসাঈ: ১৩৪)

প্রশ্ন ২৭০: দাঁড়িয়ে অজুর অবশিষ্ট পানি পান করা কি প্রমাণিত?

উত্তর ২৭০: নাযাল ইবনে সাবুরা (রা.) বর্ণনা করেন: আমিরুল মু'মিনিন আলি (রা.) যোহরের নামাজ আদায় করলেন। তারপর মসজিদে কুফার প্রাঙ্গণে মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য বসে রইলেন। এমন সময় আসরের নামাজের সময় হয়ে গেল। তাঁর কাছে পানি আনা হলো। তিনি পানি পান করলেন এবং নিজের মুখ ও হাত ধুলেন; মাথা ও পা ধোয়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে অজুর অবশিষ্ট পানি পান করলেন। এরপর বললেন—কিছু লোক দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে অপছন্দ করে, অথচ নবী করিম ﷺ এমনই করেছিলেন, যেমন আমি করেছি; অর্থাৎ তিনি দাঁড়িয়ে অজুর পানি পান করেছিলেন। (সহিহ বুখারি: ৫৬১৬)

প্রশ্ন ২৭১: অজুর পর আকাশের দিকে তাকানো বা শাহাদাতের আঙুল উঠিয়ে দুআ করা কি প্রমাণিত?

উত্তর ২৭১: সহিহ হাদিসসমূহে একথা প্রমাণিত নয় যে, অজুর পর আকাশের দিকে তাকাতে হবে বা আঙুল উঁচু করতে হবে। এদুটি কাজ কোনো সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়; বরং আলেমগণ একে বিদ'আত বলেছেন। এ প্রসঙ্গে সাহাবি উকবা ইবনে আমির (রা.)-এর একটি হাদিস বর্ণনা করা হয়, কিন্তু সেটি সর্বসম্মতভাবে দুর্বল।

প্রশ্ন ২৭২: অজুর পর তোয়ালে, রুমাল বা কাপড় ব্যবহার করা কেমন?

উত্তর ২৭২: অজুর পর তোয়ালে, রুমাল বা কাপড় দিয়ে অঙ্গসমূহ মুছে ফেলার বিষয়ে দুইটি মত পাওয়া যায়—

১. অজুর পর পানি না মুছা।

২. অজুর পানি মুছে ফেলায় কোনো অসুবিধা নেই।

নোট: শায়খ সা'দ ইবনে নাসির ইবনে আবদুল আজিজ আবু হাবিব 'মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা'-এর তাহকীকে "অজুর পর রুমাল ব্যবহার" সংক্রান্ত অধ্যায়ের সমস্ত বর্ণনাকে দুর্বল বলেছেন। (দেখুন: মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ২/৩১৫-৩১৮, প্রকাশক: দারুন নূয আল-ইসলামিয়া, রিয়াদ)

ইমাম নবাবি (রহ.) বলেন—এই মাসআলায় আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এবং এ বিষয়ে পাঁচটি মত পাওয়া যায়:

১. অজুর পর অঙ্গ মুছে ফেলা মুস্তাহাব; এটি মাকরূহ নয়।

২. অজুর পর অঙ্গ মুছে ফেলা মাকরূহ।

৩. মুছা বা না মুছা—উভয়ই সমান।

৪. অজুর পর মুছে ফেলা মুস্তাহাব।

৫. গরমকালে অজুর পানি মুছে ফেলা মাকরূহ; শীতকালে মাকরূহ নয়।

উপরোক্ত পাঁচটি মতের মধ্যে তিনটি মত সাহাবায়ে কিরাম (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, অজুর পানি মুছে ফেলা জায়েয এবং এতে কোনো অসুবিধা নেই।

১. সাহাবি আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন—অজু ও গোসল উভয় ক্ষেত্রেই শরীর মুছে ফেলা হবে। সুফিয়ান সাওরী-এর মতও এটিই।

২. সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন—অজু ও গোসল উভয়ের পর মুছে ফেলা মাকরূহ। ইবনে আবি লায়লার মতও এটিই।

৩. সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন—অজুর পর পানি মুছে ফেলা মাকরূহ; কিন্তু গোসলের পর মুছে ফেলা মাকরূহ নয়।

নিষেধের পক্ষে একটি হাদিস ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে; আর অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে নবী করিম ﷺ গোসলের পর বাইরে বের হলেন এবং তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরছিল। সুতরাং তিনি গোসলের পর পানি মুছে ফেলেননি। ইমাম নবাবি (রহ.) বলেন—এই হাদিসের সনদ দুর্বল। আর ইমাম তিরমিযি বলেন—এই বিষয়ে নবী করিম ﷺ থেকে কোনো সহিহ বর্ণনা প্রমাণিত নয়। ইমাম নবাবি আরও বলেন—কিছু আলেম উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনা (রা.)-এর হাদিস থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন যে, মুছে ফেলা সঠিক নয়। আবার কেউ বলেন—মুছে ফেলা ও ঝেড়ে ফেলা উভয়ই সমান। কেউ বলেন—মুছে ফেলার তুলনায় ঝেড়ে ফেলা অধিক উপযুক্ত। আবার কেউ বলেন—ঝেড়ে ফেলা ও মুছে ফেলা উভয়ই পানি শুকানোর অন্তর্ভুক্ত। সবশেষে সিদ্ধান্ত এই যে—অজুর পানি মুছে ফেলা জায়েয; কারণ এর বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে, নিষেধ প্রমাণিত হয়নি। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। (আল-মিনহাজ, শরহ সহিহ মুসলিম, ৩/২৩১-২৩২, প্রকাশক: দার ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবি, বৈরুত)

অতএব সমস্ত হাদিস ও আছারের আলোকে উত্তম আমল হলো—অজুর পর অঙ্গ না মুছা। তবে দ্বিতীয় মতের দলিল অনুসারে মুছে ফেলা জায়েয ও বৈধ; এতে কোনো গুনাহ নেই। কিন্তু উত্তম ও প্রশংসনীয় কাজ হলো না মুছা।

প্রশ্ন ২৭৩: প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করা কি জরুরি?

উত্তর ২৭৩: কিছু আলেম বলেন—মুকিম ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করা আবশ্যক। কিন্তু জমহুর আলেমদের মতে, মুসাফির ও মুকিম উভয়ের জন্য প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করা মুস্তাহাব; অর্থাৎ প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করা অপরিহার্য নয়।

প্রশ্ন ২৭৪: পবিত্র ও পরিষ্কার পানি কি অজুর শর্ত?

উত্তর ২৭৪: অজুর শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো—অজুর জন্য পবিত্র ও বিশুদ্ধ পানি থাকা। যেমন সূরা নিসা (৪) আয়াত ৪৩-এ এবং সূরা মায়িদা (৫) আয়াত ৬-এ এবিষয়ে নির্দেশ রয়েছে।

নোট: পানি ব্যতীত অন্য কিছু—যেমন দুধ বা অন্য কোনো পানীয়—দিয়ে অজু করা সহিহ নয়। কারণ সেগুলো "পানি" শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সেগুলোর দ্বারা অজু করার কোনো সহিহ হাদিস প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন ২৭৫: নাবিয (খেজুর ভেজানো পানি) দিয়ে অজু করা কি বৈধ?

উত্তর ২৭৫: একটি দুর্বল হাদিসে বর্ণিত আছে—আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, নবী করিম ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার পানির পাত্রে কী আছে?" আমি বললাম: "নাবিয"। তখন তিনি বললেন: "খেজুরও পবিত্র, পানিও পবিত্র।" অতঃপর তিনি তা দিয়েই অজু করলেন। (জামি' তিরমিযি, কিতাবুত তাহারাহ, হাদিস নং ৮৮; সুনান আবু দাউদ: ৮৪; সুনান ইবনে মাজাহ: ৩৮৪)

কিন্তু শায়খ আলবানি (রহ.) এই হাদিসকে দুর্বল বলেছেন। আবু যায়দ নামক রাবি মাজহুল (অজ্ঞাত) ব্যক্তি; এই হাদিস ছাড়া তাঁর অন্য কোনো বর্ণনা পরিচিত নয়। কিছু আলেম—যেমন সুফিয়ান সাওরী নাবিয দ্বারা অজু করা জায়েয বলেছেন। আবার অন্য আলেমগণ—যেমন ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আহমাদ এবং ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ বলেন, নাবিয দ্বারা অজু করা জায়েয নয়। ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ বলেন—যদি কোনো ব্যক্তিকে এমন পরিস্থিতিতে পড়তেই হয়, তবে সে নাবিয দিয়ে অজু করে পরে তায়াম্মুম করবে; আমার কাছে এটিই অধিক পছন্দনীয়। ইমাম তিরমিযি বলেন—যারা নাবিয দ্বারা অজু জায়েয মনে করেন না, তাদের মত কুরআনের অধিক নিকটবর্তী এবং অধিক যুক্তিসঙ্গত। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ﴿فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ "তোমরা যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো।" (সূরা নিসা: ৪৩) অতএব পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুমের নির্দেশ রয়েছে; অন্য কোনো তরল পদার্থ ব্যবহারের নির্দেশ নেই।

PART – 4
চতুর্থ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

কিতাবুত তাহারাত – ৪র্থ খণ্ড

(সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, প্রশ্নোত্তর আকারে)

প্রশ্ন ২৭৬: অজু ভঙ্গকারী ও নষ্টকারী বিষয়সমূহ কী কী?

উত্তর ২৭৬: ১. পেশাব।

২. পায়খানা বের হওয়া।

৩. বায়ু নির্গমন।

৪. মাযি।

৫. ওয়াদি।

৬. লজ্জাস্থানের দুই পথ (সামনে ও পিছনে) দিয়ে যে কোনো বস্তু নির্গত হওয়া—যেমন পাথর, কৃমি, অর্শের রক্ত ইত্যাদি

৭. নারীর লজ্জাস্থান থেকে স্রাব নির্গমন (ইবনে বায)। তবে ইবনে সেটাকে ঘামের মতো বলেছেন। (নারীর লজ্জাস্থান থেকে নির্গত স্রাব, যা ঘামসদৃশ, এর জন্য অজু আবশ্যক হওয়ার কোনো স্পষ্ট দলিল নেই (শায়খ ইবনে উসাইমিন)।

৮. স্বাভাবিক পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ দিয়ে পেশাব বা পায়খানা বের হওয়া।

৯. এমন গভীর ও ভারী নিদ্রা, যা পূর্ণ ঘুমের অন্তর্ভুক্ত।

১০. (শায়খ আলবানির মতে) শুয়ে বা বসে—যেভাবেই হোক, যদি গভীর ঘুম হয়। তবে যদি ঘুম গভীর না হয়, তাহলে অজু ভঙ্গ হয় না (শায়খ ইবনে বায, শায়খ ইবনে উসাইমিন)।

১১. বুদ্ধি সম্পূর্ণ বা আংশিক লোপ পাওয়া—যেমন পাগলামি, অজ্ঞান হওয়া, মাথা ঘোরা বা নেশাগ্রস্ততা।

১২. কোনো আবরণ ছাড়া সরাসরি লজ্জাস্থান স্পর্শ করা।

- প্রথম মত: এতে অজু ভঙ্গ হয়।
- দ্বিতীয় মত: অজু ভঙ্গ হয় না।
- তৃতীয় মত: কামনাসহ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় (শায়খ আলবানির মত)।

১৩. নারী স্পর্শ করা।

- প্রথম মত: অজু ভঙ্গ হয়।
- দ্বিতীয় মত (প্রাধান্যপ্রাপ্ত): ভঙ্গ হয় না—যদিও কামনাসহ স্পর্শ হয়।
- তৃতীয় মত: কামনাসহ স্পর্শ করলে ভঙ্গ হয়।

১৪. উটের গোশত খাওয়া।

১৫. ধর্মত্যাগ (মুরতাদ হওয়া)। (ইবনে বায ও ইমাম ইবনে তাইমিয়্যার মতে এটি অজু ভঙ্গকারী।)

প্রশ্ন ২৭৭: স্বাভাবিক পথ ছাড়া অন্য স্থান দিয়ে পেশাব বা পায়খানা বের হলে অজু ভঙ্গ হয় কি?

উত্তর ২৭৭: স্বাভাবিক পথ (পেশাব-পায়খানার স্থান) ছাড়া অন্য কোনো স্থান দিয়ে পেশাব বা পায়খানা বের হলে সর্বাবস্থায় অজু ভঙ্গ হয়। এটি হানাফি ও হাম্বালি মাযহাবের মত। ইবনে হাজম, ইবনে তাইমিয়্যা এবং স্থায়ী ফতোয়া বোর্ডও এই মত গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নির্দেশ: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾ "অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে।" (সূরা নিসা: ৪৩)

এখানে পায়খানা নির্গমনের স্থানের পরিবর্তে নির্গত বস্তুকেই বিবেচনা করা হয়েছে। সুতরাং তা স্বাভাবিক স্থান থেকে বের হোক বা অন্য স্থান থেকে—উভয় ক্ষেত্রেই একই হুকুম প্রযোজ্য।

সাফওয়ান ইবনে উসসাল (রাঃ) বলেন, আমরা যখন সফরে থাকতাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিতেন যে, আমরা যেন তিনদিন ও তিনরাত পর্যন্ত মোজা না খুলি। পেশাব, পায়খানা বা ঘুমের কারণে মোজা খোলার প্রয়োজন নেই; তবে জানাবাত (অপবিত্রতার গোসল ফরজ হওয়ার অবস্থা) হলে অবশ্যই মোজা খুলতে হবে। (সুনান তিরমিযি: ৯৬)

নবী ﷺ-এর বাণী: "ولكن من غائط وبول" — অর্থাৎ *"তবে পায়খানা ও পেশাবের কারণে"* — এ কথাটি প্রমাণ করে যে, নবী ﷺ হুকুম নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্গত বস্তুকে (পায়খানা বা পেশাব) বিবেচনা করেছেন; সেটি কোন স্থান দিয়ে বের হয়েছে, তা বিবেচনা করেননি।

অতএব, দুই স্বাভাবিক পথ (সাবিলাইন) ছাড়া শরীরের অন্য কোনো স্থান দিয়ে যদি পেশাব বা পায়খানা বের হয়, তবে হুকুমের দিক থেকে তা স্বাভাবিক পথ দিয়ে বের হওয়া পেশাব-পায়খানারই সমান গণ্য হবে। এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

সাবিলাইনের হুকুম কঠোর প্রকৃতির; কারণ এগুলো নির্গমনের স্বাভাবিক ও প্রচলিত পথ। যখন এ স্বাভাবিক পথ দিয়ে নির্গমনের কারণে হুকুম কঠোর হয়েছে, তখন অনুরূপ অন্য স্থান দিয়ে নির্গমন ঘটলে তার হুকুমও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কঠোর হওয়াই অধিক উপযুক্ত।

প্রশ্ন ২৭৮: নারীর নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় কি?

উত্তর ২৭৮: এ বিষয়ে আলেমদের দুইটি মত রয়েছে।

প্রথম মত:

এতে অজু ভঙ্গ হয় না। এটাই হানাফি ও মালেকি মাযহাবের মত, এবং ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর একটি বর্ণনা অনুযায়ীও এটিই তার মত।

তালক ইবনু আলি (রাঃ) বর্ণনা করেন: আমরা একদল প্রতিনিধি হিসেবে রওনা হলাম, অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছালাম। আমরা তাঁর কাছে বায়আত করলাম এবং তাঁর সঙ্গে নামাজ আদায় করলাম। তিনি যখন নামাজ শেষ করলেন, তখন এক ব্যক্তি—যেন সে একজন বেদুঈন—এসে বলল: "হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি নামাজের মধ্যে নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, তার ব্যাপারে আপনার কী মত?" তিনি ﷺ বললেন: "ওটা তো তোমার শরীরের একটি অংশ বা টুকরো মাত্র।" (সুনান আন-নাসাঈ: ১৬৫)

নবী ﷺ-এর এই বাণীতে—"এটা তো তোমার শরীরের একটি অংশ মাত্র"—এমন একটি কারণ (ইল্লাত) রয়েছে, যা পরিবর্তনযোগ্য নয়। এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

নুসূসে (শরঈ দলিলে) কেবল লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। অতএব, এ বিষয় ছাড়া অন্য সবকিছু মূল অবস্থায় (অর্থাৎ পবিত্রতার অবস্থায়) বহাল থাকবে। অজু ভঙ্গ হবে না। এই মূল নীতিমালা থেকে তখনই সরে আসা হবে, যখন অজু ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত দলিল পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় মত:

নারী যদি নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, তবে অজু ভঙ্গ হবে। এটি শাফেয়ি ও হাম্বালি মাযহাবের মত।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন: "যে কোনো পুরুষ নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, সে যেন অজু করে। আর যে কোনো নারী নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, সেও যেন অজু করে।" (সাহিহুল জামি': ২৭২৫)

এ মত অনুযায়ী, পুরুষের লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে যেমন অজু ভঙ্গ হয়, তেমনি নারীর ক্ষেত্রেও কিয়াস করা হয়েছে।

মন্তব্য:

দ্বিতীয় মতটিকেই শায়খ ইবনে বায (রহ.) গ্রহণ ও প্রাধান্য দিয়েছেন।

প্রশ্ন ২৭৯: অন্য কোনো পুরুষ বা নারীর লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় কি?

উত্তর ২৭৯: এ বিষয়েও দুইটি মত রয়েছে।

প্রথম মত:

অন্য পুরুষ বা নারীর লজ্জাস্থান—বড়ো হোক বা ছোটো—স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয়। এটি শাফেয়ি ও হাম্বালি মাযহাবের মত; ইবনে বাযও এই মত গ্রহণ করেছেন।

কারণ—অন্যের লজ্জাস্থান স্পর্শ অধিক কামোদ্দীপক হতে পারে; সুতরাং এটি নিজেরটির চেয়ে অধিকভাবে অজু ভঙ্গের কারণ হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় মত:

অন্যের লজ্জাস্থান, বড়ো হোক বা ছোটো, স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় না। এটি হানাফি ও জাহিরি মাযহাবের মত।

বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত—নবী ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে, সে অজু করবে।" (সুনান আবু দাউদ: ১৮১)

নবী ﷺ নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু করার নির্দেশ দিয়েছেন; অন্য কারও লজ্জাস্থান স্পর্শ করার ব্যাপারে নয়। এটি এমন একটি কারণ, যার প্রকৃত অর্থ বুদ্ধি দিয়ে সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা যায় না। তাই একে অন্য ক্ষেত্রে কিয়াস করা সম্ভব নয়।

মৌলিক নীতি হলো—যার ওপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে—অজু ভঙ্গ হওয়া কেবল ইজমা বা এমন সহিহ সুন্নাহর ভিত্তিতেই সাব্যস্ত হবে, যার অন্য কোনো ব্যাখ্যার সম্ভাবনা নেই। অতএব, আমরা এই মৌলিক নীতি থেকে তখনই সরে আসব, যখন অজু ভঙ্গ হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত দলিল প্রমাণিত হবে।

মন্তব্য:

এখানে মতভেদ এড়াতে এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে সন্দেহ থেকে বাঁচতে সতর্কতাবশত অজু করে নেওয়াই উত্তম।

প্রশ্ন ২৮০: পায়ুপথ (দুবুর) স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় কি?

উত্তর ২৮০: পায়ুপথ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় কি না — এ বিষয়ে আলেমদের দুইটি মত রয়েছে।

প্রথম মত:

পায়ুপথ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয়। এটি শাফেয়ি ও হাম্বালি মাযহাবের মত। সালাফদের একদলও এই মত পোষণ করেছেন। ইমাম শাওকানি ও শায়খ ইবনে বায (রহ.) এই মত গ্রহণ করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন: "যে কোনো পুরুষ নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, সে যেন অজু করে। আর যে কোনো নারী নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, সেও যেন অজু করে।" (সহিহুল জামি': ২৭২৫)

পায়ুপথও লজ্জাস্থানের অন্তর্ভুক্ত; কারণ সেটিও উদরের (পেটের) একটি ছিদ্র।

দ্বিতীয় মত:

পায়ুপথ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় না। এটি হানাফি, মালেকি, যাহিরি এবং হাম্বালি মাযহাবের একটি বর্ণনার মত। সালাফদের একদলও এই মত পোষণ করেছেন।

তালক ইবনে আলি (রাঃ) বর্ণনা করেন: আমরা এক প্রতিনিধি দল হিসেবে রওনা হলাম, অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছালাম। আমরা তাঁর কাছে বায়আত করলাম এবং তাঁর সঙ্গে নামাজ আদায় করলাম। তিনি যখন নামাজ শেষ করলেন, তখন এক ব্যক্তি—যেন সে একজন বেদুঈন—এসে বলল: "হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি নামাজে নিজের লিঙ্গ স্পর্শ করে, তার ব্যাপারে আপনার কী মত?" তিনি ﷺ বললেন: "ওটা তো তোমার শরীরের একটি অংশ মাত্র।" (সুনান আন-নাসাঈ)

যেমন লিঙ্গ মানবদেহের একটি অংশ, তেমনি পায়ুপথও মানবদেহের একটি অংশ। অতএব, দুবুর স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হবে না। যেসব নুসূসে লিঙ্গ স্পর্শে অজু করার কথা এসেছে, সেখানে দুবুর স্পর্শের কথা উল্লেখ নেই। অতএব মূলনীতি হলো — পবিত্রতা বহাল আছে এবং অজু ভঙ্গ হয়নি। এই মূলনীতি থেকে তখনই সরে আসা হবে, যখন নিশ্চিত দলিল প্রমাণিত হবে।

প্রশ্ন ২৮১: দুই অণ্ডকোষ, উরুর সংযোগস্থল (যেখানে ময়লা জমে) এবং নিতম্ব স্পর্শ করলে কি অজু ভঙ্গ হয়?

উত্তর ২৮১: অণ্ডকোষ, উরুর সংযোগস্থল এবং নিতম্ব স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় না। এবিষয়ে চার মাযহাব — হানাফি, মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বালি — একমত। অধিকাংশ আলেমও এই মতের পক্ষে। কারণ এই অঙ্গগুলো স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় — এমন কোনো দলিল শরীয়তে নেই। অতএব মূলনীতি হলো — অজু বহাল আছে। অজু ভঙ্গ হয়েছে — এমন বিধান কেবল দলিলের ভিত্তিতেই সাব্যস্ত হবে।

প্রশ্ন ২৮২: চতুষ্পদ প্রাণীর লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে কি অজু ভঙ্গ হয়?

উত্তর ২৮২: চতুষ্পদ প্রাণীর (হিংস্র জন্তু ব্যতীত) লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় না। এ বিষয়ে চার মাযহাব — হানাফি, শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বালি — একমত। অধিকাংশ আলেমও এই মতের পক্ষে। ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এবিষয়ে ইজমা (সম্মিলিত ঐকমত্য) উল্লেখ করেছেন। কারণ কুরআন, সহিহ সুন্নাহ বা সঠিক কিয়াস — কোনো কিছু থেকেই প্রমাণিত হয় না যে এটি অজু ভঙ্গকারী।

প্রশ্ন ২৮৩: ধর্মত্যাগ (ইরতিদাদ) করলে অজু ভঙ্গ হয় কি?

উত্তর ২৮৩: এবিষয়ে আলেমদের দুইটি মত রয়েছে।

প্রথম মত:

ইরতিদাদ অজু ভঙ্গকারী। এটি মালেকি ও হাম্বালি মাযহাবের মত। শাফেয়ি মাযহাবের একটি বর্ণনাতেও এই মত রয়েছে। সালাফদের একটি দল এবং ইবনে তাইমিয়্যা ও ইবনে বায এই মত গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ "যে ব্যক্তি ঈমান অস্বীকার করে, তার আমল অবশ্যই বিনষ্ট হয়ে যায়।" (সূরা মায়িদা: ৫)

আরও বলেন:

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ "নিশ্চয়ই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে—যদি তুমি শিরক করো, তবে তোমার আমল অবশ্যই বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা যুমার: ৬৫)

অজু একটি আমল। সুতরাং উপরোক্ত আয়াতসমূহের আলোকে ইরতিদাদ করলে অজুর আমলও বিনষ্ট হয়ে যাবে।

আবু মালিক আল-আশ'আরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। 'আলহামদু লিল্লাহ' পাল্লা (আমলের দাঁড়িপাল্লা) পূর্ণ করে দেবে। 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদু লিল্লাহ' আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেয় (বা পূর্ণ করবে)। সালাত হলো নূর (আলো)। সদকা হলো প্রমাণ। ধৈর্য হলো জ্যোতি। কুরআন তোমার পক্ষে প্রমাণ অথবা তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ সকালে বের হয়—কেউ নিজেকে বিক্রি করে মুক্ত করে, আর কেউ নিজেকে ধ্বংস করে।" (সহিহ মুসলিম: ২২৩)

যখন পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক হিসেবে গণ্য হলো, আর মুরতাদ হওয়া (ধর্মত্যাগ) ঈমানকেই বাতিল করে দেয়, তখন তা অজুকেও বাতিল করবে। কারণ অজু হলো ঈমানের অর্ধেকের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় মত:

ইরতিদাদ দ্বারা অজু ভঙ্গ হয় না। এটি হানাফি, শাফেয়ি এবং মালেকি মাযহাবের একটি মত। ইবনে হাজম ও ইবনে উসাইমিন এই মত গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾ "তোমাদের কেউ যদি নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যায় এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে তাদের আমল দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে।" (সূরা বাকারা: ২১৭)

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়—ইরতিদাদ করলে আমল তখনই বিনষ্ট হবে, যখন সে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। অর্থাৎ কেবল ইরতিদাদই সঙ্গে সঙ্গে সব আমল বাতিল করে দেয় না; বরং মৃত্যু পর্যন্ত সেই অবস্থায় থাকা শর্ত।

দ্বিতীয়ত—কুরআন, সহিহ বা দুর্বল কোনো সুন্নাহ, ইজমা কিংবা কিয়াস দ্বারা এমন কোনো স্পষ্ট দলিল নেই যে ইরতিদাদ অজু ভঙ্গ করে। বরং আলেমদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে যে—ইরতিদাদ জানাবাতের গোসল, হায়েযের গোসল কিংবা পূর্ববর্তী পবিত্রতা (যদি সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল করে না। তাহলে অজু কেন বাতিল হবে?

নোট: শায়খ রেজাউল্লাহ্ আবদুল কারিম প্রথম মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন—অর্থাৎ ঈমান অবশিষ্ট না থাকলে অজুও অবশিষ্ট থাকবে না।

প্রশ্ন ২৮৪: অজু ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্তসার দিন।

উত্তর ২৮৪: ১. বড়ো হাদাস—যেমন সহবাস (জানাবাত), হায়েয ও নিফাস—যার দ্বারা গোসল ফরজ হয়। (সূরা মায়িদা: ৫:৬)

২. মাযি ও ওয়াদী দ্বারা অজু ভঙ্গ হয়।

মাযি: যৌন উত্তেজনার সময় বিশেষ স্থান থেকে নির্গত পাতলা সাদা তরল; পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে সমান। (সহিহ বুখারি: ১৩২)

৩. পেশাবের ফোঁটা বের হলে অজু ভঙ্গ হয়। (সহিহ বুখারি: ২২৮)

৪. বায়ু নির্গমন। (সহিহ বুখারি: ১৩৭)

৫. পায়খানা করা। (সূরা মায়িদা: ৫:৬; সহিহ বুখারি: ৬৯৫৪)

৬. গভীর নিদ্রা। (সুনান আবু দাউদ: ২০৩ – হাসান)

৭. কামনাসহ সরাসরি লজ্জাস্থান স্পর্শ। (শায়খ আলবানির প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত; সুনান নাসাঈ: ১৬৩)

৮. সহবাসের ফলে বীর্য নির্গমন—এতে অজু ও গোসল উভয়ই আবশ্যক। (সহিহ বুখারি: ২৯১)

৯. উটের গোশত খাওয়া। (সহিহ মুসলিম: ৩৬০)

১০. বুদ্ধি লোপ পাওয়া—যেমন অজ্ঞান, পাগলামি বা মৃগী। (সহিহ বুখারি: ৬৮৭; ইজমা—ইবনুল মুনযির)

প্রশ্ন ২৮৫: মাযি ও ওয়াদি কী?

উত্তর ২৮৫:

মাযী :

মাযী বলতে বোঝায় — বিশেষ অঙ্গ (লজ্জাস্থান) থেকে নির্গত সাদা রঙের তরল, যা স্বামী-স্ত্রীর চুম্বন, আলিঙ্গন বা ঘনিষ্ঠতার কারণে বের হতে পারে। তবে মাযী শুধু স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতার কারণেই বের হয়—এমন নয়। এটি যৌন উত্তেজনার কারণে বের হতে পারে, আবার কখনও উত্তেজনা ছাড়াও বা কোনো রোগের কারণেও বের হতে পারে।

ওয়াদী:

ওয়াদী বলতে বোঝায় — পেশাবের আগে বা পরে নির্গত চকচকে, আঠালো, তরল ধরনের পদার্থ। কিছু আলেম একে পেশাবের ফোঁটার সঙ্গেও তুলনা করেছেন, যা অনেক সময় পেশাব করার কিছুক্ষণ পর বের হয়।

মাযী হোক বা ওয়াদী—উভয় অবস্থায়ই অজু করা আবশ্যক। আর গোসল ফরজ হয় কেবল মানি (বীর্য) নির্গমনের পর।

প্রশ্ন ২৮৬: পেশাবের ফোঁটা বের হলে অজু ভঙ্গ হয় কি?

উত্তর ২৮৬: এ বিষয়ে আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে যে, লজ্জাস্থানের দুই পথ (সামনে ও পেছনে) দিয়ে কিছু বের হলে অজু ভঙ্গ হয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে অজুর পর যদি পেশাবের ফোঁটা বের হয়, তবে অজু ভেঙে যাবে। তবে আলেমরা বলেন—যার পেশাবের ফোঁটা বের হয়েছে বলে সন্দেহ হয়, তার নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে একটি মৌলিক নীতি রয়েছে:

اليقين لا يزول بالشك

“নিশ্চয়তা সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না।”

সহিহ হাদিসে এসেছে—আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ আনসারি (রা.) বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করল যে, নামাজে সে কিছু অনুভব করে। নবী ﷺ বললেন: “সে যেন নামাজ থেকে না সরে, যতক্ষণ না সে শব্দ শোনে বা গন্ধ পায়।” (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

উপরোক্ত হাদিস ও ইমাম নবাবি-এর উক্তি ‘কিছু বের হওয়া’ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। তবে মূলনীতি একটিই—যদি কারও পেশাবের ফোঁটা বের হওয়ার রোগ থাকে এবং সে এ ব্যাপারে নিশ্চিতও হয়, তাহলে:

- যদি নামাজের আগে ঘটে, তবে অজু করা আবশ্যক।
- আর যদি নামাজ চলাকালীন ঘটে, তবে তার অজু নষ্ট হবে না।

প্রশ্ন ২৮৭: পেশাবের ফোঁটা থেকে কীভাবে বাঁচা যায়?

উত্তর ২৮৭: যার পেশাবের ফোঁটা পড়ার সমস্যা আছে, সে পেশাবের পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। পেশাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার জন্য ভালোভাবে পরিষ্কার করবে। কখনও কাশি দিলে বা সামান্য হাঁটাচলা করলে অবশিষ্ট ফোঁটা বের হয়ে যায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর যখন নিশ্চিত হবে যে আর কিছু বের হচ্ছে না, তখন অজু করবে। পেশাব শেষ করা ও জামাতে নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে এতটা ব্যবধান রাখা উচিত, যাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এই

ক্ষেত্রে চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নেওয়া অপ্রয়োজনীয় নয়; বরং প্রয়োজনীয়। কারণ এ রোগ থাকলে নামাজ ও অন্যান্য ইবাদতে অসুবিধা অব্যাহত থাকবে। তাই রোগের চিকিৎসা করা জরুরি। এই সমস্যার দুইটি অবস্থা হতে পারে:

(১) যদি রোগ খুব প্রবল হয়:

উলামায়ে কেরাম বলেন—এ ব্যক্তি 'মাজুর' (অপরাগ) হিসেবে গণ্য হবে। সে নামাজের সময় শুরু হলে অজু করবে এবং ঐ অজু দিয়ে ফরজ নামাজ ও অন্যান্য ইবাদত আদায় করতে পারবে। তবে সময় শেষ হলে তার অজুও শেষ বলে গণ্য হবে। (শায়খ ইবনে উসাইমিন–এর মতে: সময় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অজু করা উত্তম; জামাত শুরু হলে বিলম্ব না করা উচিত।)

(২) যদি ফোঁটার সমস্যা সামান্য হয়:

তাহলে সে 'মাজুর' গণ্য হবে না। সে ভালোভাবে পেশাব করে, পরিষ্কার হয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে অজু করবে এবং নামাজ আদায় করবে।

প্রশ্ন ২৮৮: বায়ু নির্গমনের রোগ ও তার বিধান আলোচনা করুন।

উত্তর ২৮৮: কিছু মানুষের বায়ু নির্গমনের রোগ থাকে—অর্থাৎ নিয়মিত বায়ু বের হতে থাকে। এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, যেমন ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা বলেন:

"এদের হুকুম সেই সকল অপারগ ব্যক্তিদের মতো—যেমন ইস্তিহাযা (রক্তস্রাব), পেশাবের ফোঁটা নির্গমন, মাযি, অথবা এমন ক্ষত যা শুকায় না। এরা অক্ষম শ্রেণিভুক্ত। যদি কেউ নামাজের সময় পূর্ণ অজু ধরে রাখতে অক্ষম হয়, তবে সে অজু করে নামাজ শুরু করবে। নামাজ চলাকালীন এজাতীয় কিছু বের হলেও তা তার অজুকে নষ্ট করবে না। এ বিষয়ে উলামাদের ঐকমত্য রয়েছে। তবে প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করতে হবে।" (মাজমু' ফাতাওয়া, ২১/২২১)

শায়খ ইবনে উসাইমিন (রহ.) বলেন: "যে গ্যাসের অভিযোগ করা হয়েছে, তার হুকুম ইস্তিহাযা ও পেশাবের ফোঁটা রোগীর মতো।" (আশ-শারহুল মুমতি', ১/৪১৩)

অর্থাৎ, এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করবে। নামাজের মধ্যে বায়ু বের হলেও সে তা উপেক্ষা করবে; কারণ এটি অপারগদের অন্তর্ভুক্ত। ইনশাআল্লাহ, এ বিষয়ে তার জবাবদিহি হবে না। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

প্রশ্ন ২৮৯: দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নির্গমন ও তার বিধান।

উত্তর ২৮৯: মাদান ইবনে আবু তালহা বর্ণনা করেন, সাহাবি উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) একবার জুমার খুতবায় বলেন (দীর্ঘ হাদিসের শেষাংশ): "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে দেখেছি—যখন তিনি

মসজিদে কারও কাছ থেকে (রসুন বা পেঁয়াজের) গন্ধ পেতেন, তখন তাকে বাকি‘ কবরস্থানের দিকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন।” (সহিহ মুসলিম: ৫৬৭ [১২৫৮])

কিছু আলেম এই হাদিস থেকে বলেন—যে কোনো দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা উচিত নয়। কারণ মসজিদকে সব ধরনের নাপাক ও দুর্গন্ধ থেকে পবিত্র রাখা জরুরি। এতে মুসল্লি ও ফেরেশতারা কষ্ট পায়। অতএব, যে ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত, তার উচিত দ্রুত চিকিৎসা করা—যাতে অন্যদের কষ্টের কারণ না হয়। ওয়াল্লাহু আ‘লাম।

প্রশ্ন ২৯০: ঘুমালে কি অজু ভেঙে যায়?

উত্তর ২৯০: এ বিষয়ে উলামাদের বিভিন্ন মত রয়েছে:

১. যে কোনো অবস্থায় ঘুম অজু ভঙ্গকারী।

২. কোনো অবস্থাতেই ঘুম অজু ভঙ্গকারী নয়।

৩. বসা অবস্থায় তন্দ্রা বা হালকা ঘুমে অজু ভাঙে না।

৪. গভীর ঘুম—অবস্থান যাই হোক—অজু ভঙ্গকারী। (এই মতকে শায়খ আলবানি ও ইমাম শাওকানি প্রাধান্য দিয়েছেন।)

প্রশ্ন ২৯১: নামাজের মধ্যে ঘুমালে অজু ভাঙে কি?

উত্তর ২৯১: কিছু আলেম বলেন—নামাজে দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা—এই ধারাবাহিক নড়াচড়ার কারণে গভীর ঘুম সম্ভব নয়।

তবে ‘ঘুমের অবস্থায় অজু না ভাঙা’—এটি নবীগণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। একটি হাদিসে এসেছে:

“নবী ﷺ নামাজ আদায় করলেন যতক্ষণ আল্লাহ চাইলেন; তারপর শুয়ে পড়লেন ও ঘুমালেন, এমনকি নাক ডাকতে লাগলেন। এরপর মুয়াজ্জিন এলেন, তিনি নবী ﷺ-কে নামাজের সংবাদ দিলেন। তিনি উঠে নামাজ আদায় করলেন, অজু করলেন না।”

সুফিয়ান (রহ.) বলেন: আমরা আমরকে বললাম, কিছু লোক বলে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চোখ ঘুমাতো কিন্তু তাঁর হৃদয় ঘুমাতো না। আমর বললেন: আমি উবাইদ ইবনে উমাইরকে বলতে শুনেছি—তিনি বলতেন, নবীগণের স্বপ্নও ওহী হয়। এরপর তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করেন: “আমি স্বপ্নে দেখছি যে আমি তোমাকে যবেহ করছি।” (সহিহ বুখারি: ১৩৮)

ঘুম কি অজু ভঙ্গ করে?

কিছু আলেম বলেন, ঘুম নিজে নিজে অজু ভঙ্গকারী নয়। বরং ঘুমের কারণে অজু ভঙ্গ হয় এ জন্য যে, ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে না। ঘুমের মধ্যে

বাতাস নির্গত হলেও সে টের পায় না। কিন্তু এই কারণ থেকে নবীগণ মুক্ত। নবীদের অজু ঘুমের অবস্থাতেও ভঙ্গ হয় না। কারণ তাঁদের চোখ ঘুমালেও হৃদয় ঘুমায় না। অর্থাৎ যদি ঘুমের মধ্যে তাঁদের অজু ভঙ্গ হয়, তবে তাঁরা তা জানতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ঘুমের মধ্যে কোনো জ্ঞান বা সচেতনতা থাকে না। সে বুঝতে পারে না তার অজু ভেঙেছে কি না। অতএব, ঘুমে অজু না ভাঙার বিষয়টি নবীগণের জন্য বিশেষ; সাধারণ মানুষের জন্য নয়। নবীদের ক্ষেত্রে ঘুমের মধ্যেও ওহি আসতে পারে—এ কারণেই বলা হয়, তাঁদের চোখ ঘুমায় কিন্তু হৃদয় ঘুমায় না।

প্রশ্ন ২৯২: "গোঠ" (এক ধরনের গুটিয়ে বসা অবস্থায়) মেরে বসে ঘুমালে কি অজু ভঙ্গ হয়?

উত্তর ২৯২: الإحتباء (গোঠ মেরে বসা) গোঠ মেরে বসা বলতে বোঝায়— কাপড় বা হাতের সাহায্যে হাঁটু ও পেটকে জড়িয়ে ধরে বসা। অর্থাৎ হাঁটু দুটি খাড়া করে, পায়ের তলা মাটিতে রেখে, দুই হাত পায়ের পিণ্ডলিতে রেখে বসা। এ অবস্থাকে "ইহতিবা" বলা হয়।

গোঠ মেরে বসে ঘুমানো, দাঁড়িয়ে ঘুমানো অথবা সিজদায় ঘুমানোর কারণে অজু ভঙ্গ হয় না—যতক্ষণ না ব্যক্তি শুয়ে ঘুমায়। যখন কেউ শুয়ে ঘুমায়, তখন তার অজু করতে হবে। এই বর্ণনাটি মাওকুফ। (সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাকি ১/১৯৭)

নোট: শায়খ আলবানি (রহ.) এ বর্ণনাটি "সিলসিলাহ আহাদিস আয-যাঈফাহ"-তে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন এটি মাওকুফ। তিনি বলেন, এর সনদ ভালো যেমন ইবনে হাজার "আল-তালখীস"-এ বলেছেন, তবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো—এর বিপরীত অনুযায়ী আমল করা হবে, যেমন পূর্ববর্তী হাদিসে উল্লেখ হয়েছে। (সিলসিলাহ আহাদিস আয-যাঈফাহ: ২/৩৭১)

ঘুম দুই প্রকার:

1. হালকা ঘুম (তন্দ্রা)
2. গভীর ঘুম

নিঃসন্দেহে গভীর ঘুম অজু ভঙ্গ করে। কিন্তু হালকা ঘুম বা তন্দ্রা অজু ভঙ্গ করে না। এই দুই প্রকার ঘুম (হালকা ও গভীর) আবার তিন ভাগে বিভক্ত:

(১) দীর্ঘ ও ভারী গভীর ঘুম

এটি এমন এক ধরনের গভীর ও ভারী ঘুম, যাতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও সচেতনতা কার্যকর থাকে না। এই অবস্থায় মানুষ বুঝতে পারে না যে ঘুমের মধ্যে সে কী করেছে বা কী করেনি। এই ধরনের ঘুমের আরও কিছু লক্ষণ হলো—

- হাত থেকে কিছু পড়ে গেলে সে টের পায় না
- মুখ থেকে লালা বের হলেও সে তা বুঝতে পারে না
- কোনো শব্দ শুনতে পায় না

- কিছু দেখতে পায় না

এটি প্রকৃত গভীর ঘুম, এবং এ অবস্থায় অজু ভঙ্গ হয়ে যায়।

(২) স্বল্প সময়ের ভারী ঘুম

এই ঘুমকেও গভীর ঘুমের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়, এবং এ অবস্থাতেও অজু ভঙ্গ হয়ে যায়।

(৩) হালকা স্বল্প ঘুম (তন্দ্রা)

এটি মূলত হালকা ঘুম বা তন্দ্রা। এ বিষয়ে আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে যে, তন্দ্রা বা হালকা ঘুমে অজু ভঙ্গ হয় না।

গভীর ঘুম—তা দীর্ঘ হোক বা স্বল্প—উভয় অবস্থায় অজু করা ফরজ। আল্লাহ তাআলা কুরআনে সূরা মায়িদা (৫:৬)-এ বলেন:

“যখন তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধুয়ে নাও...” অতএব, যে ব্যক্তি নামাজের জন্য উঠবে, তার উচিত প্রথমে অজু করা। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় জায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.) বলেন:

“এই আয়াতের অর্থ হলো—যখন তোমরা বিছানা (অর্থাৎ ঘুম) থেকে উঠে নামাজের জন্য দাঁড়াবে...” (মুওয়াত্তা মালিক: ৩৮)

এখানে “إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ” দ্বারা “ঘুম থেকে ওঠা” বোঝানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সাইয়্যিদনা সফওয়ান ইবনে উসসাল (রাঃ)-এর হাদিস এবং সাইয়্যিদনা আলি (রাঃ)-এর হাদিসও উল্লেখ করা হয়েছে। শায়খ আলবানি (রহ.) সফওয়ান (রাঃ)-এর হাদিসকে হাসান বলেছেন। এই দুই হাদিস প্রমাণ করে যে গভীর ঘুম অজু ভঙ্গ করে। কারণ গভীর ঘুমে মানুষ বুঝতে পারে না তার থেকে বায়ু নির্গত হয়েছে কি না। এখানে গভীর ঘুম বলতে—

- দীর্ঘ গভীর ঘুম
- স্বল্প গভীর ঘুম

উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

অন্যদিকে, হালকা ঘুম বা তন্দ্রায় মানুষের সচেতনতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। অতএব এ অবস্থায় অজু ভঙ্গ হয় না। সাইয়্যিদনা আনাস (রাঃ)-এর হাদিসও এ বিষয়ে প্রমাণ বহন করে। তিনি বলেন, সাহাবাগণ নামাজের অপেক্ষায় বসে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যেতেন, এরপর নবী কারিম ﷺ নামাজ পড়ালে তাঁরা অজু না করেই নামাজ আদায় করতেন। এই হাদিসের আলোকে ইমাম নববি (রহ.) একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন: “বসে ঘুমালে অজু ভঙ্গ হয় না—এর প্রমাণ।” অধিকাংশ আলেম এ মতেই আমল করেছেন। অতএব, সব দলিলের আলোকে বিষয়টি স্পষ্ট যে—

- গভীর ঘুম অজু ভঙ্গ করে
- হালকা ঘুম ও তন্দ্রা অজু ভঙ্গ করে না। والله أعلم

প্রশ্ন ২৯৩: লজ্জাস্থানে হাত লেগে গেলে কি অজু ভঙ্গ হয়?

উত্তর ২৯৩: নোট: এ বিষয়টি তখনই প্রযোজ্য যখন হাত সরাসরি (কোনো আবরণ ছাড়া) লাগে। কাপড়ের ওপর দিয়ে স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হবে না।

লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় কি না—এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

প্রথম মত:

লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয়।

"আমি মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে গেলাম। আমরা আলোচনা করছিলাম কোন কোন কারণে অজু ফরজ হয়। মারওয়ান বললেন: 'লিঙ্গ স্পর্শ করলে অজু করতে হবে।' উরওয়া বললেন: 'আমি এ কথা জানি না।' মারওয়ান বললেন: 'বুসরাহ বিনতু সাফওয়ান (রাঃ) আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন: 'তোমাদের কেউ যদি নিজের লিঙ্গ স্পর্শ করে, তবে সে যেন অজু করে।'" (সুনান আন-নাসাঈ: ১৬৩)

ইমাম শাওকানি (রহ.)-এর মন্তব্য:

তিনি বলেন: এই হাদিসটি ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ি, ইমাম ইবনে খুযাইমাহ, ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম হাকিম এবং ইমাম ইবনে জারুদ বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ বলেন: আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—বুসরাহ বিনতু সাফওয়ানের হাদিস কি সহিহ? তিনি বলেন: "হ্যাঁ, এটি সহিহ।" ইমাম দারাকুতনি, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, ইবনে আবদুল বার, আবু হামিদ ইবনে শারাফি (মুসলিমের শিষ্য), বায়হাকি এবং খাযিমি — সবাই এ হাদিসকে সহিহ বলেছেন। (নাইলুল আওতার: ১/২৪৯)

মুস'আব ইবনে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন: "আমি কুরআন মাজিদ ধরে রাখতাম, আর সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) তিলাওয়াত করতেন। একদিন আমি শরীর চুলকাতে গিয়ে (লজ্জাস্থানে হাত লাগালাম)। সা'দ বললেন: 'সম্ভবত তুমি তোমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করেছ?' আমি বললাম: 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন: 'যাও, অজু করে আসো।' আমি গিয়ে অজু করে ফিরে এলাম।" (মুওয়াত্তা মালিক, হাদিস ৮৯)

প্রশ্ন ২৯৪: পুরুষ ও নারী উভয়েই কি এই বিধানে সমান?

উত্তর ২৯৪: পুরুষ ও নারী উভয়েই এই বিধানে সমান।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"যে পুরুষ নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, সে যেন অজু করে। আর যে নারী নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, সেও যেন অজু করে।" (মুসনাদে আহমদ ৭০৭৬ — সহিহ)

শায়খ আলবানি এটিকে "সাহিহুল জামি'" (২৭২৫)-এ সহিহ বলেছেন। শায়খ শু'আইব আরনাউত একে "হাসান" বলেছেন। (মুসনাদে আহমাদ: ১১/৬৪৮)

লজ্জাস্থান ও হাতের মাঝে আবরণ না থাকলে নতুন অযু বাধ্যতামূলক। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তোমাদের কেউ যদি নিজের লজ্জাস্থানে সরাসরি (কোনো আবরণ ছাড়া) হাত দেয়, তবে তার ওপর অজু ফরজ হবে।" (সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৩৫)

জায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানি (রাঃ) বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: 'যে লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, সে যেন অজু করে।'" (মুসনাদ আহমদ ২১৫৮৫)

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবিবা (রাঃ) বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: 'যে নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, সে যেন অজু করে।'" (সুনান ইবনে মাজাহ ৪৮১)

নাফি' (রহ.) বলেন: একদিন সাইয়্যিদনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) ফজরের নামাজ আদায় করলেন। এরপর তিনি বললেন: "আমি (ফজরের সময়) আমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করেছিলাম এবং তা ভুলে গিয়েছিলাম। (লজ্জাস্থান স্পর্শ করার পর আমি অজু ছাড়াই ফজরের নামাজ পড়ে ফেলেছি।) এজন্য আমি পুনরায় ফজরের নামাজ আদায় করেছি।" (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা: ১৭৪৮)

আরেক বর্ণনায় নাফি' (রহ.) বলেন: সাইয়্যিদনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) লজ্জাস্থান স্পর্শ করার পর নতুন করে অজু করতেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা: ১৭৪৯)

আরেকটি বর্ণনায়: শাবাবাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: শু'বা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, কাতাদাহ থেকে, তিনি 'আতা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে তাঁরা বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে, সে অজু করবে।" (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা: ১৭৫২)

দ্বিতীয় মত: অজু ভঙ্গ হয় না

তালক ইবনে আলি (রাঃ) বর্ণনা করেন: "আমরা নবী কারিম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম। এমন সময় একজন ব্যক্তি এলেন, তাকে দেখতে বেদুঈনের মতো মনে হচ্ছিল। তিনি বললেন: "হে আল্লাহর নবী! কেউ অজু করার পর নিজের লিঙ্গ স্পর্শ করলে এ ব্যাপারে আপনার কী মত?" নবী ﷺ উত্তরে বললেন: "এটি তো তার শরীরের একটি গোশতের টুকরো মাত্র।" অথবা তিনি বলেছেন: "এটি তো তার শরীরের একটি অংশ।" (সুনান আবু দাউদ: ১৮২)

তৃতীয় মত: দুই হাদিসের মধ্যে সমন্বয়

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.), শায়খ ইবনে উসাইমিন (রহ.) এবং সাহাবি সাইয়্যিদনা তালক ইবনে আলি (রাঃ) ও সাইয়্যিদা বুসরাহ বিনতু সাফওয়ান (রাঃ)-এর হাদিসদ্বয়ের মধ্যে

এভাবে সমন্বয় করেছেন: তাঁরা বলেন— যে ব্যক্তি কামনা (শাহওয়াত) সহকারে লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে, তার ওপর অজু আবশ্যক হবে।

আর যে ব্যক্তি কামনা ছাড়া স্পর্শ করবে—চাই সে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির লজ্জাস্থান হোক বা ছোটো শিশুর লজ্জাস্থান—তার ওপর অজু আবশ্যক হবে না। অর্থাৎ, সাইয়্যিদনা তালক ইবনে আলি (রাঃ)-এর হাদিস প্রমাণ করে যে কামনা ছাড়া লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় না। আর সাইয়্যিদা বুসরাহ বিনতু সাফওয়ান (রাঃ)-এর হাদিস প্রমাণ করে যে কামনা সহকারে লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু আবশ্যক হয়। অতএব এবিষয়ে আমরা বলি— যদি কেউ কামনার সঙ্গে লজ্জাস্থানে হাত দেয়, তবে তার ওপর অজু ফরজ। আর যদি কেউ কামনা ছাড়া বা প্রয়োজনবশত লজ্জাস্থানে হাত দেয়, তবে তার অজু ভঙ্গ হবে না। কারণ, তালক ইবনে আলি (রাঃ)-এর হাদীসে বলা হয়েছে: "নিশ্চয়ই এটি তোমার শরীরের একটি অংশ মাত্র।" অতএব, যদি কেউ নিজের লজ্জাস্থানকে শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মতোই (কামনা ছাড়া) স্পর্শ করে, তবে সেটি শরীরের অন্য অংশ স্পর্শ করার মতোই হবে। যেমন মানুষ শরীরের অন্যান্য অঙ্গ কামনা ছাড়া স্পর্শ করে এবং এতে অজু ভঙ্গ হয় না, তেমনি লজ্জাস্থানও যদি কামনা ছাড়া স্পর্শ করা হয়, তবে অজু ভঙ্গ হবে না। এভাবেই দুই হাদিসের মধ্যে সমন্বয় (তাতবীক) করা সম্ভব। والله أعلم (আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত)।

শায়খ আলবানি (রহ.)-এর বক্তব্য:

শায়খ আলবানি (রহ.) বলেন: (সাইয়্যিদ সাবিক) ৪ নম্বর বিষয়ের অধীনে উল্লেখ করেছেন যে, আহনাফ (হানাফি মাজহাব)-এর মত হলো—লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় না। তাদের দলিল হলো তালক ইবনে আলি (রাঃ)-এর হাদিস। ঐ হাদীসে এসেছে যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন—কেউ যদি নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, তবে কি তার ওপর অজু ফরজ হবে? নবী ﷺ বললেন: "না, কারণ এটি তো তোমার শরীরের একটি অংশ।" ইমাম ইবনে হিব্বান এই হাদিসকে সহিহ বলেছেন। শায়খ আলবানি বলেন: নবী ﷺ-এর এই বক্তব্য—"এটি তো তোমার শরীরের একটি অংশ"—এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। তা হলো, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ না হওয়ার বিধান তখনই প্রযোজ্য, যখন তা কামনা (শাহওয়াত) সহ স্পর্শ করা না হয়। কারণ, স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরের একটি অঙ্গ আরেকটি অঙ্গকে স্পর্শ করার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—আর সাধারণত এধরনের স্পর্শ কামনাসহ হয় না। বিষয়টি সুস্পষ্ট। অতএব, এই হাদিস হানাফিদের জন্য দলিল নয়—অর্থাৎ যারা বলেন যে, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে কোনো অবস্থাতেই অজু ভঙ্গ হয় না—তাদের জন্য এ হাদিস প্রমাণ নয়। বরং এই হাদিস প্রমাণ করে—কামনা ছাড়া লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় না। কিন্তু যদি কেউ কামনার সঙ্গে স্পর্শ করে, তাহলে বুসরাহ বিনতু সাফওয়ান (রাঃ)-এর হাদিস অনুযায়ী অজু ভঙ্গ হবে। অতএব, তালক (রাঃ)-এর হাদিস ও বুসরাহ (রাঃ)-এর হাদিসের মধ্যে এভাবে

সমন্বয় করা যায়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এই মত গ্রহণ করেছেন—সম্ভবত তিনি তার কিছু গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ করেছেন—আমার এমন মনে পড়ে। (তামামুল মিনহা ফি তাহকীক 'আলা ফিকহিস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ১০২-১০৩) হাদিসের

সতর্কতামূলক মন্তব্য

সতর্কতার দিক থেকে উত্তম হলো— গোসলের সময় যদি কোনো আবরণ ছাড়া এবং কামনা ছাড়া লজ্জাস্থানে হাত লেগে যায়, তাহলে অজু করে নেওয়া ভালো—যাতে সন্দেহ না থাকে। কিন্তু যদি কখনো কামনা ছাড়া স্পর্শ হয়ে যায়, আর নামাজ আদায়ের পর তা মনে পড়ে, অথবা অতীতে এ অবস্থায় নামাজ পড়া হয়ে যায়—তাহলে সেই নামাজগুলো পুনরায় পড়তে হবে না। কারণ কিছু আলেম (যেমন: ইবনে তাইমিয়া ও শায়খ আলবানি) বলেছেন—কামনা ছাড়া লজ্জাস্থান স্পর্শ করা শরীরের অন্য অঙ্গ স্পর্শ করার মতোই; এতে অজু ভঙ্গ হয় না। والله أعلم

প্রশ্ন ২৯৬: ছোটো ছেলে-মেয়েদের লজ্জাস্থান স্পর্শের বিধান ?

উত্তর ২৯৬: সকলেই জানেন যে ছোটো ছেলে-মেয়েদেরকে সাধারণত ঘরের মহিলারাই ইস্তিঞ্জা করান—অর্থাৎ তাদের লজ্জাস্থান ধৌত করেন, গোসল করান, কাপড় পরান। এ সময় লজ্জাস্থানে হাত লাগা স্বাভাবিক। তাই এবিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, যদি শিশুদের লজ্জাস্থানে হাত লেগে যায় তো অজু ভঙ্গ হবে কিনা। এই বিষয়ে উলামাদের দুটি মত রয়েছে:

১. লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয়

২. অজু ভঙ্গ হয় না

ইমাম ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি (রহ.) বলেন:

ছোটো ও বড়ো—উভয়ের লজ্জাস্থান স্পর্শের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। আতা, শাফেয়ি, আবু সাওর (রহ.) প্রমুখ বলেন—ছোটো হোক বা বড়ো, কারো লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হবে।

কিন্তু যুহরী ও আওযাঈ বলেন—ছোটো শিশুর লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হবে না, কারণ প্রয়োজনে ছোটো শিশুর লজ্জাস্থান দেখা ও স্পর্শ করা জায়েজ। একটি বর্ণনায় এসেছে—নবী ﷺ হাসান (রাঃ)-এর "যুবাইবাহ" (অর্থাৎ ছোটো লজ্জাস্থান) চুম্বন করেছিলেন, এবং স্পর্শ করেছিলেন কিন্তু অজু করেননি।

তবে এই বর্ণনার শব্দ "স্পর্শ করেছিলেন কিন্তু অজু করেননি"—দুর্বল (যাঈফ), যেমন ইমাম বায়হাকি উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বায়হাকি বলেন—

এই সনদ শক্তিশালী নয়, এবং এতে নেই যে তিনি হাতে স্পর্শ করেছিলেন, তারপর নামাজ পড়েছেন ও অজু করেননি। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.)ও এটিকে দুর্বল বলেছেন। (আল-তালখিসুল হুবায়র: ১/৩৫২)

শায়খ ইবনে বায (রহ.)–এর বক্তব্য:

প্রশ্ন: আমি যদি অজু অবস্থায় কোনো শিশুকে ধুই, তাহলে কি আমার অজু ভঙ্গ হবে?

উত্তর: হ্যাঁ। যদি আপনি শিশুর লজ্জাস্থান সরাসরি স্পর্শ করেন, তবে অজু ভঙ্গ হবে। ছোটো ও বড়ো উভয়ের ক্ষেত্রেই একই বিধান। তবে যদি আবরণ থাকে (যেমন কাপড় বা গ্লাভস), তাহলে অজু ভঙ্গ হবে না। (নূর 'আলা আদ-দারব)

শায়খ ইবনে উসাইমিন (রহ.)–এর বক্তব্য:

প্রশ্ন: শিশুর লজ্জাস্থান ধুলে কি অজু ভঙ্গ হবে?

উত্তর: না। শিশুর লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় না। এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের লজ্জাস্থান স্পর্শ করলেও অজু ভঙ্গ হয় না—যতক্ষণ না তা কামনার সঙ্গে স্পর্শ করা হয়।

(লিকাউল বাবিল মাফতূহ – ইবনে উসাইমিন (রহ.) খণ্ড: ৩১ / পৃষ্ঠা: ১৬২, বিষয়: শিশুর লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজুর প্রভাব, এই গ্রন্থটি মূলত শায়খের সেই বৈঠকসমূহের সংকলন, যা তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার তাঁর বাসভবনে পরিচালনা করতেন। এই বৈঠকগুলো শুরু হয় ১৪১২ হিজরির শাওয়ালের শেষের দিকে এবং শেষ হয় ১৪২১ হিজরির ১৪ সফর বৃহস্পতিবারে। গ্রন্থের উৎস: অডিও দারস, যা ইসলামিক নেটওয়ার্ক সাইট লিখিত রূপ দিয়েছে।)

শায়খ সালিহ আল-ফাওযান (হাফিজাহুল্লাহ)-এর বক্তব্য:

প্রশ্ন: শিশুর লজ্জাস্থান স্পর্শ করার বিধান কী? এতে কি অজু ভঙ্গ হয়, নাকি হয় না?

উত্তর: লজ্জাস্থান সামনে হোক বা পেছনে — স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয়। ছোটো বা বড়ো—উভয়ের ক্ষেত্রেই একই বিধান। এই বিষয়ে ছোটো ও বড়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (মাজমু' ফাতাওয়া শায়খ সালিহ আল-ফাওযান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২২, কিতাবুত তাহারাহ — "শিশুর লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয়")

স্থায়ী ফতোয়া বোর্ড (اللجنة الدائمة)-এর ফতোয়া

প্রশ্ন ২৯৭: শিশুর কাপড় পরিবর্তন করার সময় যদি তার লজ্জাস্থানে হাত লেগে যায়, তাহলে কি আমার অজু ভঙ্গ হবে?

উত্তর ২৯৭: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম রাসূল ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

যদি কোনো ব্যক্তি আবরণ (কাপড়, গ্লাভস ইত্যাদি) ছাড়া সরাসরি লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, তাহলে তার অজু ভঙ্গ হবে — চাই স্পর্শকৃত ব্যক্তি ছোটো হোক বা বড়ো। কারণ নবী ﷺ বলেছেন: "যে তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে, সে যেন অজু করে।" (ফতোয়া নং ১০৪৪৭-এর ৫ম প্রশ্ন) (আল-ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়িমাহ, প্রথম সংকলন, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৮৬ — "শিশুর লজ্জাস্থান স্পর্শ অজু ভঙ্গ করে") প্রণেতা: স্থায়ী কমিটি - ইলমী গবেষণা ও ফতোয়া, সংকলন ও বিন্যাস: আহমদ ইবনে আবদুর রাজ্জাক আদ-দুওয়াইশ, প্রকাশক: সৌদি আরব, রিয়াজ।)

প্রশ্ন ২৯৮: উটের গোশত খেলে কি অজু ভেঙে যায়?

উত্তর ২৯৮: উটের গোশত খেলে অজু ভেঙে যায় — এই বিষয়ে আলেমদের মধ্যে দুইটি মত রয়েছে।

প্রথম মত: কিছু আলেমের মতে, উটের গোশত খেলে অজু ভেঙে যায়।

দ্বিতীয় মত: কিছু আলেমের মতে, যে বস্তু আগুনে রান্না করা হয়, তা খেলে অজু ভাঙে না।

ইমাম নবাবি (রহ.) শারহে মুসলিম-এ বলেন: রাসূল ﷺ–এর শেষ আমল ছিল এই যে, তিনি আগুনে রান্না করা খাদ্য খাওয়ার পর অজু করতেন না — (হাদিস: জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ)। এই হাদিসটি সাধারণ (عام)। কিন্তু উটের গোশত খেলে অজু করার হাদিসটি বিশেষ (خاص)। আর ইসলামি উসূল অনুযায়ী — বিশেষ বিধান সাধারণ বিধানের উপর অগ্রাধিকার পায়। এই নীতি ইমাম শাফেয়ি (রহ.) এবং কিছু উসূলবিদের মত — এবং এটাই সঠিক মত। (নাইলুল আওতার, শাওকানি ১/২৫৩)

সারসংক্ষেপ: উটের গোশত খেলে অজু ভেঙে যায়। অতএব, উটের গোশত খাওয়ার পর নামাজের অজু করা আবশ্যক। এ বিষয়ে সাইয়্যিদুনা জাবির ইবনে সামুরাহ (রাঃ) এবং বারা ইবনে আযিব (রাঃ)-এর হাদিসে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এবং আহলে হাদিস আলেমদের মতে — উটের গোশত খাওয়ার পর অজু করা ফরজ। কিছু আলেমের ব্যাখ্যা অনুযায়ী — এতে স্নায়বিক প্রশান্তি আসে এবং নামাজে মনোযোগ বজায় থাকে। والله أعلم

প্রশ্ন ২৯৯: কোন কোন কারণে অজু ভেঙে যায় না?

উত্তর ২৯৯: নিচের বিষয়গুলো অজু ভঙ্গকারী নয়:

(১) ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও শায়খ আলবানি (রহ.)-এর মতে, কামনা ছাড়া লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভাঙে না।

(২) নারীকে স্পর্শ করলে, যদি বীর্যপাত না হয় — অজু ভাঙে না।

(৩) সামনে বা পেছনের পথ (লজ্জাস্থান) ছাড়া অন্য স্থান থেকে কিছু বের হলে — যেমন:

- ক্ষত থেকে রক্ত
- নাক দিয়ে রক্ত
- বমি
- হিজামার রক্ত

→ এতে অজু ভাঙে না।

(৪) হালকা ঘুম (তন্দ্রা) হলে অজু ভাঙে না। (শায়খ ইবনে বায, শায়খ ইবনে উসাইমিন)

(৫) অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হলে — অজু ভাঙে না।

নীতিঃ "নিশ্চয়তা সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না।" (اليقين لا يزول بالشك)

(৬) প্রস্রাব বের হওয়ার অনুভূতি হলো কিন্তু নিশ্চিত নয় — অজু ভাঙবে না।

(৭) চুল কাটা, নখ কাটা, মোজা বা জুরাব খুললে — অজু ভাঙে না।

(৮) যার স্থায়ী হাদাস (যেমন অবিরাম প্রস্রাব) আছে — এক নামাজের সময়ের মধ্যে পুনরায় কিছু বের হলেও অজু ভঙ্গকারী নয়।

(৯) সিদ্ধ ডিম বা আগুনে রান্না করা খাবার খেলে — অজু ভাঙে না। তবে অজু করা মুস্তাহাব (উত্তম), ফরজ নয়।

(১০) মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে — অজু ভাঙে না। তবে অজু করা মুস্তাহাব।

(১১) নামাজে জোরে হাসলে অজু ভাঙে না। (যে হাদিস এতে অজু ভঙ্গের কথা বলে, তা দুর্বল)

(১২) মিথ্যা বলা, গালি দেওয়া, গান গাওয়া — এতে অজু ভাঙে না। তবে এগুলো বড়ো গুনাহ, তাই এ থেকে বিরত থাকা জরুরি।

প্রশ্ন ৩০১: রক্ত বের হলে অজু ভেঙে যায় কি?

উত্তর ৩০১: এই বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। জুমহুর (অধিকাংশ) আলেমদের মত: রক্ত কম বের হোক বা বেশি — তাতে অজু ভেঙে যায় না। কিছু আলেমের মত: রক্ত বের হলে অজু ভেঙে যায়। আবার কিছু আলেম বলেন: যদি বেশি পরিমাণ রক্ত বের হয়, তাহলে অজু করা উত্তম।

প্রশ্ন ৩০২: সারসংক্ষেপ আলোচনা করুন।

উত্তর ৩০২: কিছু আলেম মনে করেন — রক্ত প্রবাহিত হলে অজু ভেঙে যায়। তাদের দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদিস: উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদা আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন: আবু হুবাইশের কন্যা ফাতিমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন: "আমি একজন নারী, আমার

ইস্তিহাযার (অসুস্থতাজনিত রক্তক্ষরণ) সমস্যা আছে। আমি পবিত্র থাকতে পারি না। তাহলে কি আমি নামাজ ছেড়ে দেব?" নবী ﷺ বললেন: "না। এটা তো একটি রগের রক্ত, হায়েয নয়। যখন তোমার হায়েয শুরু হবে তখন নামাজ ছেড়ে দেবে। আর যখন তা শেষ হবে, তখন তোমার শরীর ও কাপড় থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলবে, তারপর নামাজ পড়বে।" হিশাম বলেন, আমার পিতা উরওয়া বলেছেন যে নবী ﷺ আরো বলেছেন: "তারপর প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করবে, যতক্ষণ না সেই (হায়েযের) সময় আবার আসে।" (সহিহ বুখারি: ২২৮)

যারা বলেন রক্তে অজু ভেঙে যায় তাদের যুক্তি:

তাঁরা বলেন — নবী ﷺ ইস্তিহাযার ক্ষেত্রে অজু ফরজ করেছেন এই কারণে যে, এটি রগের রক্ত। যেহেতু শরীরের সমস্ত রক্তই রগ থেকে আসে, তাই যেকোনো রক্ত বের হলে নতুন অজু করা আবশ্যক।

নোট :

"এটি রগের রক্ত" — শরীরের সব রক্তই তো রগের ভেতরেই থাকে। ইস্তিহাযার রক্তের জন্য অজুর নির্দেশ এই কারণে নয় যে তা রগের রক্ত, বরং এ কারণে যে তা নির্গত হয় দুই পথ (সামনের বা পেছনের লজ্জাস্থান) দিয়ে। অতএব, শরীরের অন্য অংশ থেকে বের হওয়া রক্তকে ইস্তিহাযার রক্তের সঙ্গে কিয়াস করা — ভিন্ন প্রসঙ্গের উপর কিয়াস করা (قياس مع الفارق), যা সঠিক নয়; বরং বিভ্রান্তিকর।

অধিকাংশ আলেম বলেন: দুই পথ (লজ্জাস্থান) ছাড়া শরীরের অন্য কোনো অংশ থেকে রক্ত বের হলে অজু ভাঙে না। তারা নিম্নোক্ত কুরআনের আয়াত দলিল হিসেবে পেশ করেন:

"আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে ফিরে আসে, অথবা তোমরা নারীদের স্পর্শ করো, আর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো।" (সূরা মায়েদা ৫:৬)

উপরোক্ত হাদিস ও আছারসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়: রক্ত বের হলে — তা শরীরের যেকোনো স্থান থেকেই হোক — অজু ভাঙে না। যেমন:

- গলা থেকে রক্ত বের হওয়া
- মাড়ি থেকে রক্ত বের হওয়া
- হিজামা (শিঙা লাগানো) করলে রক্ত বের হওয়া
- আঘাতে রক্ত বের হওয়া
- ক্ষত থেকে রক্ত বের হওয়া
- ফোঁড়া বা পুঁজ ফেটে রক্ত বের হওয়া
- কম বা বেশি — যেকোনো পরিমাণ রক্ত

এসব কারণে অজু ভাঙে না। এবিষয়ে যে রেওয়ায়েতগুলো অজু ভঙ্গের কথা বলে — সেগুলো সবই দুর্বল (যাঈফ)। আর আলেমদের ঐক্যমত যে — দুর্বল হাদিস দ্বারা শরীয়তের বিধান প্রমাণ করা যায় না। বরং সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এমন অবস্থায়ও নামাজ আদায় করেছেন যখন তাদের শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। অতএব, এ বিষয়ে জুমহুর (অধিকাংশ) আলেমের মতই প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

প্রশ্ন ৩০৩: বমি করলে বা নাক দিয়ে রক্ত বের হলে কি অজু ভেঙে যায়?

উত্তর ৩০৩: বমি করা বা নাক দিয়ে রক্ত (নাকসির) বের হওয়ার কারণে অজু ভাঙে কি না — এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

- কিছু আলেম বলেন: অজু ভেঙে যায়।
- কিছু আলেম বলেন: অজু ভাঙে না।
- তবে অনেকে বলেন: অজু করে নিলে ভালো (উত্তম)।

শায়খ ইবনে উসাইমিন (রহ.)-এর বক্তব্য:

তিনি বলেন: সঠিক মত হলো — শরীর থেকে যা কিছুই বের হোক না কেন, তাতে অজু ভাঙে না।

- বমি করলে অজু ভাঙে না।
- রক্ত বের হলে অজু ভাঙে না।
- এবং সামনের ও পেছনের লজ্জাস্থান (প্রস্রাব-পায়খানার পথ) ছাড়া শরীরের অন্য কোনো অংশ থেকে কিছু বের হলে তাতেও অজু ভাঙে না।

যে বস্তু কেবল প্রস্রাব বা পায়খানার পথ দিয়ে বের হয় — কেবল সেটির কারণেই অজু ভাঙে। এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত (রাজিহ) মত। (লিকাউ বাবিল মাফতূহ, খণ্ড ২৯, পৃষ্ঠা ৮৬ — "বমির কারণে অজুর বিধান")

প্রশ্ন ৩০৪: বমি করলে কি অজু ভেঙে যায়?

উত্তর ৩০৪: বমি করার পর বা নাকসির ফেটে যাওয়ার পর অজুর ব্যাপারে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মতই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। অর্থাৎ — বমি বা নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়ার কারণে অজু ফরজ হয় না। কারণ, এবিষয়ে যে বর্ণনাগুলো দলিল হিসেবে পেশ করা হয় — সেগুলো দুর্বল (যাঈফ)। দুর্বল হাদিস শরীয়তের বিধান প্রমাণের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব স্পষ্ট হলো যে, বমি করার পর অজু করা ফরজ নয়। তবে মা'দান ইবনে আবি তালহা (রহ.) হতে, আবু দারদা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত — নবী ﷺ বমি করার পর অজু করেছিলেন। এই

হাদিসকে শায়খ আলবানি (রহ.) সহিহ বলেছেন। সুতরাং — বমির পর অজু করা মুস্তাহাব (উত্তম), ফরজ নয়। এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত, যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৩০৫: স্ত্রীকে স্পর্শ করলে বা চুম্বন করলে কি অজু ভেঙে যায়?

উত্তর ৩০৫: এই বিষয়ে আলেমদের মধ্যে চারটি মত রয়েছে:

(১) প্রথম মত: নারীকে স্পর্শ করলে অজু ভাঙে না।

(২) দ্বিতীয় মত: নারীকে স্পর্শ করলে অজু ভেঙে যায়।

(৩) তৃতীয় মত: কামনাসহ স্পর্শ করলে বা চুম্বন করলে অজু ভেঙে যায়।

(৪) চতুর্থ মত: কামনাসহ স্পর্শ বা চুম্বন করলেও অজু ভাঙে না; তবে যদি মাযি (প্রাক-বীর্য তরল) বের হয়ে যায়, তাহলে অজু ফরজ হয়। (রাজেহ মত)

বিভিন্ন ইমামদের মত:

ইমাম মালিক (রহ.) ও তাঁর অনুসারীরা বলেন যদি কেউ কামনা ও আনন্দ অনুভব করে স্ত্রীকে স্পর্শ করে, তাহলে তার উপর অজু ফরজ হবে। আর যদি কামনা ছাড়া স্পর্শ করে, তাহলে অজু ভাঙবে না। ইমাম আহমদ (রহ.) ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ (রহ.)-এর মতও প্রায় একই। ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর সাধারণ মত: পুরুষ যদি স্ত্রীকে স্পর্শ করে — কামনা সহ হোক বা কামনা ছাড়া — উভয় অবস্থাতেই অজু ভেঙে যায়। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মত: নারীকে স্পর্শ করলে অজু ভাঙে না। তাঁর দলিল হলো আয়িশা (রাঃ)-এর হাদিস, যা সহিহ হিসেবে প্রমাণিত। ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানে তা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর "তালখীস"-এ এ কথা উল্লেখ করেছেন।

আয়াতে এসেছে: **أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ** “অথবা তোমরা নারীদের স্পর্শ করেছ।” (সূরা নিসা: ৪৩) ইমাম শাফেয়ি (রহ.) এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন — অর্থাৎ স্পর্শ করা মানেই অজু ভঙ্গ। কিন্তু অধিকাংশ সালাফ ও খালাফ আলেম বলেছেন, এখানে “لامستم” দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সহবাস (জিমা‘)। তাদের বক্তব্য হলো — কুরআন ও হাদিসে এ ধরনের শব্দ প্রায়ই সহবাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা ই‘তিকাফ প্রসঙ্গে বলেছেন: **وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ** “আর তোমরা মসজিদে ই‘তিকাফ অবস্থায় স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করো না।” (সূরা বাকারা: ১৮৭) এখানে ই‘তিকাফ অবস্থায় স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ই‘তিকাফ অবস্থায় স্ত্রীকে স্পর্শ করা নিজেই গুনাহ নয় — যদি তা কামনা ও সহবাসে না গড়ায়। একইভাবে, ইহরাম অবস্থায় সহবাস কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যদি কেউ ইহরাম অবস্থায় সহবাস করে, তবে তা হারাম এবং তার উপর কাফফারা ওয়াজিব।

রাজিহ (প্রাধান্যপ্রাপ্ত) মত:

এই বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ নেই যে, কোনো সাহাবী (রাঃ) স্ত্রীকে স্পর্শ করার পর অজু করেছেন। হাদিসের গ্রন্থগুলোতে এমন কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা নেই যে, সাহাবায়ে কেরাম স্ত্রীকে স্পর্শ করার কারণে অজু করেছেন। অতএব — নারীকে স্পর্শ করলে অজু ভাঙে না। এমনকি কামনাসহ স্পর্শ করলেও অজু ভাঙে না। তবে যদি স্পর্শের কারণে মাযি বের হয়ে যায়, তাহলে অজু ভেঙে যায়। কারণ মাযি বের হওয়া অজু ভঙ্গকারী। মাযি বের হওয়ার জন্য স্পর্শ করা শর্ত নয়। অনেক সময় স্পর্শ ছাড়াও মাযি বের হতে পারে। অতএব নারীকে স্পর্শ করলে অজু ফরজ নয়। কামনাসহ স্পর্শ করলেও অজু ভাঙে না। কিন্তু মাযি বের হলে অজু ফরজ। এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। والله أعلم

প্রশ্ন ৩০৬: জানাজা কাঁধে বহন করলে কি অজু ভেঙে যায়?

উত্তর ৩০৬: জানাজা কাঁধে বহনের পর অজু করার বিষয়ে দুইটি মারফূ' হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এই দুই হাদিসের সনদ সহিহ। এছাড়া কিছু সাহাবীর বাণী থেকেও বিষয়টি শক্তিশালী হয় যে, জানাজা কাঁধে দেওয়ার পর অজু করা মুস্তাহাব (উত্তম)। তবে যারা এ বিষয়ে অজুকে ফরজ বলেন — তা সঠিক নয়। যে হাদিসগুলোতে এক্ষেত্রে অজুর বাধ্যতামূলক হওয়া অস্বীকার করা হয়েছে — সেগুলো ফরজ অজুর অস্বীকৃতি বোঝায়, মুস্তাহাব অজুর নয়। অতএব জানাজা কাঁধে নিলে অজু করা ফরজ নয়, বরং মুস্তাহাব। কেউ যদি এই সময় অজু না করে, তবে তার কোনো গুনাহ নেই। والله أعلم

প্রশ্ন ৩০৭: জোরে হাসলে (অট্টহাসি) কি অজু ভেঙে যায়?

উত্তর ৩০৭: নোট: এবিষয়ে সকল আলেম একমত যে, নামাজের মধ্যে অট্টহাসি হাসলে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। তবে জোরে হাসলে অজু ভাঙে কি না — এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এই বিষয়ে দুইটি মত রয়েছে:

১. অজু ভেঙে যায়।

২. অজু ভাঙে না।

কিছু আলেম বলেন — নামাজের মধ্যে জোরে হাসলে অজু ভেঙে যায়, কিন্তু নামাজের বাইরে ভাঙে না। যারা অজু ভঙ্গের কথা বলেন, তারা কিছু হাদিস দলিল হিসেবে পেশ করেন — কিন্তু সেগুলো দুর্বল (যাঈফ)।

সারসংক্ষেপ:

নামাজের ভেতরে হোক বা বাইরে — উভয় অবস্থাতেই যদি কেউ জোরে হাসে, তার অজু ভেঙে যায় না। তবে যদি কেউ নামাজরত অবস্থায় জোরে হাসে, তাহলে তার নামাজ ভেঙে যাবে এবং তাকে নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে। কিন্তু অজু পুনরায় করার প্রয়োজন

নেই। সহিহ হাদিসসমূহ এবং অধিকাংশ (জুমহুর) আলেমের মতামত হলো — জোরে হাসলে অজু ভাঙে না। অতএব এই মতটিই সঠিক ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত। কারণ জোরে হাসলে অজু ভেঙে যায় — এমন কোনো সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। কোনো মাসআলায় কুরআন ও সহিহ হাদিস থেকে প্রমাণ থাকা আবশ্যক; আর প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত গ্রহণের জন্য সুস্পষ্ট দলিল থাকা জরুরি। والله أعلم

প্রশ্ন ৩০৮: কোন কোন কাজের জন্য অজু ফরজ?

উত্তর ৩০৮:

১. ফরজ বা নফল নামাজ আদায়ের জন্য

২. বায়তুল্লাহর তাওয়াফের জন্য

৩. কুরআন শরীফ (মুসহাফ) স্পর্শ করার জন্য।

প্রশ্ন ৩০৯: কোন কোন ক্ষেত্রে অজু করা মুস্তাহাব?

উত্তর ৩০৯:

১. যিকির করার জন্য (আযানও এর অন্তর্ভুক্ত)

২. প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করা

৩. মৃতদেহ বহনের পর

৪. অজু ভঙ্গ হওয়ার পর

৫. তাওয়াফের জন্য

৬. কুরআন তিলাওয়াতের জন্য (মুসহাফ স্পর্শ না করলেও)

৭. কুরআন স্পর্শ করার জন্য

৮. যে শিশু এখনো বোধ-বিবেচনায় পৌঁছায়নি — শিক্ষার সুবিধার জন্য আলেমরা বলেছেন তার জন্য অজু শর্ত নয়, তবে করা জায়েজ

৯. ঘুমানোর আগে অজু করা সুন্নত

১০. জানাবাত অবস্থায় (গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায়) খাওয়া, পান করা বা ঘুমানোর আগে অজু করা মুস্তাহাব

১১. পুনরায় সহবাসের আগে অজু করা মুস্তাহাব

১২. বমি করলে।

১৩. গোসল করার পূর্বে।

প্রশ্ন ৩১০: প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করা কি ফরজ, নাকি মুস্তাহাব?

উত্তর ৩১০: যখন অজু ভেঙে যায় (হাদাস ঘটে), তখন নামাজ পড়ার জন্য অজু করা ফরজ।

নোট:

কিছু আলেম বর্ণনা করেছেন যে, অজু ভঙ্গ না হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে অজু করা অপছন্দনীয় (মাকরূহ), কারণ এতে পানির অপচয় ও সময়ের অপব্যবহার হয়। তবে এ বিষয়ে সকল আলেম একমত যে — নামাজের আগে অজু তখনই ফরজ, যখন ব্যক্তি বেঅজু থাকে। যদি কেউ আগে থেকেই অজু অবস্থায় থাকে, তাহলে তার উপর পুনরায় অজু করা ফরজ নয়। আলেমগণ আরও বলেন — নতুন করে অজু করা সওয়াবের কাজ। অজু করা গুনাহ মাফের মাধ্যম এবং এটি নেক আমল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এক অজুতে একাধিক নামাজ আদায় করতেন, যতক্ষণ না তাদের অজু ভেঙে যেত বা কোনো প্রয়োজনীয় কারণ ঘটত। নবী ﷺ থেকেও এটি প্রমাণিত যে, তিনি এক অজুতে একাধিক নামাজ আদায় করেছেন। এর বড়ো দলিল হলো সাইয়্যিদুনা বুরাইদা (রাঃ)-এর হাদিস (সহিহ মুসলিম: ২৭৭, ৬৪২), যেখানে উল্লেখ আছে যে, একদিন তিনি এক অজুতে একাধিক নামাজ আদায় করেছিলেন।

উপরোক্ত দলিলগুলো থেকে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়:

১. যে ব্যক্তি অজু অবস্থায় আছে, তার উপর পুনরায় অজু করা ফরজ নয়। তবে পরিচ্ছন্নতা ও সওয়াবের নিয়তে অজু করা জায়েজ।

২. যে ব্যক্তি আগে থেকেই অজু অবস্থায় আছে, তার জন্য নতুন করে অজু করা বাধ্যতামূলক নয়।

৩. সর্বদা অজু অবস্থায় থাকা উত্তম ও মুস্তাহাব কাজ; কিন্তু এটি ফরজ নয়।

অতএব, যা ফরজ নয় — তা নিয়ে অতিরিক্ত কঠোরতা বা বাড়াবাড়ি করা সঠিক নয়। والله أعلم

প্রশ্ন ৩১১: দুইবার সহবাসের মধ্যে অজু করা কি মুস্তাহাব?

উত্তর ৩১১: সাইয়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তোমাদের কেউ যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তারপর আবার করতে চায়, তাহলে সে যেন অজু করে।" (সহিহ মুসলিম: ৩০৮) হাফ্স ইবনে গিয়াস হতে বর্ণনাকারী আবু বাক্‌র-এর বর্ণনায় এও এসেছে: "দুই সহবাসের মাঝে অজু করে নেবে।"। (সহিহ মুসলিম: ৩০৮)

জুমহুর (অধিকাংশ) আলেম বলেন: দ্বিতীয়বার সহবাসের আগে অজু করার নির্দেশটি ফরজ নয়, বরং উত্তম ও পছন্দনীয়। যদি কেউ দ্বিতীয়বার সহবাসের আগে অজু না করে, তবে সে গুনাহগার হবে না। হাদিস অনুযায়ী, দ্বিতীয়বার সহবাসের আগে অজু করলে শরীরে সতেজতা ও প্রশান্তি আসে। অতএব — এটি মুস্তাহাব ও উত্তম, ফরজ নয়। والله أعلم

প্রশ্ন ৩১২: সহবাসের পর ঘুমানোর আগে অজু করা কি মুস্তাহাব?

উত্তর ৩১২: এ বিষয়ে দুই ধরনের হাদিস পাওয়া যায়:

১. নবী ﷺ জানাবাত (গোসল ফরজ হওয়া) অবস্থায় অজু করে তারপর ঘুমিয়েছেন।

২. আবার এমন হাদিসও আছে যে, তিনি অজু ছাড়াই ঘুমিয়েছেন।

তাই জানাবাত (গোসল ফরজ হওয়া) অবস্থায় থাকলে ফেরেশতারা ঘরে প্রবেশ করেন না — এ কথা সঠিক নয়। ধরা যাক, সংশ্লিষ্ট হাদিসের সনদকে হাসান (অথবা হাসান লি-গাইরিহি) হিসেবে গ্রহণ করা হলো, তবুও এর অর্থ এই হবে না যে, কেবল জানাবাত অবস্থায় থাকার কারণে ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না। বরং এর অর্থ হবে — যদি কেউ জানাবাত অবস্থায় অত্যন্ত দীর্ঘ সময় কাটায়, অলসতা ও অবহেলা করে গোসল না করে থাকে, এমনকি এর ফলে তার নামাজও নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য বলা হবে যে, দীর্ঘ সময় জানাবাত অবস্থায় থাকা সঠিক নয়। এই কারণেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, অন্তত ঘুমানোর আগে অজু করে নেওয়া উচিত। তবে যে হাদীসে শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ)-এর বর্ণনা এসেছে — সেটিও দুর্বল। সেখানে আবু কিলাবা বলেন, শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) বলেছেন: "যদি কেউ রাতে জানাবাত অবস্থায় থাকে এবং ঘুমাতে চায়, তাহলে সে যেন অজু করে; এতে সে অর্ধেক পবিত্রতা অর্জন করবে।" (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ২/১৩৩, কিতাবুত তাহারা, হাদিস নং ৬৬৮)

আলেমগণ বলেন — এ বিষয়ে শরীয়তে প্রশস্ততা রাখা হয়েছে; তাই এটিকে ফরজ বলা হয়নি। বরং এটি মুস্তাহাব (উত্তম) কাজ হিসেবে গণ্য। সুতরাং উত্তম পদ্ধতি হলো — জানাবাত অবস্থায় ঘুমানোর আগে অজু করা। এ নির্দেশ তখন প্রযোজ্য, যখন কেউ জানাবাতের পর সঙ্গে সঙ্গে গোসল করতে সক্ষম নয়। সে ক্ষেত্রে অন্তত নামাজের অজুর মতো অজু করে নেওয়া উচিত। والله أعلم

প্রশ্ন ৩১৩: জানাবাত অবস্থায় পানাহারের আগে অজু করা কি মুস্তাহাব?

উত্তর ৩১৩: উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানাবাত অবস্থায় থাকতেন এবং খেতে বা ঘুমাতে চাইতেন, তখন নামাজের অজুর মতো অজু করতেন।" (সহিহ মুসলিম: ৩০৫)

সুতরাং জানাবাত অবস্থায় খাওয়া-পানের আগে অজু করা মুস্তাহাব। তবে উলামায়ে কেরাম বলেন — যদি কেউ অজু না করে কেবল হাত ধুয়ে নেয়, তাতেও যথেষ্ট। অতএব এই অবস্থায় অজু করা মুস্তাহাব। والله أعلم

প্রশ্ন ৩১৪: গোসলের আগে অজু করা কি মুস্তাহাব?

উত্তর ৩১৪: এখানে সাধারণভাবে সব ধরনের গোসল অন্তর্ভুক্ত: জানাবাতের গোসল, হায়েয ও নিফাসের গোসল, জুমার গোসল ইত্যাদি। গোসলের আগে অজু করা নিয়ে আলেমদের মতভেদ আছে। কেউ বলেন মুস্তাহাব, কেউ বলেন সুন্নত আর কেউ বলেন ফরজের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন — গোসলের আগে অজু করা মুস্তাহাব। ইমাম মালিক ও ইমাম দাউদ যাহিরী বলেন — এটি ফরজ। তবে কোনো সহিহ হাদিস দ্বারা এর ফরজ হওয়া প্রমাণিত নয়। অতএব, গোসলের আগে অজু করা মুস্তাহাব—এটাই অধিকাংশ আলেমের গ্রহণযোগ্য মত। ইমাম ইবনে বাত্তাল মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে উলামাদের ঐকমত্য উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়ে এও বলা যায় যে, গোসলের পূর্বে অজু করা শুধু শরিয়তসম্মত নয়, বরং মুস্তাহাব। যেমন ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ গ্রন্থে এবিষয়ে একটি অধ্যায় স্থাপন করেছেন, যা প্রমাণ করে যে গোসলের আগে অজু করা শরীয়তসম্মত (মাশরূ‘)। উম্মুল মু’মিনীন সাইয়্যিদা আয়িশা (রাঃ)-এর সহিহ হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসলের আগে অজু করতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, গোসলের আগে অজু করা সুন্নাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তবে এটি ফরজ কি না—এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। والله أعلم

নোট:

প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো—যে গোসল ফরজ (যেমন জানাবাতের গোসল), তা যেন অজু ছাড়া করা না হয়। কারণ এটি সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং কুরআনও এর সমর্থন করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন: “আর যদি তোমরা জানাবাত অবস্থায় থাকো, তবে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করো।” (সূরা মায়েদা: ৬)

নোট:

দলিলের দিক থেকে উভয় মতেই কিছু শক্তি আছে। তাই সতর্কতার দৃষ্টিকোণ থেকে গোসলের আগে অজু করা উত্তম। শায়খ ইবনে বায (রহ.)-ও এটিকে উত্তম বলেছেন।

নোট:

এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ফরজের নির্দেশ না থাকায় একে চূড়ান্তভাবে ফরজ বলা কঠিন। উসূলুল ফিকহের একটি প্রসিদ্ধ নীতি, যা ইবনে রুশদ (রহ.) *বেদায়াতুল মুজতাহিদ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: “الفعل لا يوجب” অর্থাৎ, কেবল কোনো কাজ করা দ্বারা ফরজ হওয়া প্রমাণিত হয় না; ফরজ সাব্যস্ত করতে স্পষ্ট আদেশ প্রয়োজন।

“ফাত্তাহহারু”-এর মধ্যে যে নির্দেশ রয়েছে, শায়খ ইবনে বায (রহ.) তার ব্যাখ্যা করেছেন: যদি কেউ জানাবাতের গোসলের সময় ছোটো ও বড়ো উভয় নাপাকী দূর করার নিয়ত করে, তাহলে সেই গোসলই অজুর জন্য যথেষ্ট হবে। তবে উত্তম পদ্ধতি হলো— প্রথমে লজ্জাস্থান ধোয়া, তারপর পূর্ণ অজু করা, এরপর সম্পূর্ণ গোসল করা। এটাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি। এই বিধান হায়েয ও নিফাসের গোসলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। (মাজমু' ফাতাওয়া ইবনে বায ১০/১৭৩)

প্রশ্ন ৩১৫: ঘুমানোর আগে অজু করা কি মুস্তাহাব?

উত্তর ৩১৫: সাইয়্যিদুনা বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যখন তুমি বিছানায় শুতে যাও, তখন নামাজের অজুর মতো অজু করো। তারপর ডান কাতে শুয়ে বলো—

"اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي انزلت وبنبيك الَّذِي أَرْسَلْت"

(হে আল্লাহ! আমি আমার মুখ তোমার দিকে সমর্পণ করলাম, আমার সব বিষয় তোমার হাতে সমর্পণ করে দিলাম, তোমার প্রতি আশা ও ভয়ের সঙ্গে তোমারই উপর নির্ভর করলাম। তোমা ছাড়া কোনো আশ্রয় ও মুক্তির স্থান নেই। হে আল্লাহ! তুমি যে কিতাব নাযিল করেছ তাতে আমি ঈমান এনেছি, আর তুমি যে নবী পাঠিয়েছ তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি।) যদি তুমি ঐ রাতেই মারা যাও, তবে তুমি ফিতরাতের উপর মারা যাবে। এই দুআটি যেন তোমার শেষ কথা হয়।"

বারা (রাঃ) বলেন: আমি দুআটি পুনরায় পড়ে শোনালাম। যখন বললাম— " اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك" তখন রাসূল ﷺ বললেন: "না, এভাবে বলবে — 'ونبيك الذي أرسلت' (তোমার সেই নবীর উপর যাকে তুমি পাঠিয়েছ)।" (সহিহ বুখারি: ২৪৭; সহিহ মুসলিম: ২৭১১)

প্রশ্ন ৩১৬: ঘুমানোর জন্য অজুর বদলে শুধু হাত-মুখ ধোয়া কি যথেষ্ট?

উত্তর ৩১৬: সাইয়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন: "আমি এক রাতে মাইমূনা (রাঃ)-এর ঘরে ছিলাম। নবী ﷺ ঘুম থেকে উঠলেন, প্রয়োজন সেরে নিলেন, তারপর তাঁর মুখ ধুলেন, দুই হাত ধুলেন এবং আবার শুয়ে পড়লেন।" (সহিহ বুখারি: ৬৩১৬; সহিহ মুসলিম: ৭৬৩)

যখন আমরা ঘুমানোর ইচ্ছা করি, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ হলো — তিনি প্রথমে অজু করতেন, তারপর ঘুমাতে যেতেন। আলেমগণ এব্যাপারে বহু উপকারিতা ও হিকমত উল্লেখ করেছেন, যেমন: ভালো স্বপ্ন দেখা, অজু অবস্থায় থাকার কারণে শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা, পবিত্র অবস্থায় রাত যাপন করা। একথাও সত্য যে, কেউ শুয়ে ঘুমালে সাধারণত তার অজু ভেঙে যায়। তবে এখানে উদ্দেশ্য হলো — ঘুমানোর আগে অজু করে শোয়া। কারণ ঘুমন্ত অবস্থায় যদি তার মৃত্যু আসে, তাহলে সে অজু অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে

— তার নিয়তের কারণে সে সেই মর্যাদা পাবে। আর যদি সে ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তাহলে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। অতএব, অজু করে ঘুমানো সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং এতে অনেক উপকার রয়েছে। তবে ঘুমানোর আগে অজু করা ফরজ নয়, বরং মুস্তাহাব। والله أعلم

প্রশ্ন ৩১৭: কুরআন তিলাওয়াতের জন্য কখন অজু মুস্তাহাব এবং কখন ওয়াজিব?

উত্তর ৩১৭: কুরআন মাজিদ স্পর্শ করা এবং অজু ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করার বিধানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিছু আলেম এবিষয়ে জানাবাত অবস্থায় থাকা ব্যক্তি, হায়েয অবস্থায় নারী এবং সাধারণ বেঅজু ব্যক্তির ক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন। অতএব বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া জরুরি।

হায়েয (মাসিক) সম্পর্কিত বিধানসমূহ (আদ্-দুরারুস সুনিয়্যাহ থেকে)

প্রশ্ন ৩১৮: হায়েয অবস্থায় নারীর জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা কি জায়েজ?

উত্তর ৩১৮: হায়েয অবস্থায় নারীর কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েজ। এটি মালিকী ও যাহিরী মাজহাবের মত। ইমাম শাফেয়ির প্রাচীন মত (কওল কাদীম) থেকেও এটি বর্ণিত। ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক বর্ণনাতেও এই মত পাওয়া যায়। এই মতটি গ্রহণ করেছেন: ইমাম তাবারী, ইবনে তাইমিয়্যা, ইবনুল কাইয়্যিম, শায়খ ইবনে উসাইমিন এবং স্থায়ী ফতোয়া কমিটি (লাজনাহ দায়িমাহ)।

এর কারণসমূহ:

প্রথমত:

এটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয় যে, নবী ﷺ-এর যুগে নারীরা হায়েযা হতেন। কিন্তু নবী ﷺ তাদের কুরআন তিলাওয়াত থেকে নিষেধ করেননি। যদি হায়েয অবস্থায় কুরআন পড়া হারাম হতো, তাহলে তা অবশ্যই সহিহ ও স্পষ্ট হাদীসে বর্ণিত হতো—যেমন নামাজ ও রোযা থেকে নিষেধাজ্ঞা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। কিন্তু এবিষয়ে যে হাদিসগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো দলিলযোগ্য নয় (দুর্বল)। অতএব বোঝা যায়—শরীয়ত নারীদের কুরআন তিলাওয়াত থেকে নিষেধ করেনি।

দ্বিতীয়ত:

হায়েয নারীর ইচ্ছাধীন বিষয় নয়। এটি একটি স্বাভাবিক অবস্থা, যা সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কখনো এর সময়কাল দীর্ঘ হয়। এতে সে তার মুখস্থ করা জিনিসগুলো ভুলে যেতে পারে।

প্রশ্ন ৩১৯: সমসাময়িক আলেমদের মতে হায়েয অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতের হুকুম কী?

উত্তর ৩১৯: ১. শায়খ ইবনে উসাইমিন (রহ.): তিলাওয়াত করা জায়েজ। নিষেধাজ্ঞার কোনো শক্ত দলিল নেই। যেহেতু বিষয়টি মতভেদপূর্ণ, তাই প্রয়োজনে পড়া উচিত। আর মুসহাফ স্পর্শ করলে দস্তানা বা আড়ালের মাধ্যমে স্পর্শ করা উত্তম (এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত)।

২. **শায়খ ইবনে বায (রহ.):** তিনিও তিলাওয়াতের অনুমতি দিয়েছেন।

৩. হায়েয অবস্থায় তিলাওয়াত নিষিদ্ধ—এ মর্মে যে হাদিস রয়েছে, তা দুর্বল।

৪. ইমাম মালিক, ইবনে তাইমিয়্যা ও শাওকানি (রহ.)—তারাও অনুমতি দিয়েছেন।

প্রশ্ন ৩২০: হায়েয অবস্থায় মুসহাফ (কুরআন শরীফ) স্পর্শ করা কি জায়েজ?

উত্তর ৩২০: হায়েয অবস্থায় সরাসরি মুসহাফ স্পর্শ করা জায়েজ নয়। এবিষয়ে চার মাজহাব (হানাফি, মালিকী, শাফেয়ি ও হাম্বালী)-এর ঐক্যমত রয়েছে। অধিকাংশ আলেমও এই মতের উপর একমত।

নোট: শায়খ ইবনে বায ও শায়খ ইবনে উসাইমিন বলেছেন— হায়েয অবস্থায় নারী দস্তানা বা কোনো আড়ালের মাধ্যমে মুসহাফ স্পর্শ করে পড়তে পারে। এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

প্রশ্ন ৩২১: অজু ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করা কি জায়েজ? আর "পবিত্র লোক" বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

উত্তর ৩২১: অজু ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েজ। তবে মুসহাফ স্পর্শ করা যাবে না; মুখে পড়তে হবে। অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা জায়েজ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "এটিকে স্পর্শ করে কেবল পবিত্ররা।" (সূরা ওয়াকিয়া ৫৬:৭৯)

আলেমগণ বলেন, "পবিত্ররা" বলতে বোঝানো হয়েছে— যারা ছোটো ও বড়ো উভয় নাপাকী থেকে পবিত্র। তবে সঠিক মত হলো—এখানে ফেরেশতাদের বোঝানো হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি জানাবাত অবস্থায়, সে কুরআন স্পর্শ করতে পারে না এবং মুখেও পড়তে পারে না। এই বিষয়ে সাইয়্যিদুনা আলি (রাঃ) থেকে বর্ণিত: "নবী ﷺ-কে কুরআন পড়া থেকে কেবল জানাবাতই বিরত রাখত।" (মাজমু' ফাতাওয়া ইবনে বায: ২৯/৬৪)

প্রশ্ন ৩২২: অজু ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার করা এবং সালাম দেওয়া ও সালামের জবাব দেওয়ার বিধান কী?

উত্তর ৩২২: আলেমগণ অজু ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করার অনুমতি দিয়েছেন। তবে উত্তম ও মুস্তাহাব হলো—অজু অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা। একই বিধান প্রযোজ্য যিকির-আযকার, সালাম দেওয়া এবং সালামের জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রেও। উপরোক্ত দলিলসমূহ থেকে

স্পষ্ট হয় যে, অজু ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েজ, অজু ছাড়া যিকির করা জায়েজ আর অজু ছাড়া সালাম দেওয়া ও সালামের জবাব দেওয়াও জায়েজ।

প্রশ্ন ৩২৩: অজু ছাড়া মুসহাফ স্পর্শ করে কুরআন পড়া কি জায়েজ?

উত্তর ৩২৩: শায়খ আলবানি ও শায়খ মুস্তফা আদাভি (রহ.)—হায়েয, জানাবাত ও বেঅজু ব্যক্তির জন্য মুসহাফ স্পর্শের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু শায়খ ইবনে উসাইমিন (রহ.) এই অনুমতি দেননি। দুই পক্ষের বিস্তারিত আলোচনা জানতে সংশ্লিষ্ট ফিকহি গ্রন্থ বা নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

শায়খ ইউসুফ আল-কারযাভিও শায়খ আলবানির মতের কাছাকাছি মত প্রকাশ করেছেন।

প্রথম মত:

অজু ছাড়া মুসহাফ স্পর্শ করা জায়েজ নয়। জুমহুর (অধিকাংশ আলেম) বলেন—অজু করা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় মত:

আলবানি গবেষণা করে বলেছেন—এটি ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব।

নোট:

ইমাম ইবনে হাজম এবং শায়খ আলবানির মতের দিকে ঝুঁকেছিলেন শায়খ ইবনে উসাইমিন ও শায়খ ফেরকুসও; তবে পরবর্তীতে কেউ কেউ তাদের মত থেকে ফিরে এসেছেন। তবে সতর্কতার দিক থেকে উত্তম হলো—মুসহাফ স্পর্শ করার সময় অজু থাকা। কারণ: অজু না করার ব্যাপারে মতভেদ আছে, কিন্তু অজু করে স্পর্শ করা নিয়ে কোনো মতভেদ নেই। আমর ইবনে হাজম (রাঃ)-এর হাদীসে "طاهر" (পবিত্র) শব্দ এসেছে। কিছু মুহাক্কিক আলেম এই শব্দকে সাধারণ অর্থে নিয়ে অজু অবস্থাকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে শায়খ আলবানি "المؤمن لا ينجس" (মুমিন নাপাক হয় না) হাদিস দ্বারা জবাব দিয়েছেন। যখন উভয় পক্ষের দলিল শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন সতর্কতার পথ অবলম্বন করাই উত্তম। والله أعلم

প্রশ্ন ৩২৪: হিফজ করা শিশুদের জন্য অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শের হুকুম কী?

উত্তর ৩২৪: যেসব শিশু হিফজ করে, তাদের অভিভাবক ও শিক্ষকদের উচিত—সাত বছর বা তার বেশি বয়সী শিশুদের সবসময় অজু অবস্থায় থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা। কারণ শরিয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে—কুরআন স্পর্শ করবে কেবল পবিত্র ব্যক্তি। যারা পবিত্র নয় (অর্থাৎ অজু অবস্থায় নয়), তাদের জন্য মুসহাফ স্পর্শ করা জায়েজ নয়। তবে সাত বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: যদিও তারা অজু করে, তবুও তাদের অজুর পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা ধরা হয় না,

কারণ তারা এখনো তামিজ (ভালো-মন্দ বোঝার স্তর) পর্যায়ে পৌঁছেনি। তাই এ ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে। (মাজমু ফাতাওয়া, ইবনে বায: ২৯/৬৬)

প্রশ্ন ৩২৫: অজু ভেঙে গেলে সাথে সাথে অজু করা কি মুস্তাহাব?

উত্তর ৩২৫: হাদাসে আসগার (যেমন পেশাব, পায়খানা ও অন্যান্য নাওয়াকিযে অজু) ঘটার সাথে সাথে অজু করে নেওয়া মুস্তাহাব। সর্বদা অজু অবস্থায় থাকা উত্তম। সাইয়্যিদুনা বুরাইদা (রাঃ) বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রাঃ)-কে ডেকে বললেন: "হে বিলাল! কী কারণে তুমি জান্নাতে আমার আগে আগে চলছো? আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করেছি, আমার সামনে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি। গতরাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, তখনও তোমার জুতার শব্দ সামনে শুনলাম। তারপর আমি একটি উঁচু চতুষ্কোণ প্রাসাদের পাশ দিয়ে গেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম—এই প্রাসাদ কার? ফেরেশতারা বলল—এটি একজন আরব ব্যক্তির। আমি বললাম—আমি-ও আরব; বলো, এটি কার? তারা বলল—এটি কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তির। আমি বললাম—আমি-ও কুরাইশি; বলো, এটি কার? তারা বলল—এটি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতের এক ব্যক্তির। আমি বললাম—আমি মুহাম্মাদ; বলো, এটি কার? তারা বলল—এটি উমর ইবনে খাত্তাবের।" তখন বিলাল (রাঃ) বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমি যখনই আযান দিয়েছি, তার পর দুই রাকাত নামাজ না পড়ে থাকিনি। আর যখনই আমার অজু ভেঙেছে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে অজু করেছি এবং মনে করেছি যে আল্লাহর জন্য আমার উপর দুই রাকাত (নফল) আদায় করা উচিত।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "এই দুই রাকাত (অথবা এই দুই অভ্যাস)-এর কারণেই তুমি এ মর্যাদা অর্জন করেছ।"

অতএব, অজু ভেঙে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অজু করা মুস্তাহাব। তবে এবিষয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। সর্বদা অজু অবস্থায় থাকা ফরজ নয়। কিন্তু কেউ যদি সর্বদা অজু অবস্থায় থাকার অভ্যাস গ্রহণ করে, তবে তা সওয়াবের কাজ, রহমত ও বরকতের মাধ্যম। والله أعلم

প্রশ্ন ৩২৬: কা'বা তাওয়াফের জন্য অজু কি শর্ত?

উত্তর ৩২৬: এ বিষয়ে দুইটি মত রয়েছে:

১. অধিকাংশ আলেম বলেন—তাওয়াফের জন্য অজু শর্ত।

২. কিছু আলেম বলেন—অজু বাধ্যতামূলক ও শর্ত নয়।

যারা তাওয়াফের জন্য অজুকে ফরজ বলেন, তারা যুক্তি দেন যে, তাওয়াফ নামাজের মতো। কিন্তু বাস্তবে নামাজ ও তাওয়াফের বিধান সম্পূর্ণ এক নয়। তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ—

১. নামাজে কথা বলা নিষিদ্ধ; কিন্তু তাওয়াফের সময় কথা বলা জায়েজ।

২. নামাজের মধ্যে অজু ভেঙে গেলে পুরো নামাজ পুনরায় পড়তে হয়। কিন্তু তাওয়াফের সময় অজু ভেঙে গেলে, অজু করে এসে যেখানে তাওয়াফ ছেড়েছিল সেখান থেকেই পুনরায় শুরু করতে পারে।

৩. আরেকটি অবস্থা হলো— যদি তাওয়াফের সময় অজু ভেঙে যায়, তবে সে তাওয়াফ সম্পূর্ণ করে পরে অজু করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেও তার তাওয়াফ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

অতএব, নামাজ ও তাওয়াফের বিধান আলাদা।

বিশ্লেষণ

স্পষ্টভাবে বলা যায়—তাওয়াফের জন্য অজু করা তাওয়াফের ফরজ বা শর্তগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। আরও একটি কারণ হলো—এবিষয়ে কুরআন ও সহিহ হাদীসে সুস্পষ্ট কোনো আদেশ নেই যা তাওয়াফের জন্য অজুকে শর্ত সাব্যস্ত করে। এ কারণে বহু মুহাক্কিক আলেম বলেন, তাওয়াফের জন্য অজু ফরজ নয়, বরং মুস্তাহাব।

এই মত গ্রহণ করেছেন— ইমাম আবু হানিফা, ইবনে তাইমিয়্যা, ইবনুল কাইয়্যিম। আর যাঁরা তাওয়াফের জন্য অজুকে শর্ত বা ফরজ বলেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমদ।

নোট:

তৃতীয় মত হলো—মতভেদ থেকে বের হয়ে আসার জন্য সতর্কতার ভিত্তিতে অজু করে তাওয়াফ করা উত্তম। শায়খ ইবনে উসাইমিন (রহ.) বলেছেন, অজু করা মুস্তাহাব, "খুরূজান আনিল খিলাফ" (মতভেদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য)। কারণ, অজু ছাড়া তাওয়াফ করা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু অজু করে তাওয়াফ করলে কোনো মতভেদ নেই। ইবাদতকে সন্দেহমুক্ত রাখা উত্তম। والله أعلم

প্রশ্ন ৩২৭: হাদাসে আসগার (ছোটো নাপাকি) সম্পর্কিত কয়েকটি মাসআলা ও বিধান উল্লেখ করুন—পূর্ববর্তী বিস্তারিত আলোচনার আলোকে।

উত্তর ৩২৭:

১) অজু শেষ করার পর আকাশের দিকে তাকানো—এ বিষয়ে যে আমল প্রচলিত আছে, তা দুর্বল (যঈফ) বর্ণনার উপর ভিত্তি করে।

২) ফরজ কাজ ও আমলের ক্ষেত্রে নিয়ত করা ফরজ।

৩) অজু ও গোসলে যেসব অঙ্গ ধোয়া হয়, সেসব অঙ্গে পানি পৌঁছানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়—এমন সব বস্তু অপসারণ করা জরুরি।

৪) যদি নখ এমন রঙে রাঙানো হয় যার কোনো আবরণী স্তর নেই এবং যা পানি ত্বকে পৌঁছাতে বাধা দেয় না—তাহলে তা রেখে অজু করা সহিহ। কিন্তু যদি এমন রঙ হয় যার স্তর আছে এবং যা পানি পৌঁছাতে বাধা দেয়—তাহলে তা অপসারণ না করে অজু সহিহ হবে না।

৫) অজু ও গোসলের অঙ্গে পানি পৌঁছাতে বাধা দেয়—এমন সব বস্তু দূর করা জরুরি। এ নিষেধাজ্ঞার দুইটি কারণ রয়েছে: (ক) এতে শরীয়তের বিরোধিতা হয়। কারণ ফিতরাতের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হলো নখ কাটা। (খ) এতে অমুসলিমদের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

৬) নোট: কৃত্রিম নখ (Artificial Nails) এবং যেকোনো প্রতিবন্ধক বস্তু যা অজুর পানির পৌঁছাতে বাধা দেয়—তা অপসারণ করা জরুরি।

৭) অজুর সময় কৃত্রিম দাঁত খুলে ফেলা ফরজ নয়।

(৮) অজু বা গোসলের সময় দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা খাদ্যকণা বের করা জরুরি নয়। এর প্রমাণ—নবী ﷺ অজু বা গোসলের সময় আংটি খুলতেন—এমন কোনো প্রমাণ নেই। তবে অজুর সময় আংটি নাড়ানোর ব্যাপারে ইবনে মাজাহতে একটি দুর্বল হাদিস আছে। ইমাম বুখারি আংটি নাড়ানোর বিষয়ে তাবিয়ি থেকে উল্লেখ করেছেন। অজু ও গোসলের ক্ষেত্রে যে অঙ্গ ধোয়া ফরজ, সেখানে পানি পৌঁছানো আবশ্যক। দাঁতের ফাঁকে থাকা খাদ্যকণা মূল অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়; তাই তা বের করা জরুরি নয়, বরং কষ্টসাধ্য।

(৯) আংটির সাথে দাঁতের খাদ্যকণার কিয়াস করা সঠিক কিয়াস নয়; কারণ তা মূল অঙ্গের বিকল্প নয়।

(১০) আসল চুল ছাড়া অতিরিক্ত কৃত্রিম চুল জোড়া লাগানো বা উইগ ব্যবহার করা নাজায়েয। তাই এর ওপর মাসাহ করলে অজু সহিহ হবে না; কারণ এটি হাদিসে নিষিদ্ধ 'চুল জোড়া লাগানো (وصل)' এর অন্তর্ভুক্ত।

(১১) **নোট:** শুধু সৌন্দর্যের জন্য এমন করা হয় তাহলে তা অবৈধ। কিন্তু যদি চিকিৎসা বা ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে তা জায়েয। (ইবনে বায রহ.)

(১২) কারও মাথায় চুল না থাকলে এবং চিকিৎসা পদ্ধতিতে (hair transplantation) চুল লাগিয়ে ত্রুটি দূর করা হলে—উলামাগণ এটিকে বৈধ বলেছেন। এটি মানুষের দেহের ত্রুটি সংশোধনের প্লাস্টিক সার্জারির মতো; কারণ অপারেশনের পর লাগানো অংশ দেহের অঙ্গের মতো হয়ে যায়।

(১৩) নারীরা সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে চোখের পাপড়িতে কৃত্রিম চুল লাগালে তা অপসারণ না করা পর্যন্ত অজু ও গোসল সহিহ হবে না।

(১৪) কোনো নারী যদি মাথার খোঁপা বাঁধা অবস্থায় মাসাহ করে তবে যথেষ্ট; তবে মাথার মাঝখানে উঁচু খোঁপা করে মাসাহ করা ঠিক নয়—কারণ এ বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "দুই শ্রেণির জাহান্নামি লোক আছে

যাদের আমি এখনো দেখিনি— একদল লোক, যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের মতো চাবুক, তারা মানুষকে প্রহার করবে; আর একদল নারী, যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকবে, নিজেরা অন্যের দিকে আকৃষ্ট হবে এবং অন্যদের নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করবে; তাদের মাথা হবে বক্র উটের কুঁজের মতো। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না— দিও জান্নাতের সুঘ্রাণ অনেক দূর থেকে পাওয়া যায়।" (সহিহ মুসলিম: 2128)

(১৫) অজুর সময় যিকর বা দুআ ভুলে গেলে তা ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু নামাজে ওয়াজিব ভুলে গেলে সিজদাহ সাহু এবং হজে ওয়াজিব ভুলে গেলে কাফফারা দিতে হয়।

(১৬) আলেমরা মানুষের ভুলে যাওয়াকে অক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত বলে ক্ষমাযোগ্য বলেছেন। এ ভিত্তিতে অজুর তাসমিয়া (বিসমিল্লাহ) ও তাকবিরের ব্যাপারেও নমনীয়তা রাখা হয়েছে।

(১৭) অজু ও গোসলের সময় পানির অপচয় থেকে বাঁচা উচিত। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ একবার সা'দ (রা.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন; তিনি অজু করছিলেন। নবী ﷺ বললেন: "এ কী অপচয়?" তিনি বললেন: অজুতেও কি অপচয় হয়? নবী ﷺ বললেন: "হ্যাঁ, তুমি যদি প্রবাহমান নদীর তীরে থাকো তবুও।" (সুনান ইবনে মাজাহ: 425)

প্রশ্ন ৩২৮: কী দিয়ে মিসওয়াক করা উত্তম? মিসওয়াক কি অবশ্যই কাঠের ডাল দিয়েই করতে হবে, নাকি দাঁত পরিষ্কার হওয়াই মূল উদ্দেশ্য?

উত্তর ৩২৮: যদি মূল উদ্দেশ্য দাঁত পরিষ্কার করা হয়, তাহলে টুথপেস্ট দিয়েও তা অর্জিত হবে। সুতরাং টুথপেস্ট ব্যবহার করাও উপকারী ও বৈধ; তবে সুন্নতের পূর্ণ ফজিলত সুন্নাতের অনুসরণের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

ইমাম রাফেয়ি (রহ.) বলেন—"সিওয়াক" শব্দের অর্থ ঘষা বা পরিষ্কার করা। দাঁতের ময়লা দূর করে এমন যেকোনো বস্তু মিসওয়াক হিসেবে গণ্য হবে—কাপড় হোক বা কাঠ। যদি মূল উদ্দেশ্য দাঁত পরিষ্কার করা হয়, তাহলে প্লাস্টিকের ব্রাশ দিয়েও তা অর্জিত হবে। তবে নিম, খেজুর ইত্যাদি গাছের ডাল ব্যবহার করা সুন্নতের দিক থেকে উত্তম।

প্রশ্ন ৩২৯: মিসওয়াক সম্পর্কিত কিছু বিষয় আলোচনা করুন।

উত্তর ৩২৯:

১. মিসওয়াক ও টুথপেস্ট — এগুলো কি নফল, নাকি সুন্নাহ? কাঠ হওয়া কি আবশ্যক, নাকি উদ্দেশ্য (দাঁত পরিষ্কার) অর্জন হলেই যথেষ্ট?

২. মিসওয়াকের স্থানসমূহ (মুস্তাহাব ও শরয়ি বিধানসমূহ) জানা গুরুত্বপূর্ণ।

৩. আকার (সাইজ) নিয়ে বাড়াবাড়ি করা নিষিদ্ধ।

৪. ব্যবহারের পদ্ধতি — আড়াআড়ি (ডান দিক থেকে বাম দিকে)।

৫. বিধানসমূহের জন্য 'সুনানুল ফিতরাহ' অধ্যায় দেখুন।
৬. কাঠের মাধ্যমে আদায় করা উত্তম ও অগ্রগণ্য।
৭. টুথপেস্ট ও কাঠ—দুটো একত্রে ব্যবহার করা উত্তম।

প্রশ্ন ৩৩০: মাসাহ (মোজার উপর মাসাহ) সংক্রান্ত কয়েকটি বিধান উল্লেখ করুন।
উত্তর ৩৩০:
১. লম্বা বুট যা গিরা (টাখনু) ঢেকে রাখে, তা খুফ (চামড়ার মোজা)-এর মতো। অতএব মোজার শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এর উপরও মাসাহ করা জায়েয। তবে যদি তা টাখনু পর্যন্ত না ঢাকে, খুলে ফেলা আবশ্যক। তবে শায়খ আল-আলবানি রহ. কষ্টের কারণ বিবেচনায় জুতার উপর মাসাহের অনুমতি দিয়েছেন।
২. কাপড়ের মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয।

সাইয়্যিদুনা সাওবান (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ছোটো বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হয়। তারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে আসে, তখন তিনি তাদের নির্দেশ দেন যেন অজুর সময় পাগড়ি ও মোজার উপর মাসাহ করে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ১৪৬; তুহফাতুল আশরাফ ২০৮২; মুসনাদ আহমাদ ৫/২৭৭। শায়খ আল-আলবানি রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

ইমাম বুখারি রহ. 'আত-তারিখ'-এ রাশিদ ইবনে সা'দের শ্রবণ প্রমাণ করেছেন। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবি রহ. একে সহিহ বলেছেন।)
৪. মুকিম ও মুসাফিরের জন্য মাসাহের নির্দিষ্ট সময় গণনা শুরু হয় মোজা পরা থেকে নয়; বরং মোজা পরে অজু ভঙ্গ হওয়ার পর নতুন অজু করার সময় থেকে গণনা শুরু হবে। মুসাফিরের জন্য: তিন রাত ও তিন দিন আর মুকিমের জন্য: এক রাত ও এক দিন।
৫. মোজা খুলে ফেললে মাসাহ বাতিল হয় না, যেমন চুল, নখ, হাত বা আঙুল কেটে গেলে অজু ভঙ্গ হয় না।
৬. পাগড়ির মাসাহের বিধানে 'শমাঘ' ও 'রুমাল' অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলোর উপর মাসাহ জায়েয নয়।
৭. ক্ষতের উপর বাঁধা ব্যান্ডেজ বা প্লাস্টারের উপর মাসাহ করা জায়েয। কারণ এর বিধান তায়াম্মুম ও খুফের উপর মাসাহের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৩৩১: যদি অজুর অঙ্গের উপর প্লাস্টার থাকে তাহলে কী করবেন?
উত্তর ৩৩১:

১. যদি অঙ্গ খোলা থাকে এবং পানি ক্ষতিকর না হয়, তাহলে ধোয়া আবশ্যক।
২. যদি পানি ক্ষতিকর হয়, তাহলে সম্ভব হলে মাসাহ করবে।
৩. যদি পানি ব্যবহার ও মাসাহ—উভয়ই ক্ষতিকর হয়, তাহলে তায়াম্মুম করবে।
৪. যদি অঙ্গে এমন ব্যান্ডেজ থাকে যা খোলা কষ্টকর, তাহলে তার উপর মাসাহ করবে।

প্রশ্ন ৩৩২: কৃত্রিম অঙ্গের উপর অজু করার বিধান কী?

উত্তর ৩৩২: যদি কারো হাত বা অজুর কোনো অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সে তার স্থলে কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন করে, তাহলে সেই অঙ্গের উপর অজুর হুকুম রহিত হয়ে যায়। কারণ ফিকহি মূলনীতি: "إذا فات الشرط فات المشروط" (শর্ত না থাকলে শর্তাধীন বিধানও থাকে না।) অর্থাৎ অজুর জন্য হাতের অস্তিত্ব শর্ত। যখন তা নেই, তখন ধোয়ার বিধানও নেই। তবে যদি অঙ্গের উপর কৃত্রিম কোনো আবরণ থাকে, তাহলে অজু বা মাসাহ করা আবশ্যক।

কৃত্রিম হাত বা পায়ের উপর অজু বা ধোয়ার প্রয়োজন নেই। তবে যদি প্রকৃত অঙ্গের কোনো অংশ বাকি থাকে তাহলে কৃত্রিম অঙ্গের সাথে প্রকৃত অংশও ধুতে হবে।

প্রশ্ন ৩৩৩: নাক বা কানে অলংকারের জন্য ছিদ্র করা কেমন?

উত্তর ৩৩৩: এবিষয়ে দুইটি মত রয়েছে:

প্রথম মত: অকারণে করা নাজায়েয।

দ্বিতীয় মত (প্রাধান্যপ্রাপ্ত): শরীয়তসম্মত সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে করা জায়েয, যদি ফাসেক ও অমুসলিমদের অনুকরণ না হয়।

প্রশ্ন ৩৩৪: অজুর ফরজসমূহ সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করুন।

উত্তর ৩৩৪:

১. কুলি (মাজমাযা) ফরজ; গড়গড়া করা সুন্নাহ। নাকে পানি দেওয়া (ইস্তিনশাক) ও নাক পরিষ্কার করা ফরজের অন্তর্ভুক্ত, কারণ তা অজুর বর্ণনায় এসেছে। তবে রোজা অবস্থায় বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ।

২. অজুর ওয়াজিব সংখ্যায় ফকিহদের মধ্যে মতভেদ আছে।

৩. সমগ্র মাথায় মাসাহ করা ফরজ।

৪. শায়খ ইবনে বায রহ. বলেন: নারীর জন্য ওড়না খোলা কষ্টকর হলে এবং পুরুষের জন্য পাগড়ি খোলা কষ্টকর হলে, তার উপর মাসাহ করা জায়েজ। তবে শর্ত হলো—তা পবিত্র অবস্থায় পরা হতে হবে। মোজার মাসাহের শর্তগুলো এখানেও প্রজোয্য হবে। অন্য কিছু ফাকিহ বলেন, পাগড়ির ক্ষেত্রে এই শর্তের কথা দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়।

৫. মুওয়ালাত (ক্রমাগততা) শর্ত। অর্থাৎ এক অঙ্গ ধোয়ার পর এত বিরতি না হয় যে পূর্ববর্তী অঙ্গ শুকিয়ে যায়।

নোট: যদি পানির স্বল্পতার কারণে অজু সম্পূর্ণ করতে দেরি হয় এবং অঙ্গ শুকিয়ে যায়, তাহলে তা ক্ষমাযোগ্য। "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" "আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।"

PART -5

পঞ্চম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

সংক্ষিপ্ত কিতাবুত তাহারাহ- ৫ম খণ্ড
(সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, প্রশ্নোত্তর আকারে)

নোট: বিস্তারিত জানার জন্য পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ দেখুন।

পরিচিতি

এই গ্রন্থ "কিতাবুত তাহারাহ"-এর পঞ্চম খণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত ও সমন্বিত সারসংক্ষেপ, যা সহজ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে।

মূল গ্রন্থটি একটি অত্যন্ত বিস্তারিত ও গবেষণাধর্মী রচনা, যা পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়েছে। এতে রয়েছে: বিপুল দলিল প্রমাণ, তুলনামূলক ফিকহ (বিভিন্ন মাজহাবের বিশ্লেষণ), চার ইমামের মতামত, এবং সালাফি ফিকহি গ্রন্থসমূহের সুন্দর সমন্বয়।

এই গ্রন্থ তার শক্তিশালী দলিল, বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও বিশ্লেষণের কারণে ফিকহি গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

বিস্তারিত দলিল ও আলোচনার কারণে মূল গ্রন্থটি প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত, যা পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণয়নের উদ্দেশ্য

যেহেতু প্রত্যেক পাঠকের পক্ষে এত বিস্তারিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করা সম্ভব নয়, তাই সহজ ভাষায় শুধু প্রাধান্যপ্রাপ্ত মাসআলাগুলো উপস্থাপনের জন্য এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ড প্রায় ২৫ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ, শিক্ষার্থী ও প্রাথমিক স্তরের পাঠকদের শেখা ও বোঝা সহজ হয়।

যারা গবেষণাপ্রবণ, বিস্তারিত আলোচনায় আগ্রহী, তারা মূল পাঁচ খণ্ডের গ্রন্থ প্রণিধান করবেন।

আর যারা নবীন শিক্ষার্থী বা সাধারণ পাঠক এবং দীর্ঘ আলোচনা পড়তে কষ্ট অনুভব করেন, তারা এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ থেকেই শুরু করতে পারেন।

পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা, গভীরতা ও দলিলভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য বিস্তারিত সংস্করণ অধ্যয়ন অপরিহার্য।

আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ — তিনি যেন আমাদের উপকারী ইলম দান করেন এবং সেই ইলম অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করেন। আমীন।

حدث اكبر (বড়ো অপবিত্রতা) সম্পর্কিত বিধানসমূহ

(১) জানাবাত ও জুনবি, (২) হায়েয (৩) ইস্তিহাযা (৪) নিফাস (৫) গোসল সম্পর্কিত বিধানসমূহ

প্রশ্ন ৩৩৫: জানাবাতের গোসলের জন্য বীর্যপাত কি শর্ত?

উত্তর ৩৩৫: স্বামী-স্ত্রীর লজ্জাস্থান পরস্পরে মিলিত হলে, শরয়ি দৃষ্টিতে উভয়ই অপবিত্র (জুনবি) হয়ে যায় এবং তাদের উপর গোসল ফরজ হয়ে যায়। বীর্যপাত হওয়া শর্ত নয়। (মুসলিম: ৯৪৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যখন কেউ তার স্ত্রীর চার অঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানে বসে সহবাস করে, তখন তার উপর গোসল ফরজ হয়ে যায়, যদিও বীর্যপাত না ঘটে।" (সহিহ বুখারি: ১৯২, সহিহ মুসলিম: ৮৪৩)

প্রশ্ন ৩৩৬: নারীরও কি স্বপ্নদোষ হয়?

উত্তর ৩৩৬: উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেন: উম্মে সুলাইম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জা করেন না। কোনো নারীর যদি স্বপ্নদোষ হয়, তাহলে কি তার উপর গোসল আছে?" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "হ্যাঁ, যখন সে পানি (বীর্যের চিহ্ন) দেখে।" উম্মে সালামা (রা.) বললেন: "নারীরও কি স্বপ্নদোষ হয়?" রাসূল ﷺ বললেন: "হ্যাঁ, তোমার ডান হাত ধূলিমলিন হোক!" (সহিহ বুখারি: ২৮২, মুসলিম: ৩১৩)

প্রশ্ন ৩৩৭: স্বপ্নদোষের চিহ্ন না থাকলে গোসলের বিধান কী?

উত্তর ৩৩৭:যদি আর্দ্রতা বা বীর্যের চিহ্ন দেখা যায়, তাহলে গোসল ফরজ। যদি স্বপ্নের কথা মনে থাকে কিন্তু কোনো চিহ্ন না পাওয়া যায়, তাহলে গোসল ফরজ নয়।

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে আর্দ্রতা দেখে কিন্তু স্বপ্ন মনে নেই। নবী ﷺ বললেন: "সে গোসল করবে।" আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যার মনে হয় স্বপ্ন হয়েছে কিন্তু কোনো চিহ্ন নেই। তিনি বললেন: "তার উপর গোসল নেই।" (আবু দাউদ: ৬৩২)

প্রশ্ন ৩৩৮: নারীর গোসলে চুলের বেণী খোলার ব্যাপারে কী সুবিধা দেওয়া হয়েছে?

উত্তর ৩৩৮: শায়খ ইবনে বায (রহ.) বলেন: জানাবাতের গোসল বা হায়েযের গোসলের জন্য চুলের বেণী খোলা ফরজ নয়। তবে হায়েযের গোসলের ক্ষেত্রে খোলা উত্তম।

শায়খ ইবনে উসাইমিন (রহ.) বলেন: যদি চুল এতো ঘন হয় যে পানি গোড়া পর্যন্ত না পৌঁছে, তাহলে বেণী খোলা ফরজ।

শায়খ আল-আলবানি (রহ.) বলেন: জানাবাতের গোসলে নারীর জন্য বেণী খোলা ফরজ নয়; কিন্তু হায়েযের গোসলে খোলা ফরজ — এটাই তার নিকট প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

১. উম্মে সালামা (রা.) বলেন: আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল! আমি চুল শক্ত করে বেঁধে রাখি। জানাবাত ও হায়েযের গোসলে কি খুলবো?" তিনি বললেন: "না, তোমার জন্য যথেষ্ট যে তুমি তিনবার মাথায় পানি ঢালো, তারপর সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করো — তাহলেই তুমি পবিত্র হয়ে যাবে।" (সহিহ মুসলিম : ৩৩০)

২. আয়েশা (রা.) জানতে পারেন যে ইবনে উমর (রা.) নারীদের জানাবাতের গোসলে চুল খোলার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন: "ইবনে উমর বিস্ময়কর কথা বলেছেন! তিনি নারীদের কষ্টে ফেলেছেন। তাহলে কি তাদের মাথা মুণ্ডন করতে বলবেন না? আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম, আর আমি (চুল না খুলেই) তিন মুঠোর বেশি পানি মাথায় ঢালতাম না।" (সহিহ মুসলিম: ৩৩১)

৩. আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে হায়েযের গোসলের সময় বলেছিলেন: "তোমার চুল খুলে গোসল করো।" (ইবনে মাজাহ: ৬৪১)

প্রশ্ন ৩৩৯: শরিয়তে জুনবি ব্যক্তির সাথে মেলামেশা, ওঠাবসা, লেনদেন, খাওয়া-দাওয়া কি নিষিদ্ধ?

উত্তর ৩৩৯:

জুনবি ব্যক্তির সাথে মেলামেশা, ওঠাবসা, লেনদেন, খাওয়া-দাওয়া — সবই জায়েয। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন: একদিন আমি জানাবাতের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার হাত ধরলেন। আমি চুপিসারে সরে গিয়ে গোসল করে ফিরে এলাম। তিনি বললেন: "হে আবু হুরাইরা! তুমি কোথায় গিয়েছিলে?" আমি ঘটনা বললাম। তিনি বললেন: "সুবহানাল্লাহ! মুমিন অপবিত্র হয় না।" (বুখারি : ২৮৩ ও মুসলিম: ৩৭১)

প্রশ্ন ৩৪০: জানাবাত অবস্থায় কোন কাজগুলো নিষিদ্ধ?

উত্তর ৩৪০: জানাবাত অবস্থায় নিম্নোক্ত ইবাদতসমূহ বৈধ নয়:

১. সালাত

২. তাওয়াফ

৩. মসজিদে প্রয়োজন ছাড়া অবস্থান
৪. কুরআন তিলাওয়াত (বিস্তারিত আছে)
৫. মুসহাফ স্পর্শ করা (বিস্তারিত আছে)।

প্রশ্ন ৩৪১: হায়েযা ও জুনবি ব্যক্তির মসজিদে অবস্থান কি বৈধ?

উত্তর ৩৪১: জমহুর উলামার মতে — মসজিদে অবস্থান বৈধ নয়; তবে প্রয়োজনে প্রবেশ বা অতিক্রম করা জায়েয। শায়খ আল-আলবানি (রহ.) অনুমতি দিয়েছেন — কারণ নিষেধাজ্ঞার দলিল তার নিকট প্রমাণিত নয়। কুরআনে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তা নামাযের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা।

প্রশ্ন ৩৪২: জুনবি ও হায়েযার জন্য কি কুরআন তিলাওয়াতের অনুমতি আছে?

উত্তর ৩৪২: জমহুর (অধিকাংশ আলেমদের) মতে জুনবি ব্যক্তির জন্য কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ। তবে শায়খ আল-আলবানির মতে জুনবি ব্যক্তির তিলাওয়াত করা জায়েয, কিন্তু তা মাকরূহ। উত্তম হলো—জুনবি ব্যক্তি গোসল করে তারপর তিলাওয়াত করবে। আর হায়েয অবস্থায় নারীর জন্য পূর্ণ অনুমতি রয়েছে। জুনবি ব্যক্তির তুলনায় হায়েয অবস্থায় নারীর ব্যাপারে আলেমগণ গোসলের ওপর এত জোর দেননি; কারণ জুনবি ব্যক্তির জন্য জানাবাত দূর করা সহজ, কিন্তু হায়েযা নারীর জন্য তার অবস্থা দূর করা তার নিয়ন্ত্রণে নয়।

নোট: জানাবাত অবস্থায় তিলাওয়াতের অনুমতি সাধারণভাবে নয়; বরং বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিতে অনুমোদিত। (শায়খ রিজাউল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ)

প্রশ্ন: জুনবি ব্যক্তির জন্য মুসহাফ স্পর্শ করার বিধান কী?

উত্তর: যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরজ হয়েছে (জুনবি), তার জন্য মুসহাফ (কুরআন মাজিদ) স্পর্শ করা হারাম। এ বিষয়ে চার মাজহাব—হানাফি, মালিকি, শাফেয়ি ও হাম্বালি—সর্বসম্মত। বরং এ বিষয়ে ইজমা (সম্মিলিত ঐকমত্য) বর্ণিত হয়েছে।

দলিলসমূহ

প্রথমত: কুরআন থেকে

১. আল্লাহ তাআলার বাণী:

“নিশ্চয়ই এটি এক সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত কিতাবে অবস্থিত। একে স্পর্শ করে কেবল পবিত্র লোকেরা। এটি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।” (সূরা আল-ওয়াক্বিয়াহ: ৭৭-৮০)

দলিলের দিক:

“يمسه لا” (এটিকে স্পর্শ করে না) – এই সর্বনামটি কুরআনের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়; কারণ এই আয়াতগুলো কুরআনের বিবরণেই অবতীর্ণ হয়েছে।

২. আল্লাহ তাআলার বাণী:

“হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না বুঝতে পারো কী বলছ; আর জানাবাত অবস্থায়ও (মসজিদের নিকটবর্তী হয়ো না), যদি না পথ অতিক্রমকারী হও, যতক্ষণ না গোসল কর।” (সূরা আন-নিসা: ৪৩)

দলিলের দিক:

যখন জুনবি ব্যক্তির জন্য মসজিদে অবস্থান বৈধ নয়, তাহলে আরও অধিকতরভাবে তার জন্য মুসহাফ স্পর্শ করা ও তা থেকে পাঠ করা বৈধ হবে না; কারণ কুরআনের মর্যাদা আরও মহান।

দ্বিতীয়ত: আসার থেকে

আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ ইবনে জাবির (রহ.) বর্ণনা করেন: আমরা সালমান (রাঃ)-এর সাথে সফরে ছিলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে গেলেন, তারপর ফিরে এলেন। আমি বললাম: “হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি অজু করে নিন, হয়তো আমরা আপনার কাছে কুরআনের কিছু আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব।” তিনি বললেন: “তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করো; কারণ আমি এটিকে (মুসহাফকে) স্পর্শ করি না। নিশ্চয়ই একে স্পর্শ করে কেবল পবিত্র লোকেরা।”

অতঃপর আমরা তাকে প্রশ্ন করলাম, আর তিনি অজু করার পূর্বেই আমাদের পড়ে শুনালেন। **সূত্র:** আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ

নোট: শায়খ আলবানি জুনবি ও হায়েয অবস্থায় মুসহাফ স্পর্শের অনুমতি দিয়েছেন; কারণ নিষেধাজ্ঞার সুস্পষ্ট দলিল তার নিকট প্রতিষ্ঠিত নয়।

লিংক: https://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=158339

মন্তব্য: জমহুরের মতামতকে সামনে রেখে এবং মতভেদ থেকে বেরিয়ে আসার উদ্দেশ্যে সতর্কতার পথ অবলম্বন করা উচিত। বাস্তবে জুনবি ব্যক্তির উচিত গোসল করে জানাবাত দূর করা। যদি বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিতে মুসহাফ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করতে হয়,

তবে তিলাওয়াতের পূর্বে গোসল করা উত্তম। কারণ শায়খ আল-আলবানিও জুনুবের তিলাওয়াতকে অনুমোদনসহ মাকরূহ বলেছেন। যদি মুসহাফ স্পর্শ করাই অনিবার্য হয়, তবে কাপড় বা কোনো আবরণ ব্যবহার করে স্পর্শ করা উত্তম।

প্রশ্ন ৩৪৩: হায়েয অবস্থায় নারীর কুরআন তিলাওয়াতের বিধান কী? (প্রশ্ন পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্য হলো অন্যান্য ফতোয়া ও আলেমদের মতামত উপস্থাপন করা)

উত্তর ৩৪৩: হায়েয অবস্থায় নারীর কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয। এটি মালিকি ও জাহিরি মাজহাবের মত। ইমাম শাফেয়ির প্রাচীন মত এবং ইমাম আহমদের এক বর্ণনাও এটাই। এ মত গ্রহণ করেছেন: ইমাম তাবারি, ইবনে তাইমিয়্যা, ইবনে কায়্যিম, ইবনে উসাইমিন এবং স্থায়ী ফতোয়া কমিটিও একই ফতোয়া জারি করেছে।

প্রশ্ন ৩৪৪: হায়েয নারীর জন্য মুসহাফ স্পর্শ করার বিধান কী? (প্রশ্ন পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্য হলো অন্যান্য ফতোয়া ও আলেমদের মতামত উপস্থাপন করা)

উত্তর ৩৪৪ : হায়েয নারীর জন্য মুসহাফ স্পর্শ করা নাজায়েয। এ বিষয়ে চার মাজহাব—হানাফি, মালিকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি—ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। এই মাসআলায় অধিকাংশ আহলে ইলমের ঐকমত্য বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৩৪৫: হায়েয ও নিফাস অবস্থায় আল্লাহর জিকির করার বিধান কী?

উত্তর ৩৪৫: হায়েয ও নিফাস অবস্থায় নারীরা আল্লাহর জিকির করতে পারে। এ বিষয়ে চার মাজহাবের ঐকমত্য রয়েছে এবং এবিষয়ে ইজমা বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৩৪৬: সমসাময়িক ফতোয়ার আলোকে হায়েযা নারীর কুরআন তিলাওয়াতের বিধান কী?

উত্তর ৩৪৬: ১. শায়খ ইবনে উসাইমিন: শুধু তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে অনুমতি আছে; নিষেধের দলিল নেই। তবে মুসহাফ হাতে নিয়ে তিলাওয়াতের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, তাই প্রয়োজনে দস্তানা বা আবরণ ব্যবহার করে পড়া উত্তম।

২. শায়খ ইবনে বাযও তিলাওয়াতের অনুমতি দিয়েছেন।

৩. ইমাম মালিক, ইবনে তাইমিয়্যা ও শাওকানিও অনুমতি দিয়েছেন।

প্রশ্ন ৩৪৭: যে মোবাইল ফোনে কুরআন রয়েছে, তা অজু ছাড়া স্পর্শ করা এবং তা থেকে তিলাওয়াত করার বিধান কী?

উত্তর ৩৪৭: শায়খ সালেহ আল-ফাওযান বলেন: মোবাইলকে মুসহাফ বলা যায় না। মোবাইল থেকে কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে হায়েযা নারীদের জন্য সুবিধা রয়েছে। এছাড়া তাদের জন্যও সহজতা রয়েছে যাদের পক্ষে সর্বদা মুসহাফ বহন করা কঠিন, অথবা এমন স্থানে রয়েছে যেখানে অজু করা কঠিন। মোবাইল থেকে তিলাওয়াত করার সময় অজু থাকা শর্ত নয়। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন ৩৪৮: জুনবি ও হায়েয অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতের বিধান কী?

উত্তর ৩৪৮ : সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) জানাবাত অবস্থায়ও মুসহাফ স্পর্শ না করে কুরআন তিলাওয়াতের পক্ষপাতী ছিলেন।

নোট: জমহুর বলেন—ইবনে আব্বাসের বক্তব্যকে এক-দুই আয়াতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরা হবে, নিয়মিত তিলাওয়াতের জন্য নয়।

নোট: হায়েয অবস্থায় নারীরা অন্যান্য জিকির-আজকার করতে পারে। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক, ইমাম বুখারি, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম ইবনুল মুনযির বলেন—বিশেষ করে যারা হাফিযা, তারা মুসহাফ স্পর্শ না করে তিলাওয়াত করতে পারে। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

গোসলের মাসায়েল ও বিধানসমূহ

প্রশ্ন ৩৪৯: গোসল ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ কী?

উত্তর ৩৪৯: নয় (৯)টি কারণে মুসলিম পুরুষ ও নারীর ওপর গোসল ফরজ হয়:

১. বীর্য স্খলনের মাধ্যমে বের হলে গোসল ফরজ হয়।

২. পুরুষের লিঙ্গ নারীর যোনিতে প্রবেশ করলে উভয়ের ওপর গোসল ফরজ হয়।

৩. স্বপ্নদোষ (ইহতিলাম) হলে।

৪. কোনো মুসলিম মৃত্যুবরণ করলে তাকে গোসল দেওয়া ফরজ (শহীদ ব্যতিক্রম)।

৫. কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার ওপর গোসল ফরজ। কিছু আলেম একে মুস্তাহাব বলেছেন; কারণ প্রত্যেক শাহাদাহ পাঠকারীর জন্য গোসলের স্পষ্ট দলিল নেই।

৬. হায়েজের রক্ত বন্ধ হলে গোসল ফরজ।

৭. নিফাসের রক্ত বন্ধ হলে গোসল ফরজ।

৮. জুমার দিনের গোসল অধিকাংশ আলেমের মতে মুস্তাহাব; শায়খ আলবানি (রহঃ) ওয়াজিব হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

৯. কোনো কাফেরকে দাফন করার পর দাফনকারী মুসলিমের ওপর গোসল ওয়াজিব—কিছু আলেমের মতে মুস্তাহাব।

প্রশ্ন ৩৫০: কোন কোন সময়ে গোসল করা মুস্তাহাব?

উত্তর ৩৫০: যেসব সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জোর দিয়ে গোসলের নির্দেশ দিয়েছেন:

১. জুমার দিনের গোসল (শায়খ আলবানি (রহ.) ওয়াজিব হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন)।

২. ঈদের গোসল।

৩. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর গোসল করা।

৪. ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল।

৫. মক্কায় প্রবেশের পূর্বে গোসল।

৬. আরাফার দিনের গোসল (আলি (রা.) থেকে প্রমাণিত)।

৭. ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল (কিছু আলেমের মতে মুস্তাহাব)।

৮. মুশরিককে দাফনের পর গোসল। একাংশ আলেম এই সময় গোসলকে ওয়াজিব বলেছেন।

৯. অজ্ঞানতা থেকে চেতনা ফিরে এলে।

১০. ইস্তিহাযা রোগিনী নারীর জন্য প্রতি নামাজের সময় গোসল মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

১১. প্রত্যেক সহবাসের আগে গোসল মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

প্রশ্ন ৩৫১: জুমার গোসল ও জানাবাতের গোসল — দুটর জন্য এক গোসল কি যথেষ্ট?

উত্তর ৩৫১: প্রথম মত:

একটি গোসলই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় মত:

দুটি গোসল করতে হবে। এটা শায়খ আলবানি (রহঃ)-এর মত। কারণ তাঁর মতে জুমার গোসল ওয়াজিব, মুস্তাহাব নয়।

শায়খ রেজাউল্লাহ্ মাদানী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন: জুমার দিনে দুই গোসলের প্রয়োজন নেই আর ওয়াজিবও নয়; কারণ, তাওয়াফের মাসআলার ওপর কিয়াস করা এখানে কিয়াস মা'আল-ফারিক (অসামঞ্জস্যপূর্ণ তুলনা); কেননা দুই ধরনের তাওয়াফ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির, এবং শরয়ি দৃষ্টিতে তাদের সময়ও আলাদা ও নির্ধারিত। আর "গোসল" শব্দটির দিকে লক্ষ্য করুন—হাদিসে এসেছে: **«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة»** "যে ব্যক্তি জুমার দিন

জানাবাতের গোসলের মতো গোসল করে...”[৪] এই হাদিসে একটি গোসলেরই উল্লেখ রয়েছে, দুইটি গোসলের নয়। অতএব বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নিন।

প্রশ্ন ৩৫২: গোসলের গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা করুন।

উত্তর ৩৫২: কুরআন থেকে:

আল্লাহ তাআলা বলেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।” (সূরা বাকারা: ২২২)

আরও বলেন: “এতে এমন লোক আছে যারা পবিত্র থাকতে ভালোবাসে, আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।” (সূরা তাওবা: ১০৮)

হাদিস থেকে:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।” (সহিহ মুসলিম ২২৩)

আরও বলেন: “প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আল্লাহর হক হলো, প্রতি সাতদিনে অন্তত একদিন গোসল করা।” (সহিহ বুখারি ৮৯৮)

আমিরুল মু’মিনিন উসমান (রাঃ) প্রায় প্রতিদিন গোসল করতেন। তাঁর খাদেম হুমরান (রহঃ) বলেন: আমি উসমান (রাঃ)-এর জন্য গোসল ও অযুর পানি প্রস্তুত করতাম। এমন কোনো দিন আসত না, যেদিন তিনি সামান্য হলেও পানি নিজের ওপর প্রবাহিত করতেন না। (সহিহ মুসলিম: ২৩১)

প্রশ্ন ৩৫৩: পবিত্রতা অবলম্বন না করলে কি কবরের শাস্তির সতর্কবার্তা এসেছে?

উত্তর ৩৫৩: আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা বা মক্কার দুই কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন: “এদের দু’জনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, এবং তারা বড় কোনো গুনাহের কারণে শাস্তি পাচ্ছে না। বরং তাদের একজন পেশাবের ব্যাপারে সতর্ক থাকত না, আর অন্যজন চোগলখোরি করত।” (সহিহ বুখারি: ২১৬)

প্রশ্ন ৩৫৪: ফরজ ও সুন্নতের বিবেচনায় গোসলের প্রকারভেদ কী?

উত্তর: (১) গোসল মুজযি

[৪] مَنِ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً ، ومَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، ومَن رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَن رَاحَ في السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأنما قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يسْتَمِعُونَ الذكر، أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠)

গোসল মুজযি বলা হয় সেই গোসলকে, যেখানে কেবল গোসলের ফরজ কাজগুলো আদায় করা হয়। এ ধরনের গোসল যথেষ্ট হয়ে যায় (অর্থাৎ শরয়ি কর্তব্য আদায় হয়ে যায়)।

(২) পূর্ণাঙ্গ গোসল

পূর্ণাঙ্গ গোসল হলো সেই গোসল, যেখানে ফরজের পাশাপাশি সুন্নতসমূহও পালন করা হয়। এই কারণে আলেমগণ একে "কামিল গোসল" বলেছেন। এটি উত্তম ও পরিপূর্ণ গোসল।

প্রশ্ন ৩৫৫: গোসলের আগে অজুর বিধান কী?

উত্তর ৩৫৫: শায়খ আলবানি (রহ.) "তামামুল মিন্নাহ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, গোসলের আগে অজু করা সুন্নত।

প্রশ্ন ৩৫৬ : গোসল কি অজুর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়?

উত্তর ৩৫৬: গোসল তখনই অজুর জন্য যথেষ্ট হয়, যখন তা বড়ো অপবিত্রতা দূর করার জন্য করা হয়; যেমন—হায়েয, নিফাস বা জানাবাতের গোসল।

শায়খ ইবনে বায (রহ.) বলেন: "যখন জানাবাতের গোসল করা হয় এবং উভয় অপবিত্রতা (ছোটো ও বড়ো)—অর্থাৎ حدث اصغر ও حدث اكبر—থেকে পবিত্র হওয়ার নিয়ত করা হয়, তাহলে সেই গোসলই যথেষ্ট হবে। কিন্তু যদি অন্য কোনো গোসল হয়—যেমন জুমার গোসল, গরম দূর করার জন্য গোসল, বা সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গোসল—তাহলে তা অজুর জন্য যথেষ্ট হবে না, যদিও সে নিয়ত করা হয়। কারণ এতে (অজুর মতো) নির্ধারিত ক্রম নেই, যা অজুর ফরজ অংশের অন্তর্ভুক্ত। আর এজন্যও যে, এখানে বড়ো পবিত্রতা অর্জনের অবস্থা নেই, যা নিয়তের মাধ্যমে ছোটো পবিত্রতার দিকে নিয়ে যায়, যেমন জানাবাতের গোসলে ঘটে।" (দেখুন: মাজমু' ফাতাওয়া ইবনে বায, ১০/১৭৩)

প্রশ্ন ৩৫৭ : জানাবাত, হায়েয ও নিফাসের গোসল বা অন্যান্য গোসলের ক্ষেত্রে অজু কি শর্ত, নাকি মুস্তাহাব?

উত্তর ৩৫৭ : মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। (শায়খ ইবনে বায)

(সারসংক্ষেপ)

১। এটি সর্বসম্মত বিষয় যে, কোনো প্রকার গোসলের ক্ষেত্রেই গোসলের আগে অজু করা শর্ত নয়। অজু ছাড়াও গোসল শুদ্ধ হবে। তবে আলাদা প্রশ্ন হলো— অজু ছাড়া গোসল করলে, নামাজের জন্য কি আবার অজু করতে হবে?

উত্তর:

জানাবাতের গোসলে যদি ছোটো ও বড়ো উভয় অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার নিয়ত করা হয়, তাহলে সেই গোসলই অজুর জন্য যথেষ্ট হবে। কিন্তু অন্যান্য গোসলে তা যথেষ্ট হবে না।

২। গোসলের আগে অজু করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। (শায়খ ইবনে বায ও শায়খ আল-আলবানি)

৩। জানাবাতের গোসলে যদি বড়ো ও ছোটো উভয় অপবিত্রতা দূর করার নিয়ত থাকে, তাহলে গোসলের সাথেই অজু হয়ে যাবে। কারণ এবিষয়ে দলিল রয়েছে: (فَاطَّهَّرُوا) (ইবনে উসাইমিন)

৪। জানাবাত ব্যতীত অন্যান্য গোসল—যেমন সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গোসল বা মুস্তাহাব গোসল—এসব গোসল অজুর জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ জানাবাতের গোসলের ক্ষেত্রে দলিল পাওয়া গেছে, তাই সেখানে অনুমতি রয়েছে। অন্য গোসলের ক্ষেত্রে দলিল না থাকায় অজুকে তার মধ্যে গণ্য করা হবে না। এক্ষেত্রে মূল নীতি হলো— অজুতে ক্রমানুসার ওয়াজিব। সুতরাং অন্যান্য গোসলে হয় আগে পূর্ণ অজু করবে, অথবা গোসলের শেষে আলাদা করে পা ধুয়ে নিলে—গোসল ও অজু উভয়ই সম্পন্ন হয়ে যাবে।

৫। যদি গোসলের সময় আবরণ ছাড়া লজ্জাস্থান স্পর্শ হয়ে যায়, তাহলে কিছু আলেমের মতে অজু ভেঙে যাবে। আর কিছু আলেমের মতে—কামনাসহ স্পর্শ করলে অজু ভাঙবে। (বিস্তারিত: নাওয়াকিজে অজু আলোচনা) এক্ষেত্রে সতর্কতা হলো— আবরণ ছাড়া লজ্জাস্থান স্পর্শ হলে অজু পুনরায় করা উত্তম, যাতে ইবাদত নিশ্চিত অবস্থায় আদায় করা যায়, সন্দেহের ভিত্তিতে নয়। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

নোট

শায়খ রেজাউল্লাহ আবদুল কারিম (হাফিযাহুল্লাহ) একটি সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন: ফিকহের সূক্ষ্ম বিষয়—যেমন মাকরূহ ও মুস্তাহাব—এসব আলোচনায় এমন যেন না হয় যে সুন্নত পদ্ধতি ও মূল আমলকে উপেক্ষিত হচ্ছে। মূল প্রয়োজন হলো— যদি অজু বা গোসলের সহিহ ও সুন্নতসম্মত পদ্ধতি জানা যায়, তবে সেই পদ্ধতিতেই আমল করা উচিত। এটাই সেই পথ, যাকে মুহাদ্দিসগণ সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়েছেন। শুধু ফরজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা এবং সুন্নত ও উত্তম আমলকে ছেড়ে দেওয়ার অভ্যাস নিজের উপর প্রভাব বিস্তার করতে দেওয়া উচিত নয়। বরং পূর্ণাঙ্গ সুন্নাহ অনুসরণ করা উচিত। ফিকহি মতভেদ ও মুস্তাহাবের স্তর বিবেচনা করে সুন্নাহকে পেছনে ফেলে দেওয়া দ্বীনের স্বভাববিরুদ্ধ। এথেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি।

প্রশ্ন ৩৫৮: গোসলের ফরয ও আরকান (ওয়াজিবসমূহ) কী কী?

উত্তর ৩৫৮:

১. গোসলের নিয়ত করা। (সহিহ বুখারি: ১)

২. বিসমিল্লাহ বলা। শায়খ আলবানি (রহ.)-এর মতে গোসলেও অজুর মতো বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। তাঁর মতে, গোসলখানায় প্রবেশের আগে "বিসমিল্লাহ" পড়ে নেওয়া উচিত।

৩. কুলি করা। (সহিহ বুখারি: ২৫৭)

৪. নাকে পানি প্রবেশ করানো। (সহিহ বুখারি: ২৫৭)

নোট:

শায়খ আলবানি (রহ.) কুলি ও নাকে পানি দেওয়াকে গোসলে ওয়াজিব মনে করেন না, অবশ্য অজুতে ওয়াজিব মনে করেন; কারণ অজু গোসলের অনিবার্য অংশ নয়। তবে ইবনে উসাইমিন (রহ.)- ওয়াজিব হওয়ার দলিল নিয়েছেন কুরআনের আয়াত "فَاطَّهَّرُوا" (তোমরা পবিত্র হও) — এর সাধারণ নির্দেশের ভিত্তিতে। তাই সতর্কতার দিক থেকে এগুলো করা উত্তম। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৫. সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করা, এমনভাবে যেন শরীরের কোথাও শুকনো না থাকে। (সহিহ বুখারি: ২৫৬)

৬. মাথার চুল ঘন হলে খিলাল করা (চুলের ভেতরে পানি পৌঁছানো)। ইবনে উসাইমিন (রহ.) বলেন—যদি শরীরের চুল ঘন হয় বা এমন কোনো স্তর থাকে যাতে পানি পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি হয়, তাহলে ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। শায়খ আলবানির (রহ.) তাহকীক অনুযায়ী এ অবস্থায় ঘষা ওয়াজিব।

৭. গোসলের সময় লজ্জাস্থান আড়াল করা। (সহিহ মুসলিম: ৩৩৮)

৮. গোসলের সময় লজ্জাস্থানে খালি হাতে স্পর্শ করলে— কিছু আলেমের মতে অজু ভেঙে যাবে। আবার কিছু আলেমের মতে, কামভাবসহ স্পর্শ করলে অজু ভাঙবে। সতর্কতার জন্য, আবরণ ছাড়া লজ্জাস্থানে স্পর্শ হলে অজু পুনরায় করে নেওয়া উত্তম—যাতে ইবাদত সন্দেহমুক্ত থাকে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন ৩৫৯: পূর্ণাঙ্গ গোসলের সুন্নত আমলসমূহ কী কী?

উত্তর ৩৫৯:

১. নিয়ত করা।

- যদি জানাবাতের গোসল হয় → জানাবাত দূর করার নিয়ত
- যদি হায়েয বা নিফাসের গোসল হয় → হায়েয/নিফাস দূর করার নিয়ত
- জুমার গোসল হলে → জুমার নিয়ত

জুমহুর আলেমদের মতে নিয়ত গোসলের রুকন। তবে নিয়তের ধরন নির্দিষ্ট করা রুক্‌ন ও ফরয নয়।

২. গোসলখানায় প্রবেশের আগে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। শায়খ আলবানির মতে ওয়াজিব, কারণ অজু ও গোসলের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

৩. উভয় হাত ধোয়া।

৪. লজ্জাস্থান ও শরীরের অন্যান্য স্থানে লেগে থাকা নাপাকি দূর করা।

৫. গোসলের পূর্ণ সুন্নাতি ক্রম বজায় রাখা। (গোসলে ক্রম বাধ্যতামূলক নয়)।

৬. গোসলের পুরো প্রক্রিয়া বিরতি ছাড়া সম্পন্ন করা।

৭. গোসলের আগে পূর্ণ অজু করা, যেমন নামাজের জন্য করা হয়।

৮. মাথায় তিনবার পানি ঢালা, সাথে ঘষা।

৯. সমস্ত শরীর ঘষে পরিষ্কার করা। সাবান ও শ্যাম্পু ব্যবহার করাও এর অন্তর্ভুক্ত। ১০. শরীরের যেসব অঙ্গে ময়লা জমা হয়, সেগুলো ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করা, যেমন- বগল, জাং, টাখনু প্রভৃতি।

১১. গোসল ডান দিক থেকে শুরু করা।

গুরুত্বপূর্ণ নোট:

যদি কেউ বড় অপবিত্রতা (হাদাসে আকবর) দূর করার জন্য গোসল করে, তাহলে ছোটো অপবিত্রতাও (হাদাসে আসগর) দূর হয়ে যায়, যদিও সে আলাদা করে অজুর নিয়ত না করে। এটি জুমহুর (হানাফি, মালিকি, শাফেয়ি) ও সহিহ মত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য। ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে উসাইমিন (রহ.)-ও এই মত গ্রহণ করেছেন। এবিষয়ে ইজমাও বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৩৬০: গোসলের মাকরূহ বিষয়সমূহ কী কী?

উত্তর ৩৬০: গোসলের যেসব মাকরূহ কাজ অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞতাবশত করে থাকে:

1. প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা।
2. স্থির (অচল) পানিতে গোসল করা।
3. গোসলের পর পবিত্রতা নিয়ে সন্দেহ করা।
4. শরীরের বাম দিক থেকে গোসল শুরু করা।
5. শরয়ি কারণ ছাড়া গোসল না করে শুধু শরীর মুছে নেওয়া।

প্রশ্ন ৩৬১: সাধারণ গোসলের সুন্নত পদ্ধতি (ধাপে ধাপে) লিখুন।

উত্তর ৩৬১:

স্টেপ	বিষয়	রেফারেন্স
Step 1	মনে নিয়ত করা	সহিহ বুখারি: ২৪৮, মুসলিম: ৩১৬
Step 2	উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধোয়া	বুখারি: ২৬২, মুসলিম: ৩১৬
Step 3	কুলি করা (৩ বার)	বুখারি: ২৪৮
Step 4	নাকে পানি দেওয়া (৩ বার)	বুখারি: ২৪৮, মুসলিম: ৩১৬
Step 5	মুখ ধোয়া (৩ বার)	বুখারি: ২৪৮, মুসলিম: ৩১৬
Step 6	কনুইসহ দুই হাত ধোয়া	বুখারি: ২৪৮, মুসলিম: ৩১৬
Step 7	মাথা মাসাহ করা (১ বার)	বুখারি: ২৪৮, মুসলিম: ৩১৬
Step 8	কান মাসাহ করা (১ বার)	বুখারি: ২৪৮, মুসলিম: ৩১৬
Step 9	অজু সম্পূর্ণ হওয়ার পর মাথায় তিনবার পানি ঢালা, মাথার চুলের গোড়ায় খেলাল করা এবং ঘষা	বুখারি: ২৭২, মুসলিম: ৩১৬
Step 10	সারা শরীরে পানি ঢালা। প্রথমে ডান পাশে, পরে বাম পাশে। শরীর ভালোভাবে মালিশ করা। এমনভাবে পানি ঢালা যেন শরীরের প্রতিটি অংশ ভিজে যায়। (এই সময় সাবান ও শ্যাম্পু ব্যবহার করা বৈধ।)	বুখারি: ২৪৮, মুসলিম: ৩১৬
Step 11	গোসলের শেষে দুই পা ধোয়া। (কিছু আলেম বলেছেন, অজুর সময়ই পা ধোয়া যায়।)	বুখারি: ২৪৮, মুসলিম: ৩১৬

প্রশ্ন ৩৬২: জানাবাত / হায়েয / নিফাসের গোসলের সুন্নতি পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

উত্তর ৩৬২:

স্টেপ	বিষয়	রেফারেন্স
Step 1	মনে নিয়ত করা: • পুরুষ/নারী যদি জানাবাতের কারণে হয় → জানাবাত দূর করার নিয়ত। • নারী যদি হায়েয/নিফাসে হয় → তা থেকে পবিত্র হওয়ার নিয়ত। • স্বপ্নদোষ হলে → সেই অবস্থার নিয়ত।	বুখারি: ২৪৮, মুসলিম: ৩১৬
Step 2	উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধোয়া	বুখারি: ২৪৮, মুসলিম: ৩১৬
Step 3	যদি সহবাসের পর গোসল হয় তাহলে হাত ধোয়ার পর লজ্জাস্থান ও উরু ভালোভাবে ধোয়া। তারপর অজু করা। এরপর বাকি গোসলের ধাপগুলো সম্পূর্ণ করা। নারীদের ক্ষেত্রেও হায়েয/নিফাস শেষে একইভাবে প্রথমে লজ্জাস্থান পরিষ্কার করে তারপর অজু করে গোসল সম্পূর্ণ করবে।	মুসলিম: ৩১৬
Step 4	কুলি করা (৩ বার)	বুখারি: ২৪৮, মুসলিম: ৩১৬
Step 5	নাকে পানি দেওয়া (৩ বার)	বুখারি: ২৪৮, মুসলিম: ৩১৬
Step 6	মুখ ধোয়া (৩ বার)	বুখারি: ২৪৮, মুসলিম: ৩১৬
Step 7	কনুইসহ দুই হাত ধোয়া	বুখারি: ২৪৮, মুসলিম: ৩১৬
Step 8	নোট: জানাবাতের গোসলে মাথা মাসাহ করা নেই	সুনানে নাসাঈ: ৪২২ (সহিহ)
Step 9	মাথায় পানি ঢালা এবং চুলের গোড়ায় পৌঁছানো	বুখারি: ২৪৮, মুসলিম: ৩১৬
Step 10	সারা শরীরে পানি ঢালা। ডান দিক থেকে শুরু করে পরে বাম	—

	দিক। ভালোভাবে ঘষা, যেন শরীরের সর্বাঙ্গ ভিজে যায়। (সাবান ও শ্যাম্পু ব্যবহারের অনুমতিও উলামায়ে কেরাম দিয়েছেন।)	
Step 11	শেষে দুই পা ধোয়া। (একাংশ আলেম অজুর সাথেই পা ধোয়ার কথা বলেছেন।)	বুখারি: ২৪৮, মুসলিম: ৩১৬

গুরুত্বপূর্ণ নোট:

- হায়েয ও নিফাসের গোসলের জন্য নারীর মাথার সব চুল খুলে গোসল করা জরুরি। (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৬৪১)
- জানাবাতের গোসলে যদি চুল বেণী করা থাকে, তাহলে না খুললেও চলবে; তবে গোড়ায় পানি পৌঁছানো আবশ্যক।
- প্রচলিত ধারণা—বেণী থাকলে তিনবার নয়, পাঁচবার পানি ঢালতে হবে—এটি সহিহ নয়। (আবু দাউদ: ২৪১ – দুর্বল)
- গোসলে তারতিব ও ধারাবাহিকতা ফরয নয়; তবে মুস্তাহাব।

প্রশ্ন ৩৬৩: জানাবাতের গোসলের সুন্নতি পদ্ধতি উল্লেখ করুন।

উত্তর ৩৬৩:

১। গোসলের আগে নিয়ত করা ওয়াজিব। (সহিহ বুখারি: ১)

২। "বিসমিল্লাহ" পড়ে গোসলখানায় প্রবেশ করা উচিত। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে না বলে তবে গুনাহ হবে। কিন্তু ভুলে গেলে গোসল সহিহ হবে; কারণ ভুলে যাওয়া বিষয়গুলোতে কঠোরতা নেই, বরং ক্ষমা রয়েছে।

৩। দুই হাত ধোয়া সুন্নাত। যদি কোনো পাত্র (যেমন মগ) থেকে পানি নেওয়া হয়, তবে আগে হাত ধোয়া ওয়াজিব। অন্যথায় নলকূপ/ট্যাপ থেকে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে। হাত না ধুয়ে বালতি বা পাত্রে হাত দেওয়া উচিত নয়।

৪। এরপর ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতে ঢেলে শরীরের নাপাক অংশ পরিষ্কার করা।

৫। এরপর সাবান বা মাটি দিয়ে হাত ভালোভাবে ধোয়া।

৬। তারপর নামাজের অজুর মতো অজু করা, (তবে পা ধোয়ার কাজ শেষে করা যেতে পারে)। অজুর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ: কুলি করা (৩ বার), নাকে পানি দেওয়া (৩ বার), মুখ ধোয়া (৩ বার), কনুইসহ দুই হাত ধোয়া।

নোট: জানাবাতের গোসলে মাথা মাসাহ করা বাধ্যতামূলক নয়; বরং সতর্কতার দিক থেকে মাথায় পানি ঢালতে হবে।

৭। আঙুলের মাধ্যমে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো।

৮। পানি নিয়ে আঙুলের সাহায্যে মাথার চুলের ভেতরে প্রবেশ করানো।

৯। তিন আঁজলা পানি নিয়ে মাথায় ঢালা, যেন চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে।

১০। সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করা। যে কোনো জিনিস যদি পানির পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করে তা দূর করা।

১১। যদি শরীরে শক্ত চুল থাকে বা ঠাণ্ডা বা কোনো আবরণ/পর্দা জাতীয় বস্তু (যেমন নখের পলিশ) পানির পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে তা অপসারণ করা আবশ্যক। ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করে গোসল সম্পূর্ণ করতে হবে।

১২। যেসব স্থানে ময়লা জমতে পারে সেসব জায়গা ভালোভাবে পরিষ্কার করা—যেমন: বগল, উরু, হাঁটু, শরীরের ভাঁজ ও উঁচু-নিচু স্থান।

১৩। শেষে আলাদা হয়ে দুই পা ধোয়া। (সহিহ বুখারি: ২৪৮, ২৭২, ২৫৭)

১৪। ডান দিক থেকে গোসল শুরু করা উচিত। (সহিহ বুখারি: ২৫৮, ১৬৮)

১৫। জানাবাতের গোসলে নারীর বেণী খোলা জরুরি নয় যদি খুলতে কষ্ট হয়; তবে প্রত্যেক চুল ভেজানো আবশ্যক। (সুনানে আবু দাউদ: ২৫৫) তবে হায়েযের গোসলে বেণী খোলা ওয়াজিব।

১৬। গোসলের সময় পানির ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অল্প পানি দিয়ে গোসল করতেন। (সহিহ বুখারি: ২০১)

১৭। পর্দা রেখে ও শরীর ঢেকে গোসল করা উচিত। (সুনানে আবু দাউদ: ৪০১২)

১৮। স্ত্রীর অবশিষ্ট পানিতে গোসল করা বৈধ—যদি সে সতর্কতার সাথে গোসল করে থাকে। (সহিহ মুসলিম: ৩২৩)

১৯। স্বামী-স্ত্রী একত্রে জানাবাতের গোসল করতে পারে। (সহিহ বুখারি: ২৬১)

২০। যদি এমন গোসলখানা হয় যেখানে টয়লেটও রয়েছে, তাহলে টয়লেট থেকে দূরে এমন স্থানে গোসল করতে হবে যেখানে ছিটা না পৌঁছায়। (ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ ৫/৮৬)

২১। সুন্নতি পদ্ধতিতে গোসল করলে পরে আলাদা অজুর প্রয়োজন নেই। শর্ত: গোসলের সময় অজুর পর লজ্জাস্থানে স্পর্শ না করা। (সুনানে আবু দাউদ: ২৫০)

২২। গোসলের পর তোয়ালে ব্যবহার করা ও হাত ঝাড়া বৈধ। (সহিহ বুখারি: ২৭৬)

হায়েয, ইস্তিহাযা ও নেফাস সম্পর্কিত ৬৬টি বিধান

প্রশ্ন ৩৬৪: নারীদের মধ্যে হায়েয কিভাবে শুরু হলো?

উত্তর ৩৬৪: হায়েয শুরু হওয়ার ব্যাপারে ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বক্তব্য (মওকুফ বর্ণনা): নবী ﷺ বলেছেন: "এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)-এর কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" কিছু আলেম বলেছেন— "সর্বপ্রথম বনী ইসরাঈলের নারীদের মধ্যে হায়েয শুরু হয়েছিল।" ইমাম বুখারি (রহ.) বলেন, নবী ﷺ-এর হাদিসে সমস্ত নারীরা অন্তর্ভুক্ত। এই বক্তব্যের মাধ্যমে কিছু লোকের মত খণ্ডন করা হয়েছে। (সহিহ বুখারি, অধ্যায়: হায়েযের সূত্রপাত কীভাবে হলো?)

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর হাদিস:

তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। আমাদের মুখে হজ ছাড়া অন্য কোনো জিকির ছিল না। আমরা যখন 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছালাম, তখন আমার হায়েয শুরু হলো। আমি কাঁদছিলাম। নবী ﷺ এসে জিজ্ঞেস করলেন: "তুমি কেন কাঁদছ?" আমি বললাম: "হায়! যদি এ বছর হজের ইচ্ছাই না করতাম!" তিনি বললেন: "সম্ভবত তোমার হায়েয এসেছে?" আমি বললাম: "জি হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "এটি এমন বিষয় যা আল্লাহ আদমের কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তুমি পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কা'বা শরীফের তাওয়াফ ছাড়া হজের সব কাজ সম্পন্ন করো।" (সহিহ বুখারি: ৩০৫)

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়— হায়েয আদম (আ.)-এর কন্যাদের সময় থেকেই শুরু রয়েছে। যে বক্তব্যে বলা হয়— "প্রথমে বনী ইসরাঈলের নারীদের মধ্যে শুরু হয়েছিল"— তা ইসরাঈলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারি ও অধিকাংশ মুহাদ্দিস এই বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাকেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমাণিত— হায়েয নারীর সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। যদি কোনো নারীর গর্ভধারণ না হয় এবং তার হায়েয না আসে, তবে তা এক প্রকার অসুস্থতা। আলেমগণ বলেন— আল্লাহ তা'আলা নারীদের এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে তাদের জন্য হায়েয অপরিহার্য। এটি নারীদের হাতে নিয়ন্ত্রিত নয়।

অতএব, নারীরা হায়েযের সময় ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তাদের প্রতিদান দেবেন। এই সমস্ত বর্ণনাসূত্র থেকে বোঝা যায় যে, হায়য বানি ইসরাইলের নারীদের থেকে এটা শুরু হয়নি, বরং এটা প্রথম থেকে নারীদের বৈশিষ্ট্য। (আল্লাহই সর্বজ্ঞ!)

প্রশ্ন ৩৬৫: হায়েযের কারণ ও প্রেক্ষাপট কী?

উত্তর ৩৬৫: হাওয়া (আ.) নিষিদ্ধ গাছের কাছে যাওয়ার কারণে তাকে শাস্তিস্বরূপ হায়েয দেওয়া হয়েছিল।

১। এই বর্ণনাটি ইসরাঈলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত; এটি প্রমাণযোগ্য দলিল নয়।

২। কিছু আলেম এই ধারণা খণ্ডন করে বলেছেন, এতে হাওয়া (আ.)-কে এককভাবে দায়ী করা হয়েছে; অথচ কুরআনে আদম ও হাওয়া উভয়ের উপরই সমানভাবে সম্বোধন এসেছে।

৩। কুরআনে বলা হয়েছে: "তাঁরা উভয়ই বলেন: হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।" (সূরা আল-আ'রাফ: ২৩)

৩। কুরআনের অন্য আয়াতে আছে: "অতঃপর শয়তান তাদের উভয়কে প্রতারণার মাধ্যমে ফাঁসিয়ে দিল।"

৪। কুরআনে আদম ও হাওয়া (আ.) উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে আর ভুলের দায় কেবল হাওয়া (আ.)-এর উপর আরোপ করা হয়নি; বরং উভয়েই শয়তানের প্ররোচনায় কাজ করেছিলেন এবং উভয়েই তাওবা করেছিলেন।

প্রশ্ন ৩৬৬: হায়েযের রক্তের রং কেমন হয়?

উত্তর ৩৬৬: আলেমগণ বলেন, হায়েযের রক্তের রং হতে পারে: লাল, কালো, মাটির মতো গাঢ়, হলদে। শায়খ আলবানি (রহ.) বলেন— যে রং কালো ও সাদার মাঝামাঝি মলিন বা ধূসর ধরনের হয়, সেটিও হায়েয বলে গণ্য হতে পারে।

প্রশ্ন ৩৬৭: হায়েয ও ইস্তিহাযার মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর ৩৬৭: হায়েয ও ইস্তিহাযার মধ্যে পার্থক্য:

নিদর্শন	হায়েয	ইস্তিহাযা
রং	কালো	লাল
ঘনত্ব	ঘন	পাতলা
গন্ধ	দুর্গন্ধযুক্ত	দুর্গন্ধহীন
জমাট বাঁধা	প্রবাহিত থাকে, জমাট বাঁধে না	জমাট বাঁধতে পারে

প্রশ্ন ৩৬৮: হায়েযের সময়সীমা কত?

উত্তর ৩৬৮: হায়েযের নির্দিষ্ট সময়, বয়স বা দিনসংখ্যা নির্ধারিত নয়। এই বিষয়ে ফুকাহাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

রাজেহ (প্রাধান্যপ্রাপ্ত) মত: হায়েযের ন্যূনতম বা সর্বোচ্চ নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই।

ইমাম শাওকানি (রহ.) বলেন— কুরআন ও হাদিসে এর নির্দিষ্ট সীমা সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট দলিল নেই। এই বিষয়ে যে বর্ণনাগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো দুর্বল বা মনগড়া। (আস-সায়লুল জাররার: ৯০)

প্রশ্ন ৩৬৯: হায়েয শুরু হওয়ার বয়স কত?

উত্তর ৩৬৯: শায়খ ইবনে উসাইমিন (রহ.) বলেন— ইমাম দারিমী (রহ.) দীর্ঘ আলোচনা করে সমস্ত মত খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন: মূল বিষয় হলো, যখন হায়েযের লক্ষণযুক্ত রক্ত দেখা যায়, তখন সেটি হায়েয বলে গণ্য হবে। বয়স কম বা বেশি হওয়া এখানে বিবেচ্য নয়। এই মত ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এরও। শায়খ আলবানি (রহ.)-ও একই মত পোষণ করেছেন। (মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া : ১৯/২৩৭; শারহুল মুমতি' : ১/৪০০।)

প্রশ্ন ৩৭০ : হায়েয (ঋতুস্রাব) বন্ধ হওয়ার বয়স কত?

উত্তর ৩৭০: কিছু লোক বলেন, ঋতুস্রাব আসার সর্বোচ্চ বয়স পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত। এর পর যদি কোনো নারীর রক্তপাত হয়, তবে তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে না। কিন্তু এই মতটি গ্রহণযোগ্য (রাজিহ) নয়। কারণ, কুরআন ও হাদীসে হায়েয বন্ধ হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো বয়স নির্ধারণ করা হয়নি।

যেমন শায়খ ইবনু উছাইমীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

সঠিক মত হলো—যতদিন নারীর নিকট পরিচিত স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রক্ত আসে, ততদিন তা হায়েযের রক্ত হিসেবেই গণ্য হবে। হায়েয শুরু হওয়া বা বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বয়সের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। সুতরাং যদি কোনো নারীর পঞ্চাশ বছর পরেও রক্তপাত হয় এবং তা হায়েযের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়, তবে সেটি হায়েযই গণ্য হবে এবং হায়েযের সকল বিধান তার ওপর প্রযোজ্য হবে। অতএব, সে হায়েয চলাকালীন নামাজ ও রোযা পরিত্যাগ করবে। পরে যখন গোসলের মাধ্যমে পবিত্র হবে, তখন রোযার কাজা আদায় করবে। আর যদি কোনো নারীর অভ্যাসগতভাবে হলদে বা মলিন বর্ণের রক্ত নির্দিষ্ট সময়ে আসে, তবে সেটিও হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু যদি নির্ধারিত হায়েযের দিনসমূহ অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই ধরনের হলদে বা মলিন স্রাব আসে, তবে তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে না। এছাড়া, যদি হায়েযের স্বাভাবিক ও পরিচিত রক্ত নির্ধারিত তারিখের আগে বা পরে আসে, তবুও তাতে কোনো পার্থক্য ধরা হবে না। সুতরাং পঞ্চাশ বছরের পরেও যদি কোনো নারীর এমনভাবে হায়েয আসে, তবে সে নামাজ ও রোযা থেকে বিরত থাকবে এবং গোসলের পরই তার পবিত্রতা গণ্য হবে। এটাই সবচেয়ে সহিহ (বিশুদ্ধ) মত। হায়েয বন্ধ হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো বয়স নির্ধারিত নয়। তবে (হানাবিলা মাজহাবের) কিছু আলেমের মত হলো—যদি কোনো নারীর পঞ্চাশ বছরের পর রক্তপাত হয়, তবে তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে না। তারা বলেন, পঞ্চাশ বছরের পর আর স্বাভাবিক অভ্যাস বা রুটিনও বিবেচনা করা হবে না; এমনকি রক্ত কালো রঙের হলেও সেটি হায়েয ধরা হবে না। অতএব, তাদের মতে পঞ্চাশ বছরের পর রক্তপাত হলেও নারী নামাজ ও রোযা ত্যাগ করবে না এবং তার ওপর গোসল ফরয হবে না। কিন্তু

শায়খ ইবনু উসাইমিন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমাদের নিকট এই মতটি সঠিক নয়। (মাজমু ফাতাওয়া ইবনে উসাইমিন: ১১/২৬৯-২৭০; নং ২১৪)

প্রশ্ন ৩৭১ : তুহ্‌র (পবিত্রতার) সময়কাল কতদিন?

উত্তর ৩৭১: পবিত্রতার (তুহর) সময়েরও কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই।

প্রশ্ন ৩৭২: গর্ভাবস্থায় যে রক্ত আসে তার বিধান কী?

উত্তর ৩৭২: গর্ভাবস্থায় যে রক্ত আসে তা হায়েয নয়; বরং অন্য কোনো রক্ত। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও গবেষণার আলোকে সমকালীন আলেমগণ এই ফতওয়া প্রদান করেছেন।

প্রশ্ন ৩৭৩: পবিত্রতা চেনার লক্ষণ কী?

উত্তর ৩৭৩: ১। সাদা নির্গমন (কাসসাতুল বায়দা) —
হায়েয বন্ধ হওয়ার পর যে সাদা তরল বের হয়, সেটি পবিত্রতার চিহ্ন।
২। যদি সাদা তরল না দেখা যায়— তবে তুলা বা কাপড় ব্যবহার করে পরীক্ষা করবে। যদি রক্ত, হলদে বা মলিন রং না দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে হায়েয শেষ হয়েছে।

প্রশ্ন ৩৭৪: হায়েযে দিন গণনা হবে, নাকি রক্তের উপস্থিতি?

উত্তর ৩৭৪: যদি কোনো নারীর অভ্যাস (যেমন ৭ দিন) থাকে, কিন্তু কোনো মাসে ৬ দিন বা ৮ দিন হয়, তাহলে কেবল দিনের হিসাব নয়, বরং রক্তের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত হবে। ইমাম শাফিয়ি, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে উসাইমিন (রহ.) এই গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন ৩৭৫: যদি হলদে, মলিন, বা কালো-হলদের মাঝামাঝি রং বা কেবল আর্দ্রতা দেখা যায়— তার হুকুম কী?

উত্তর ৩৭৫: এক্ষেত্রে দুই অবস্থা:

প্রথম অবস্থা:

যদি এই রং বা আর্দ্রতা হায়েয চলাকালীন বা পবিত্র হওয়ার আগে দেখা যায়, তবে তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা:

যদি পবিত্রতার পর এই রং বা আর্দ্রতা দেখা যায়, তবে তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে না।

প্রশ্ন ৩৭৬: যদি বয়স হায়েযের উপযুক্ত না হয়, তবুও রক্ত আসা শুরু হয়—হুকুম কী?

উত্তর ৩৭৬: যদি রক্তে হায়েযের বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। যদি শুধু হলদে বা মলিন রং হয়, তবে হায়েয হিসেবে গণ্য হবে না।

প্রশ্ন ৩৭৭: যদি শুধু এক ফোঁটা রক্ত দেখা যায়, ধারাবাহিক না হয়—তাহলে কি তা হায়েয?

উত্তর ৩৭৭: যদি কেবল রক্তের ফোঁটা দেখা যায় এবং ধারাবাহিকভাবে না আসে, তবে তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে না।

প্রশ্ন ৩৭৮: হায়েযের রক্তের বৈশিষ্ট্য ও নামাজ-রোজার হুকুম উল্লেখ করুন।

উত্তর ৩৭৮: যদি রমযান মাসে কোনো নারীর হায়েয বন্ধ হয়ে যায় এবং কয়েক দিন পর আবার শুরু হয়, যে রক্ত বের হয়, যদি তার গন্ধ, রং ও বৈশিষ্ট্য হায়েযের মতো হয়, তাহলে তা হায়েয হিসেবেই গণ্য হবে, যদিও দুই হায়েযের মধ্যবর্তী সময় কম হয়। আর যদি সেই রক্তে হায়েযের বৈশিষ্ট্য না থাকে, তাহলে তা ইস্তিহাযা (অস্বাভাবিক রক্ত) হিসেবে গণ্য হবে। ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর উপর নামাজ ও রোজা হারাম নয়। কিন্তু হায়েয থাকা অবস্থায় নামাজ ও রোজা আদায় করলে নারী গুনাহগার হবে।

প্রশ্ন ৩৭৯: হায়েযা নারীর জন্য কি নামাজ ও রোজার কাযা জরুরি?

উত্তর ৩৭৯: হায়েয অবস্থায় নারীর উপর নামাজের কাযা নেই। কিন্তু রোজার কাযা আদায় করা ফরয।

প্রশ্ন ৩৮০: হায়েযে নামাজ না পড়ার কারণ কী?

উত্তর ৩৮০: আলেমগণ বলেন, প্রতি মাসে ৩০–৩৫ ওয়াক্ত নামাজ কাযা আদায় করা অত্যন্ত কঠিন। কিছু নারীর ১০ দিন পর্যন্ত হায়েয থাকে। এভাবে হিসাব করলে বছরে প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার মাসের নামাজ কাযা করতে হতো, যা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। তাছাড়া সময়মতো নামাজ পড়াও ফরয। এই কারণে হায়েযের দিনগুলোর নামাজ নারীদের জন্য মাফ করা হয়েছে। কিন্তু রোজার ক্ষেত্রে বিষয়টি সহজ, কারণ রমযান ছাড়া বাকি ১১ মাসে ৬–৭ বা ১০ দিনের রোজা সহজে কাযা করা যায়। এজন্য হায়েযের সময়ের রোজার কাযা ফরয করা হয়েছে, কিন্তু নামাজ মাফ করা হয়েছে। এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুসলিম নারীদের জন্য এক বড় অনুগ্রহ।

প্রশ্ন ৩৮১: হায়েয অবস্থায় কী বৈধ, আর কী অবৈধ?

উত্তর ৩৮১: হায়েয বা নিফাস অবস্থায় নারীর জন্য নামাজ হারাম, তা ফরয হোক বা নফল। পবিত্র হওয়ার পর ঐ নামাজগুলোর কাযা নেই।

কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে মতভেদ

প্রথম মত: কুরআন তিলাওয়াত করা হারাম।

দ্বিতীয় মত (রাজেহ ও শক্তিশালী মত): তিলাওয়াতের অনুমতি রয়েছে। কারণ এ বিষয়ে কোনো সহিহ ও স্পষ্ট হাদিস প্রমাণিত নয়। ইমাম বুখারি, ইবনু জারীর, ইবনুল মুনযির, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ি (তাঁর কদীম মত)—এঁরা তিলাওয়াতের অনুমতির পক্ষে মত দিয়েছেন। ইবনু হাজর 'ফাতহুল বারী'-তে তা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন: **"لا يَقْرَأُ الجُنبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ"** অর্থাৎ, "অপবিত্র ব্যক্তি (জুনুব) ও হায়েযগ্রস্ত নারী কুরআনের কিছুই পড়বে না।" কিন্তু এই হাদিসটি দুর্বল (যঈফ); হাদিস বিশারদদের মতে এ বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে যে এটি সহিহ নয়। (মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া : ২৬/১৯১)

যিকির-আজকার, তাসবিহ, হাদিস ও ফিকহের কিতাব পড়া, দুআ করা এবং "আমীন" বলা—এসবই জায়েয। এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।

প্রশ্ন ৩৮২: হায়েয অবস্থায় রোযা রাখা কি জায়েয?

উত্তর: হায়েয বা নিফাস অবস্থায় রোযা রাখা হারাম। রমযানের পর ঐ রোযাগুলোর কাজা আদায় করা আবশ্যক।

প্রশ্ন ৩৮৩ : হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা কি জায়েয?

উত্তর ৩৮৩: হাদীসে আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন: ইহুদিদের রীতি ছিল—যখন কোনো নারী হায়েযগ্রস্ত হতো, তারা তাকে সঙ্গে নিয়ে খেত না এবং ঘরেও একসাথে থাকত না। সাহাবীগণ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন—

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

অর্থ: "তারা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দিন, তা অপবিত্রতা। অতএব হায়েয অবস্থায় নারীদের থেকে দূরে থাকো এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তোমাদের যেভাবে অনুমতি দিয়েছেন সেভাবে তাদের নিকট যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ও পবিত্রতা

অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।" (সূরা আল-বাকারা ২:২২২) এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "তোমরা সবকিছু করতে পার, শুধু সহবাস (জিমা) ছাড়া।" অর্থাৎ, হায়েয অবস্থায় 'দূরে থাকা'র অর্থ হলো—সহবাস না করা; অন্য সব কিছু বৈধ।

এই সংবাদ ইহুদিদের কাছে পৌঁছালে তারা বলল: "এই ব্যক্তি (অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ) সর্ব বিষয়ে আমাদের বিরোধিতা করতে চান।" তখন সাইয়্যিদুনা উসাইদ ইবনু হুযায়র ও সাইয়্যিদুনা আব্বাদ ইবনু বিশর (রাঃ) এসে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, ইহুদিরা এমন বলছে। তবে কি আমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করব?" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার রঙ পরিবর্তিত হয়ে গেল—অর্থাৎ তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। কারণ এটি কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশের বিরোধিতা। তারা বের হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য দুধ পাঠালেন এবং পুনরায় ডেকে পান করালেন—যাতে বুঝা যায়, তাঁর অসন্তোষ ব্যক্তিগত কারণে ছিল না। অধিকাংশ আলেমের মত হলো—সহবাস ব্যতীত অন্যান্য দাম্পত্য স্পর্শ ও ঘনিষ্ঠতা জায়েয। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের সঙ্গে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা করতেন, তবে তারা নিচের অংশে কাপড় (লুঙ্গি) পরিহিত থাকতেন। (সুনানে আবু দাউদ: ২৭২, শায়খ আলবানি সহিহ বলেছেন)।

চুম্বন ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠতা জায়েয, কিন্তু সহবাস হারাম। যদি কেউ সহবাস করে, তবে সে গুনাহগার হবে এবং তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে—এক দিনার অথবা অর্ধ দিনার (এক দিনারের পরিমাণ: প্রায় ৪ গ্রাম ২৫ মিলিগ্রাম স্বর্ণ।) তবে যদি অজ্ঞাতসারে (না জেনে যে স্ত্রী হায়েযগ্রস্ত) সহবাস করে, তাহলে কাফফারা নেই।

নোট:

হায়েয বন্ধ হওয়ার পরও যতক্ষণ না স্ত্রী গোসল সম্পন্ন করে, ততক্ষণ সহবাস জায়েয নয়। (সূরা আল-বাকারা ২:২২২)

প্রশ্ন ৩৮৪: ঋতুবতী নারী কি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারে?

উত্তর ৩৮৪: বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত সা'ঈ, রমী জামারাত এবং মুযদালিফায় অবস্থান—এসব আদায় করতে কোনো অসুবিধা নেই। (আয়েশার হাদিস, বুখারি: ২৯৪, মুসলিম : ১২১) হায়েযগ্রস্ত নারীর ওপর তাওয়াফে বিদা (বিদায়ী তাওয়াফ) রহিত (মওকুফ) — কিন্তু উমরার তাওয়াফ বা হজের রুকন তাওয়াফের ক্ষেত্রে তাকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ করা আবশ্যক। যদি কোনো নারী উমরা বা হজের সময় হায়েযে আক্রান্ত হন এবং রুকন তাওয়াফ আদায়ের জন্য পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব না হয়—যেমন সফর বা ফিরে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকে—তবে কিছু গবেষক আলেম জরুরি অবস্থায় ঐ অবস্থাতেই তাওয়াফের অনুমতি দিয়েছেন। তবে মনে

রাখতে হবে, এই অনুমতিকে অকারণে গ্রহণ করা সঠিক নয়। কারণ অধিকাংশ আলেমের ফতোয়া অনুযায়ী এটি কেবল বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একটি রুখসত (ছাড়)। অতএব, শুধুমাত্র কঠিন বাধ্যবাধকতা ও প্রকৃত প্রয়োজনের সময়ই এই ফতোয়ার উপর আমল করা যাবে। সাধারণ অবস্থায় শরীয়তের মূল বিধান—অর্থাৎ পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ—এই নিয়মই অনুসরণ করতে হবে। এই অনুমতি সম্পর্কিত আলেমদের ফতোয়া নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

দায়েমী ফতোয়া কমিটির নিকট প্রশ্ন

প্রশ্ন করা হয়েছিল: "একজন নারী উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছানোর পর হায়েযে আক্রান্ত হন। তার মাহরাম সঙ্গে সঙ্গে সফরে যেতে বাধ্য, এবং মক্কায় তার আর কেউ নেই। এই অবস্থায় তার হুকুম কী?"

কমিটি উত্তর দেয় : যদি বিষয়টি এমন হয় যে, নারী তাওয়াফের পূর্বেই হায়েযে আক্রান্ত হয়েছেন, তিনি ইহরামে আছেন, তার মাহরাম অবিলম্বে সফরে যেতে বাধ্য এবং তার কোনো স্বামী বা মাহরাম মক্কায় উপস্থিত নেই—তাহলে এ অবস্থায় তার জন্য মসজিদে প্রবেশ ও তাওয়াফের ক্ষেত্রে পবিত্রতার শর্ত রহিত হয়ে যাবে। কারণ এটি জরুরি অবস্থা। সুতরাং তিনি প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে তাওয়াফ ও উমরার সা'ঈ সম্পন্ন করবেন। তবে যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় যে, তিনি সফর করে পরে স্বামী বা মাহরামের সঙ্গে ফিরে আসতে পারেন—তাহলে তা-ই উত্তম। যদি দূরত্ব কম হয় এবং ব্যয় সহজলভ্য হয়, তাহলে হায়েয শেষ হওয়ার পর অবিলম্বে ফিরে এসে পবিত্র অবস্থায় উমরার তাওয়াফ আদায় করবেন।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান, কঠোরতা চান না।" "আল্লাহ কোনো প্রাণীর উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না।" "তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।" "তোমরা যতটুকু পার আল্লাহকে ভয় কর।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আমি যখন তোমাদের কোনো আদেশ দিই, তখন তোমরা সাধ্য অনুযায়ী তা পালন করো।" এছাড়াও শরিয়তের বহু দলিল রয়েছে যা কষ্ট দূর করা ও সহজতা প্রদানের কথা বলে। এই মতটি বহু আলেমও ব্যক্ত করেছেন, যাদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ও তাঁর ছাত্র আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) অন্তর্ভুক্ত। (সমাপ্ত — ফতোয়া ইসলামিয়া ২/২৩৮ থেকে সংগৃহীত)

প্রশ্ন ৩৮৫: হায়েযা নারী কি মসজিদে অবস্থান করতে পারে?

উত্তর ৩৮৫: প্রথম মত:

"আমি হায়েযগ্রস্ত নারী ও অপবিত্র ব্যক্তির জন্য মসজিদকে হালাল মনে করি না।" (সুনানে আবু দাউদ : ২৩২, আলবানি যঈফ বলেছেন)

এই হাদিসকে ভিত্তি করে কিছু আলেম বলেছেন যে, হায়েযগ্রস্ত নারীর মসজিদে থাকা হারাম। কিন্তু এই হাদিসটি দুর্বল (যঈফ)।

দ্বিতীয় মত:

হারাম নয়। শায়খ আলবানি (রহ.) দ্বিতীয় মতকে শক্তিশালী ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত বলেছেন। কারণ নিষেধের পক্ষে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই। বরং প্রমাণ রয়েছে যে, নবী ﷺ তাওয়াফ থেকে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু অন্যান্য ইবাদত থেকে নিষেধ করেননি।

নোট:

কিছু লোক হায়েযগ্রস্ত নারীর ঈদগাহে যাওয়া থেকে বিরত রাখার পক্ষে দলিল দেন। এর দুটি উত্তর রয়েছে—

১) সহিহ বুখারিতে আছে—তারা কাতারের পিছনে থাকবে, যাতে কাতার ভেঙে না যায়। (হাদিস: ৯৭১)

২) কিছু বর্ণনায় "মুসল্লা" দ্বারা সালাত বোঝানো হয়েছে। (সহিহ মুসলিম: ৮৯০)

নোট: হায়েযগ্রস্ত নারীদের জন্য ভিন্ন ঘর ও হল বানানো উচিত, যেন মসজিদের ভিতরে না গিয়ে বাইরে থেকে দারস শুনতে পারে—এভাবে মতভেদ থেকেও বেঁচে থাকা যায় এবং উভয় মতের অনুসারী আলেমদের বক্তব্য থেকেও বঞ্চিত হতে হয় না।

প্রশ্ন ৩৮৬: হায়েযা নারীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া যায় কিনা?

উত্তর ৩৮৬: হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। (ইদ্দতের বিধান থেকে বিষয়টি স্পষ্ট) হায়েযের সময় বা সেই পবিত্র অবস্থায়, যখন সহবাস হয়েছে—এ অবস্থায় তালাক দেওয়া উচিত নয়। (ইবনু আব্বাস রা.-এর তাফসির দেখুন)

প্রশ্ন ৩৮৭: ঋতু বন্ধ করার ওষুধের হুকুম কী?

উত্তর ৩৮৭:

জায়েয — (শায়খ ইবনু বায রহ.)

শর্ত:

১) ক্ষতিকর না হয়।

২) স্বামীর অনুমতি থাকে।

প্রশ্ন ৩৮৮: ঋতু চালু করার ওষুধের হুকুম কী

উত্তর ৩৮৮: জায়েয।

শর্ত:

১) রোযা থেকে বাঁচার কৌশল না হয়।

২) স্বামীর অনুমতি থাকে।

প্রশ্ন ৩৮৯: মাগরিবের আগে ঋতু শুরু হলে রোযার হুকুম কী?

উত্তর ৩৮৯: আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন: "নারী যখন হায়েযগ্রস্ত হয়, তখন কি সে নামাজ ও রোযা ছেড়ে দেয় না? এটিই তার দ্বীনের ঘাটতি।" (সহিহ বুখারি, কিতাবুস সওম, হাদিস: ১৯৫১)

যদি কোনো নারী মাগরিবের আগে হায়েযে আক্রান্ত হয়, তবে তার ঐ দিনের রোযা বাতিল হয়ে যাবে এবং তাকে তার কাজা করতে হবে।

আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে যে, হায়েযগ্রস্ত নারীর জন্য ফরজ বা নফল রোযা রাখা হারাম। যদি দিনের যেকোনো সময় রোযা অবস্থায় রক্ত দেখে, তবে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ৩৯০: রমযানে ফজরের আগে পবিত্র হওয়া নারীর রোযার বিধান কী?

উত্তর ৩৯০: মূলনীতি হলো—যদি কোনো নারী রমযানে হায়েযগ্রস্ত হয় এবং ফজর উদয়ের পূর্বে—এমনকি এক মিনিট আগে—পবিত্র হয়ে যায় এবং সে নিশ্চিত হয়, তাহলে তার উপর রোযা রাখা ফরজ। গোসল ফজরের পর করলেও চলবে। কিছু নারী মনে করেন—ইফতারের পর হায়েয শুরু হলে ঐ দিনের রোযা নষ্ট হয়ে যায়—এটি ভুল। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কোনো দলিল নেই। শায়খ ইবনু উছাইমীন (রহ.) বলেন—যদি কোনো নারী ইফতারের পরপরই—এমনকি এক মিনিট পর হলেও—হায়েযে আক্রান্ত হয়, তবে তার রোযা পূর্ণাঙ্গ ও সহিহ।

প্রশ্ন ৩৯১: হায়েয ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়ার বিধান কী?

উত্তর ৩৯১: যদি কোনো নারী আসরের সময় হায়েয থেকে পবিত্র হয়, তাহলে তার উপর যোহর ও আসর—উভয় নামায একত্রে আদায় করা ফরজ। অনুরূপভাবে, যদি কোনো নারী ইশার সময় পবিত্র হয়, তাহলে তার উপর মাগরিব ও ইশা—উভয় নামায একত্রে আদায় করা ফরজ।

এবিষয়ে আলেমদের কয়েকটি মত রয়েছে:

১. দুই নামাযই আদায় করবে — (ইবনু বায রহ.-এর প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত)।
২. কেবল সেই সময়ের একটিমাত্র নামায আদায় করবে — (ইবনু উসাইমিন রহ.-এর প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত)।
৩. সতর্কতার দিক থেকে উভয় নামাযই আদায় করা উত্তম।

প্রশ্ন ৩৯২: নামাযের সময় শুরু হওয়ার পর কোনো নারী হায়েযগ্রস্ত হলে এবং নামায ছুটে গেলে তার বিধান কী?

উত্তর ৩৯২: যদি কোনো নারীর ওপর নামাযের সময় শুরু হওয়ার পর হায়েয আসে এবং সে তখনও ঐ নামায আদায় না করে থাকে, তাহলে হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর কেবল সেই নামাযের কাযা আদায় করবে—যার সময় শুরু হওয়ার পর সে হায়েযগ্রস্ত হয়েছিল। এরপর পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত যে সকল নামায তার থেকে ছুটে যাবে, সেগুলোর কোনো কাজা তার উপর নেই। কারণ, আলেমগণের এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, হায়েয অবস্থায় যে নামাযসমূহ ছুটে যায়, সেগুলোর কাজা আদায় করা নারীর উপর ফরজ নয়।

প্রশ্ন ৩৯৩: নামাজের সময় শেষ হওয়ার কয়েক মিনিট পূর্বে হায়েয শুরু হলে বিধান কী?

উত্তর ৩৯৩: যদি কোনো নারীর নামাজের সময় এতটুকু বাকি থাকে যে, মাত্র এক বা দুই রাকাত পড়ার সময় ছিল—কিন্তু সে সময়ের মধ্যে নামাজ আদায় করতে পারেনি এবং পরে হায়েয শুরু হয়েছে—তবে পবিত্র হওয়ার পর তাকে ঐ নামাজের কাজা আদায় করতে হবে। এটি তার উপর ফরজ। অতএব, পবিত্র অবস্থায় সূর্যাস্তের পূর্বে যদি এক রাকাত পরিমাণ সময় পায়, তাহলে সে আসরের নামাজ পেয়েছে বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে, যদি কোনো নারী নামাজের সময়ের মধ্যে এমন সময় হায়েযে আক্রান্ত হয় যখন অন্তত এক রাকাত পড়ার সময় ছিল—তাহলে ঐ নামাজ তার উপর কাজা করা ফরজ হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন ৩৯৪: রমযানে ফজরের পরে পবিত্র হওয়া নারীর রোযার হুকুম কী?

উত্তর ৩৯৪:

শায়খ ইবনু উসাইমিন (রহ.) বলেন: যদি কোনো হায়েযগ্রস্ত নারী ফজর উদয়ের পরে পবিত্র হয়, তবে এ বিষয়ে আলেমদের দুটি মত রয়েছে—

প্রথম মত:

সেদিন তাকে খাওয়া-দাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে; তবে তার এদিনের রোযা গণ্য হবে না এবং তাকে এই রোযার কাজা করতে হবে। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত এটাই।

দ্বিতীয় মত:

যদি কোনো নারী ফজরের পরে পবিত্র হয়, তবে তার জন্য খাওয়া-দাওয়া করা বৈধ। কারণ তার জন্য সেদিনের রোযা সঠিক নয়। যেহেতু ফজরের সময় রোযা শুরু হওয়ার সময় সে হায়েয অবস্থায় ছিল, তাই এদিনের রোযা গণ্য হবে না। আর যখন রোযা গণ্যই হবে না, তখন খাওয়া-দাওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই। তার উপর রোযাদারের মতো অবস্থান করা আবশ্যক নয়। কারণ রোযা একটি শরয়ী ইবাদত, যার জন্য ফজরের পূর্বে নিয়ত করা আবশ্যক এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয়। এই মাসআলায় দ্বিতীয় মতটি অধিক সঠিক ও রাজিহ। তবে উভয় মতেই এবিষয়ে একমত যে, পরবর্তীতে এদিনের রোযা কাজা করতে হবে। (৬০ প্রশ্ন ও উত্তর, আহকামুল হায়েয — ইবনু উসাইমিন, পৃষ্ঠা ১১৯)

প্রশ্ন ৩৯৫: রমযানের দিনে দিনের প্রথমাংশে রোজা অবস্থায় হায়েয শুরু হলে তার বিধান কী?

উত্তর ৩৯৫: আতা ইবনু আবি রাবাহ (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়: যদি কোনো নারী রমযানের দিনে দিনের প্রথমাংশে রোযা অবস্থায় হায়েযে আক্রান্ত হয়, তবে সে কী করবে? তিনি বলেন: সে খাওয়া-দাওয়া করতে পারবে। (মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবা, কিতাবুস সিয়াম- ৬/১৫, হাদিস: ৯৫৮৯)

প্রশ্ন ৩৯৬: হায়েযগ্রস্ত নারীর কুরআন তিলাওয়াতের হুকুম কী?

উত্তর ৩৯৬: ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (রহ.) হায়েযগ্রস্ত নারীর জন্য কুরআন তিলাওয়াতের অনুমতি দিয়েছেন—যেমন ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা তাঁর ফতোয়ায় উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

যারা তিলাওয়াতকে নিষিদ্ধ বলেন তাদের যুক্তি:

যারা বলেন হায়েযগ্রস্ত নারীর কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয নয়, তারা বলেন—হায়েয ও জানাবাত উভয়ই বড়ো অপবিত্রতা। সহিহ হাদীসে জানাবাত অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত থেকে নিষেধ করা হয়েছে। হায়েযের অপবিত্রতা জানাবাতের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী, তাই জানাবাতের উপর যে হুকুম প্রযোজ্য, হায়েযের উপর তা অধিকতর প্রযোজ্য হওয়া উচিত। তবে তাদের দলিলসমূহে মতভেদ রয়েছে, যার ফলে জায়েয হওয়ার দিকও শক্তিশালী হয়।

- কেউ বলেন: হায়েযগ্রস্ত নারী ছোটো আয়াত বা ছোটো অংশ পড়তে পারে।
- যদি সে কুরআনের শিক্ষিকা হয়, তবে শব্দে শব্দে পড়াতে পারে।
- কেউ বলেন: জিহ্বা না নাড়িয়ে মনে মনে পড়তে পারে।
- দৈনন্দিন দুআ যেমন—খাওয়ার দুআ, ঘুমের দুআ, বাথরুমে যাওয়ার দুআ, হাঁচির জবাব ইত্যাদি—সব পড়তে পারে।

প্রশ্ন ৩৯৭: অপবিত্র (জানাবত অবস্থায়) ব্যক্তি ও ঋতুবতী নারী কি কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন?

উত্তর ৩৯৭:

- ঋতুবতী নারী কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করতে পারেন।
- এই মাসআলায় যেসব হাদিসে নিষেধাজ্ঞার কথা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো দুর্বল (যঈফ)।
- ঋতুবতী নারীর জন্য যিকির-আযকার, তাসবিহ ও তাহলিল করা জায়েজ। কিছু সম্মানিত আলেমগণ বলেন, এই ভিত্তিতেই ঋতুবতী নারীর জন্য কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করাও জায়েজ। কারণ অনেক নারীর ঋতুকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়। যদি তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াতের অনুমতি না দেওয়া হয়, তবে আশঙ্কা থাকে যে তারা কুরআন ভুলে যেতে পারেন।
- ঋতুবতী নারী কাপড় বা অনুরূপ কোনো আবরণের মাধ্যমে কুরআন মাজিদ স্পর্শ ও উঠাতে পারেন।
- ঋতুবতী নারীর পাশে বসে, এমনকি তার কোলে মাথা রেখে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করাও জায়েজ।
- তবে বহু আলেমের মত হলো—ঋতুবতী নারীর কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা জায়েজ নয়।
- আর কিছু গবেষক আলেমের মত হলো—ঋতুবতী নারীর কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা জায়েজ।

প্রশ্ন ৩৯৮: হায়েয ও নিফাস অবস্থায় কুরআন ধরার ও স্পর্শ করার পদ্ধতি আলোচনা করুন।

উত্তর ৩৯৮: আবু ওয়াইল তাঁর দাসীকে হায়েয অবস্থায় আবু রাযীন-এর কাছে পাঠাতেন, এবং সে কুরআনকে কাপড়ে মোড়ানো অবস্থায় নিজ হাতে নিয়ে আসত। (সহিহ বুখারি, কিতাবুল হায়য। ইমাম ইবনে আবু শায়বা এই বর্ণনাটি মাওসুল সূত্রে এনেছেন।)

এ থেকে বোঝা যায়—হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত নারী সরাসরি কুরআন স্পর্শ করবে না; তবে আচ্ছাদনের মাধ্যমে স্পর্শ করতে পারবে, অথবা দস্তানা পরে ধরতে পারবে।

প্রশ্ন ৩৯৯: হায়েযগ্রস্ত নারীর মসজিদে প্রবেশের বিধান কী?

উত্তর ৩৯৯: প্রয়োজনে প্রবেশে অসুবিধা নেই; তবে কাজ শেষ হলে দ্রুত বের হয়ে যাবে। নাসাঈর বর্ণনা অনুযায়ী এটি জানা যায়। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

নোট:

শায়খ আলবানি (রহ.)-এর মতে, হায়েযা নারীর মসজিদে প্রবেশ করার অনুমতি রয়েছে। কারণ এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞার জন্য কোনো সুস্পষ্ট (সারীহ) দলিল নেই। কিন্তু অধিকাংশ আলেম (জমহুর) এই অনুমতি দেননি। সুতরাং এই মাসআলায় সতর্কতার দিকটি বিবেচ্য। কিছু স্থানে বা কিছু মসজিদে বিষয়টি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান ও অবহিতকরণ ছাড়া অনুমতিমূলক ফতোয়ার বাস্তব প্রয়োগ করলে ফিতনার আশঙ্কা সৃষ্টি হতে পারে। অতএব, আগে এবিষয়ে সঠিক জ্ঞান সাধারণভাবে প্রচার করা উচিত। আর যদি ফিতনা সৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে অনুযায়ী আমল করা যেতে পারে। অথবা, মসজিদের ভেতরে না রেখে দরস বা শিক্ষার জন্য হায়েযা নারীদের জন্য মসজিদ থেকে পৃথক একটি কক্ষের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মতভেদের বাইরে বের হওয়ার জন্য এটি একটি উত্তম পথ। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন ৪০০: হায়েযা স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর এক বিছানায় শোয়ার বিধান কী?

উত্তর ৪০০: হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত নারী প্রকৃতপক্ষে নাপাক নয়। কেবল কিছু আদব রক্ষা করে তাকে নামাজ ও অন্যান্য ইবাদত থেকে সাময়িক বিরত রাখা হয়েছে। হাদিস দ্বারা প্রমাণিত—মুসলিম নারী বা পুরুষের শরীর, ঘাম ইত্যাদি স্বভাবগতভাবে নাপাক নয়।

প্রশ্ন ৪০১: হায়েযগ্রস্ত নারীর সঙ্গে ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির বিধান কী?

উত্তর ৪০১: আল্লাহ বলেন: "তারা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, তা কষ্টদায়ক অবস্থা। অতএব হায়েয অবস্থায় নারীদের থেকে পৃথক থাকো।" (সূরা বাকারা: ২২২) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "সহবাস ছাড়া সবকিছু করো।" (সহিহ মুসলিম, কিতাবুল হায়েয: ৩০২, সুনানে তিরমিযি: ২৯৭৭, আবু দাউদ: ২৫৮, ইবনে মাজাহ: ৬৪৪)
অর্থাৎ সহবাস হারাম; কিন্তু খাওয়া-দাওয়া, একত্রে থাকা, কথা বলা—সব জায়েয।

প্রশ্ন ৪০২: হায়েয অবস্থায় তাওয়াফের বিধান কী?

উত্তর ৪০২: উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদাহ আয়িশা (রা.) (রাঃ) বর্ণনা করেন— আমরা মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাথে বের হলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল হজ আদায় করা। যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কায় পৌঁছালেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়ার সাঈ করলেন। কিন্তু তিনি (সা.) ইহরাম খোলেননি, কারণ তাঁর সাথে কুরবানির পশু ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য সাহাবিরাও তাওয়াফ করলেন। যাদের সাথে কুরবানির পশু ছিল না, তারা তাওয়াফ ও সাঈ সম্পন্ন করার পর ইহরাম খুলে ফেললেন। কিন্তু উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদাহ আয়িশা (রাঃ) ঋতুবতী হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে সবাই যখন তাদের

হজের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করলেন, তখন 'লাইলাতুল হাসবা'—অর্থাৎ রওনা হওয়ার রাত এলো। তখন সায়্যিদাহ আয়িশা (রাঃ) বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সকল সঙ্গী হজ ও উমরা উভয়ই সম্পন্ন করে ফিরছেন, কিন্তু আমি উমরা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।" রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "আমরা যখন এসেছিলাম, তখন কি তুমি ঋতুস্রাবের কারণে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারোনি?" আমি বললাম: "না (করতে পারিনি)।" তখন তিনি বললেন: "তাহলে তোমার ভাইয়ের সাথে তানঈমে যাও এবং সেখান থেকে উমরার ইহরাম বাঁধো (এবং উমরা আদায় করো)। আমরা অমুক স্থানে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।" অতঃপর আমি আমার ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর (রাঃ)-এর সাথে তানঈমে গেলাম এবং সেখান থেকে ইহরাম বাঁধলাম। এভাবেই উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রা.) (রাঃ)-ও ঋতুবতী হয়েছিলেন। তখন নবী করিম (সা.) স্নেহভরে বললেন: (তুমি কি আমাদের আটকে দেবে?) তুমি কি কুরবানির দিনে তাওয়াফে জিয়ারত করনি?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, করেছি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, চলো।" এরপর আমি যখন তাঁর কাছে পৌঁছালাম, তখন তিনি মক্কার উঁচু এলাকার দিকে উঠছিলেন আর আমি নামছিলাম—বা একথাও বলা হয়েছে যে আমি উঠছিলাম আর নবী করিম (সা.) নামছিলেন। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় 'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে' কথাটি নেই। জারীর, মনসূরের সূত্রে 'নেই' শব্দটির উল্লেখ করে এর সমর্থন করেছেন। (সহিহ বুখারি, কিতাবুল হজ: ১৭৬২, মুসলিম: ১২৭৭, তিরমিযি: ২৯৬৫, নাসায়ি: ২৯৩১)

প্রশ্ন ৪০৩: ঋতুবতী নারীদের দুআয় অংশগ্রহণ করার বিধান কী?

উত্তর ৪০৩: হাফসা বিনতে সিরীন (রহ.) বলেন— আমরা আমাদের অবিবাহিতা তরুণী মেয়েদের ঈদগাহে যেতে বাধা দিতাম। পরে এক নারী এলেন এবং বানি খালাফের প্রাসাদে অবস্থান করলেন। তিনি তাঁর বোন উম্মে আতিয়্যা (রা.) (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তাঁর স্বামী নবী কারিম মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাথে বারোটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি নিজেও তাঁর স্বামীর সাথে ছয়টি যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমরা আহতদের সেবা করতাম এবং রোগীদের দেখাশোনা করতাম। একবার আমার বোন নবী করিম (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন— "আমাদের কারও কাছে যদি চাদর না থাকে, তাহলে কি তার জন্য ঈদের নামাজে বাইরে না যাওয়ায় কোনো সমস্যা আছে?" রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন— "তার সঙ্গিনী যেন তার চাদরের কিছু অংশ তাকে পরিয়ে দেয়। তারপর তারা কল্যাণের সমাবেশে এবং মুসলমানদের দুআয় অংশগ্রহণ করবে।" উম্মে আতিয়্যা (রাঃ) যখন এলেন, আমিও তাঁকে একই প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন— "আমার পিতা আপনার উপর কুরবান হোন! হ্যাঁ, নবী করিম (সা.) একথাই বলেছেন।" তিনি যখনই নবী করিম (সা.)-এর নাম উল্লেখ করতেন,

বলতেন—

"আমার পিতা আপনার উপর কুরবান হোন।" তিনি আরও বলেন— "আমি নবী করিম (সা.)-কে বলতে শুনেছি— তরুণী মেয়েরা, পর্দানশীন নারীরা এবং ঋতুবতী নারীরাও যেন বাইরে বের হয় এবং কল্যাণের কাজ ও মুসলমানদের দুআয় অংশগ্রহণ করে। তবে ঋতুবতী নারীরা নামাজের স্থান থেকে দূরে থাকবে।" হাফসা বলেন— আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ঋতুবতী নারীরাও?" তিনি বললেন— "তারা কি আরাফাত এবং অমুক অমুক স্থানে যায় না? যখন তারা ঐসব পবিত্র স্থানে যায়, তাহলে ঈদগাহে কেন যাবে না?" (দেখুন সহিহ বুখারি, কিতাবুল হায়েয: ৩২৪, মুসলিম: ৮৯০, তিরমিযি: ৫৩৯, আবুদাউদ: ১১৩৬, ইবনে মাজাহ: ১৩০৮)

প্রশ্ন ৪০৪: তাওয়াফে ইফাযা সম্পন্ন করার পর যদি কোনো নারী ঋতুগ্রস্থ হয়ে যায়, তবে কি তার জন্য তাওয়াফে বিদা মাফ হবে?

উত্তর ৪০৪: উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা.) (রাঃ) বর্ণনা করেন— সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রাঃ) ঋতুমতী হয়ে গেলে বিষয়টি নবী করিম (সা.)-কে জানানো হলো। তিনি বললেন— "মনে হয় সে আমাদের বিলম্বিত করবে! সে কি তোমাদের সাথে তাওয়াফে ইফাযা করেনি?" সাহাবিরা বললেন— "হ্যাঁ, করেছে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন— "তাহলে বের হয়ে চলো।" অর্থাৎ, সাফিয়্যা (রাঃ)-এর হজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং তার জন্য তাওয়াফে বিদা মাফ। (সহিহ বুখারি, কিতাবুল হায়েয: ৩২৮)

নোট

তাওয়াফে ইফাযা:

১০ই জিলহজ মিনা থেকে ফিরে এই তাওয়াফ করা হয়। এটি হাজিদের উপর ফরজ এবং হজের রুকন।

তাওয়াফে বিদা:

হাজিরা যখন মক্কা থেকে বিদায় নেন, তখন এই তাওয়াফ করা হয়। এটি হজের রুকন নয়, তবে ওয়াজিব। হাদিসের ভিত্তিতে ঋতুবতী নারীদের জন্য এই তাওয়াফ মাফ।

প্রশ্ন ৪০৫: ইহরামের গোসলের সময় হায়েযা নারী কি চুলের বেণী খুলবে?

উত্তর ৪০৫: উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদাহ আয়িশা (রা.) (রাঃ) বর্ণনা করেন— তিনি যখন হজের উদ্দেশ্যে বের হন, তখন ঋতুবতী হয়ে যান। ইহরাম বাঁধার গোসলের সময় চুলের বেণী খোলা সম্পর্কে নবী করিম (সা.) বললেন— "তোমার চুল খুলে ফেলো, চিরুনি করো, হজের ইহরাম বাঁধো এবং উমরা পরিত্যাগ করো।" তিনি বলেন— আমি তাই করলাম। এরপর আমরা যখন হজ সম্পন্ন করলাম...

নোট: এক মতানুযায়ী, ঋতুমতী নারীর গোসলের ক্ষেত্রে জানাবতের গোসলের মতো চুলের বেণী খোলা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়—বিশেষত ঋতু শেষ হওয়ার পরের গোসলে। অন্য কিছু আলেম পার্থক্য করেছেন এবং বলেছেন— ঋতু শেষ হওয়ার গোসলে চুলের বেণী খোলা ওয়াজিব। এই মতটিই রাজিহ। শায়খ আলবানি ও সা'দ খাসলানও এই মত পোষণ করেন। এটিও স্মরণীয় যে, জানাবতের গোসল ঘন ঘন প্রয়োজন হয়, কিন্তু ঋতুর গোসল শুধুমাত্র ঋতু শেষ হলে একবারই করতে হয়।

প্রশ্ন ৪০৬: পবিত্র হওয়ার পর হলদে বা মলিন রঙের স্রাবের হুকুম কী?

উত্তর ৪০৬: উম্মে আতিয়্যা (রা.) (রাঃ) বলেন— "আমরা (পবিত্র হওয়ার পর) হলদে বা মলিন রঙের স্রাবকে কোনো গুরুত্ব দিতাম না।"

নোট:

এই হাদিস থেকে জানা যায়— ঋতুবতী নারী পবিত্র হয়ে গোসল করার পর যদি হলদে বা মলিন রঙের স্রাব দেখা যায়, তবে তা ঋতুস্রাব হিসেবে গণ্য হবে না। তবে ঋতুকাল চলাকালীন এমন স্রাব দেখা দিলে তা ঋতুই গণ্য হবে।

প্রশ্ন ৪০৭: ঋতু বা নিফাস অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী নারীর জানাজার নামাজের পদ্ধতি কী?

উত্তর ৪০৭: সাহাবি সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা.) (রাঃ) বলেন— আমি নবী করিম (সা.)-এর পেছনে নামাজ পড়েছি। তিনি উম্মে কা'ব (রাঃ)-এর জানাজার নামাজ পড়ান, যিনি নিফাস অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জানাজার নামাজ পড়ানোর সময় তাঁর দেহের মাঝামাঝি, অর্থাৎ কোমরের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। (সহিহ বুখারি, কিতাবুল হায়েয: ৩২৬, আবুদাউদ: ৩০৭)

নোট:

এই হাদিসটি সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত। তবে সহিহ বুখারির বর্ণনায় এসেছে— উম্মে কা'ব (রাঃ) গর্ভাবস্থায় ইন্তিকাল করেছিলেন। আর সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় নিফাস অবস্থার কথা উল্লেখ রয়েছে।

ইস্তিহাযা (অস্বাভাবিক রক্তস্রাব)-এর বিধান ও মাসআলা

প্রশ্ন ৪০৮: হায়েয ও ইস্তিহাযার মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর ৪০৮: উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদাহ আয়িশা (রা.) (রাঃ) বর্ণনা করেন— ফাতিমা বিনতে আবি হুবাইশ (রা.) (রাঃ) নবী করিম মুহাম্মাদ (সা.)-কে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো

(রক্তস্রাবের কারণে) পবিত্রই হতে পারি না; তবে কি আমি সম্পূর্ণ নামাজ ছেড়ে দেব?" রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "এটি শিরা (রগ)-এর রক্ত, হায়েয নয়। সুতরাং যখন তোমার হায়েযের নির্দিষ্ট দিনগুলো আসবে—যেদিনগুলোতে আগে তোমার নিয়মিত হায়েয হতো—তখন নামাজ ছেড়ে দেবে। আর যখন সেই নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবে, তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে এবং নামাজ আদায় করবে।" (সহিহ বুখারি, কিতাবুল হায়েয: ৩০৬, মুসলিম: ৩৩৪, তিরমিযি: ১২৫, আবু দাউদ: ২৮২, নাসায়ি: ৩৫১, ইবনে মাজাহ: ৬২৬)

প্রশ্ন ৪০৯: ইস্তিহাযা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর ৪০৯: ইমাম ইবনুল আসির বলেন— হায়েযের স্বাভাবিক দিনগুলোর পরও যদি নারীর রক্তস্রাব চলতে থাকে, তবে তাকে ইস্তিহাযা বলা হয়। আর যে নারী এই সমস্যায় আক্রান্ত হন, তাকে 'মুস্তাহাযা' বলা হয়। (আল-নিহায়া ফি গারিবিল হাদিস লি-ইবনে আসির: ১/৪৬৯, লিসানুল আরাব: ৭/১৪২-১৪৩)

প্রশ্ন ৪১০: ইস্তিহাযার রক্তের বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর ৪১০: ইবনে জুযাই আল-কালবি বলেন— ইস্তিহাযার রক্ত হায়েযের রক্ত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হায়েযের রক্ত কালচে ও ঘন হয়। ইস্তিহাযার রক্ত পাতলা, লাল এবং কিছুটা হলদে আভাযুক্ত হয়। (আল-কাওয়ানুন আল-ফিকহিয়্যাহ: পৃ. ৩২)

প্রশ্ন ৪১১: ইস্তিহাযা অবস্থায় ইবাদতের বিধান কী?

উত্তর ৪১১: ইস্তিহাযা অবস্থায় নারী রক্ত যেন ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্য কাপড় বা অন্য কোনো উপায়ে তা নিয়ন্ত্রণ করবেন। এই অবস্থায় নামাজ আদায় করা জায়েজ, রোজা রাখা জায়েজ, তাওয়াফ করা জায়েজ, হায়েযের কারণে যেসব কাজ নিষিদ্ধ ছিল, সেগুলোও জায়েজ। তবে নামাজের জন্য কিছু বিধান রয়েছে:

1. প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করা আবশ্যক।
2. অজুর আগে লজ্জাস্থান পরিষ্কার করতে হবে।
3. যোহরকে শেষ সময়ে এবং আসরকে প্রথম সময়ে পড়ে একত্র করা যেতে পারে।
4. রক্ত বের হওয়া অজু বা নামাজকে নষ্ট করবে না, কারণ তিনি মাজুর (অক্ষম/বিশেষ অবস্থার) অন্তর্ভুক্ত।

সহবাসের বিধান:

জমহুর আলেমদের মতে, ইস্তিহাযা অবস্থায় সহবাস জায়েজ। (নায়লুল আওতার: ১/৩৫৬)

যদি আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে জরায়ু অপসারণ করা হয় এবং আর হায়েয হওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে যে রক্ত বের হবে তা রোগজনিত বা ফাসাদ (অস্বাভাবিক) রক্ত হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু যদি এখনো হায়েয হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সেই রক্ত ইস্তিহাযার রক্ত হিসেবে গণ্য হবে। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ উসাইমিন (রহ.) বলেছেন— এমন অবস্থায় প্রত্যেক নামাজের জন্য পৃথকভাবে অজু করতে হবে।

প্রশ্ন ৪১২: ইস্তিহাযা কাকে বলে?

উত্তর ৪১২: ইস্তিহাযা বলতে সেই রোগজনিত রক্তস্রাবকে বোঝায়, যা হায়েয (ঋতুস্রাব) ছাড়া অন্য কোনো চিকিৎসাগত কারণে হয়ে থাকে।

আরবি শব্দ **يَسْتَحِيضُ – اِسْتَحَاضَ**ক্রিয়াটি باب استفعال (ইস্তিফ'আল) থেকে গঠিত মাসদার (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য)।

নবী করিম ﷺ বলেছেন: "যখন হায়েযের রক্ত হয়, তা কালো হয় এবং সহজে চেনা যায়। যখন সে রক্ত আসবে, তখন নামাজ থেকে বিরত থাকবে। আর যখন অন্য রক্ত হবে, তখন অজু করবে এবং নামাজ পড়বে; কারণ তা শিরার (রগের) রক্ত।" (আবুদাউদ: ২৮৬, আলবানি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।)

ফাতিমা বিনতে আবি হুবাইশ (রা.) (রাঃ) বলেন, তাঁর ইস্তিহাযার রক্তস্রাব হতো। তখন আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সা.) তাঁকে এ নির্দেশ দেন।

মুস্তাহাযা (ইস্তিহাযাগ্রস্ত) নারী রোজা রাখবেন এবং নামাজ আদায় করবেন। উবায়েদ ইবনে আযিব (রা.) (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর নবী ﷺ ইস্তিহাযা সম্পর্কে বলেছেন:

- যে দিনগুলোতে তার নিয়মিত হায়েয হয়, সে দিনগুলোতে নামাজ ছেড়ে দেবে।
- এরপর গোসল করবে।
- ইস্তিহাযার রক্ত চলমান থাকলে প্রত্যেক নামাজের জন্য পৃথকভাবে অজু করবে।
- রোজা রাখবে এবং নামাজ আদায় করবে।

(তিরমিযি: ১২৬, আলবানি সহিহ বলেছেন। আবুদাউদ: ২৯৭; ইবনে মাজাহ: ৬২৫)

নিফাস (প্রসব-পরবর্তী রক্তস্রাব)-এর বিধান

প্রশ্ন ৪১৩ : নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ কত?

উত্তর ৪১৩: সর্বোচ্চ ৪০ দিন।

ইমাম তিরমিযি উল্লেখ করেছেন যে, আহলে ইলমের ইজমা হলো— যদি ৪০ দিনের আগেই রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তবে নারী গোসল করে নামাজ শুরু করবেন। (তিরমিযি: ৩২ নং হাদিসের পরে)

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানও বলে যে সাধারণত ৪০ দিনের বেশি নিফাসের রক্ত থাকে না।

নিফাসের রক্ত যদি মোটেও না আসে, আর এমন খুব কম হয়, তাহলে নামায শুরু করে দেবেন।

প্রশ্ন ৪১৪: ৪০ দিনের মধ্যে রক্ত বন্ধ হয়ে আবার শুরু হলে কী হবে?

উত্তর ৪১৪: ইমাম ইবনে কুদামাহর মত: এটিকে নিফাস হিসেবে গণ্য করা হবে; নামাজ ও রোজা পরিত্যাগ করবে।

শায়খ ইবনে উসাইমিনের মত: লক্ষণ দেখে সিদ্ধান্ত হবে। যদি রক্ত নিফাসের মতো হয়, তবে নিফাসের বিধান প্রযোজ্য হবে। (শারহুল মুমতি' : ১/৪৫০)

প্রশ্ন ৪১৫: গর্ভপাতের পর রক্তস্রাবের বিধান কী?

উত্তর ৪১৫:

1. যদি ৪০ দিনের আগে রক্তস্রাব হয়, তবে তা 'দামে ফাসাদ' (অস্বাভাবিক রক্ত), নিফাস নয়।
2. যদি ৮০ দিনের পর রক্তস্রাব হয়, তবে তা নিফাস হিসেবে গণ্য হবে।
3. যদি ৪০ থেকে ৮০ দিনের মধ্যে হয় এবং ভ্রূণের আকৃতি স্পষ্ট হয়ে থাকে, তবে তা নিফাস।
4. শায়খ আলবানির মতে, গর্ভ যে পর্যায়েই থাকুক, গর্ভপাতের পর যে রক্ত বের হয় তা নিফাস হিসেবে গণ্য হবে।

প্রমাণপঞ্জী

ক্র.	বইয়ের নাম	লেখক	প্রকাশনা
1	কুরআন ও তাফসিরসমূহ	—	—
2	হাদিস ও তার শারাহসমূহ	—	—
3	ফিকহ ও তার শারাহসমূহ	—	—
4	মুআত্তা ইমাম মালিক (রিওয়ায়াত ইয়াহইয়া)	ইমাম মালিক (রহ.)	দার ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবি, বৈরুত (লেবানন)
5	সহিহ বুখারি	ইমাম বুখারি (রহ.)	islamicurdubooks.com
6	সহিহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম (রহ.)	islamicurdubooks.com
7	সুনান তিরমিযি	ইমাম তিরমিযি (রহ.)	islamicurdubooks.com
8	সুনান আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ (রহ.)	islamicurdubooks.com
9	সুনান নাসাঈ	ইমাম নাসাঈ (রহ.)	islamicurdubooks.com
10	সুনান ইবনে মাজাহ	ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.)	islamicurdubooks.com
11	মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা	ইমাম ইবনে আবি শাইবা (রহ.)	দার আল-কুনূয ইশবিলিয়া, রিয়াদ
12	মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক	ইমাম আবদুর রাজ্জাক (রহ.)	দার আত-তাসিল
13	মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বাল	ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)	মুআসসাসাতুর রিসালাহ
14	মুসনাদ আল-হুমাইদি	ইমাম আল-হুমাইদি (রহ.)	দার আস-সাকা, দামেস্ক
15	সহিহ ইবনে খুযাইমাহ	ইমাম ইবনে খুযাইমাহ (রহ.)	দার আত-তাসিল
16	সুনান দারাকুতনি	ইমাম দারাকুতনি (রহ.)	মুআসসাসাতুর রিসালাহ
17	আল-মুস্তাদরাক ‘আলা আস-সহিহাইন	ইমাম হাকিম (রহ.)	দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরুত
18	সুনান আদ-দারিমি	ইমাম দারিমি (রহ.)	দার আল-মুগনি লিন-নাশর ওয়াত-তাওযি, সৌদি আরব
19	সহিহ ইবনে হিব্বান	ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.)	দার ইবনে হাযম, জেদ্দা

20	মা'আলিমুস সুনান (সুনান আবু দাউদের শারাহ)	ইমাম খাত্তাবি (রহ.)	তাবআহ ও তাহকিক: মুহাম্মাদ রাগিব আত-তাব্বাখ
21	সিলসিলা আহাদিস সাহিহাহ ও যাঈফাহ	শায়খ আলবানি (রহ.)	মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ
22	সুনান কুবরা আল-বাইহাকি	ইমাম বাইহাকি (রহ.)	দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরুত
23	আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন	ইমাম কুরতুবি (রহ.)	দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যা, কায়রো
24	তাফসিরুল কুরআনিল আজিম	ইমাম ইবনে কাসির (রহ.)	দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরুত
25	আল-মুহাল্লা বিল আসার	ইমাম ইবনে হাজম (রহ.)	দারুল ফিকর
26	আত-তামহিদ	ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.)	মুআসসাসাতুল ফুরকান লিত-তুরাস আল-ইসলামি
27	আল-কাফি ফি ফিকহি আহলিল মাদিনা	ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.)	মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদিসা
28	আল-মাবসুত	ইমাম সারাখসি (রহ.)	মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদিসা, সৌদি আরব
29	আশ-শরহুল মুমতি' 'আলা যাদুল মুস্তাকনি'	শায়খ ইবনে উসাইমিন রহ.	দার ইবনুল জাওযি
30	আল-ইজমা'	ইমাম ইবনুল মুনযির রহ.	দারুল মুসলিম
31	শরহু মা'আনিল আছার	আবু জা'ফর আত-তাহাবি রহ.	'আলামুল কুতুব
32	শরহুস সুন্নাহ	ইমাম বাগাভী রহ.	আল-মাকতাব আল-ইসলামি, দামেস্ক, বৈরুত
33	মাজমু'উল ফাতাওয়া	ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহ.	মজমা' মালিক ফাহদ লি তিবাআতিল মুসহাফ আশ-শরিফ, মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব
34	আল-মুগনি	ইমাম ইবনে কুদামাহ আল-মাকদিসি রহ.	দারুল কুতুব, রিয়াদ, সৌদি আরব

35	ফাতহুল কাদির ‘আলাল হিদায়াহ	আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ.	শিরকাত মাকতাবাহ ও মাতবা‘আত মুসাফফা আল-বাবি আল-হালাবি ও আওলাদুহু, মিসর
36	বাদায়ে‘উস সানায়ে‘ ফি তারতিবিশ শারায়ে‘	আল্লামা আল-কাসানি রহ.	মাতবা‘আতুল জামালিয়্যাহ, মিসর
37	তামামুল মিন্নাহ ফি তা‘লীক ‘আলা ফিকহিস সুন্নাহ	শায়খ আলবানি রহ.	দারুর রায়াহ
38	শারাহ সহিহুল বুখারি	ইমাম ইবনে বত্তাল রহ.	মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ
39	আল-মাজমু‘ শরহুল মুহায্যাব	ইমাম নাবাবি রহ.	ইদারাতুত তিবাআতুল মুনীরিয়্যাহ, কায়রো
40	শরহুল উমদাহ ফিল ফিকহ	ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ.	মাকতাবাতুল উবাইকান, রিয়াদ
41	আল-ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ লি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ	ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ.	দার ‘আতাআতুল ইলম (রিয়াদ), দার ইবনে হাজম (বৈরুত)
42	যাদুল মা‘আদ ফি হাদি খাইরিল ইবাদ	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ.	মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত; মাকতাবাতুল মানার আল-ইসলামিয়্যাহ, কুয়েত
43	আত-তারিখুল কাবির (তারিখ ইবনে আবি খাইছামাহ)	ইমাম ইবনে আবি খাইছামাহ রহ.	আল-ফারুকুল হাদিসাহ লিত্তিবা‘আহ ওয়ান নাশর, কায়রো
44	সিলসিলাতুল আহাদিস আদ-যা‘ইফাহ	শায়খ আলবানি রহ.	মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, রিয়াদ
45	আল-জামি‘উস সহিহ ওয়া যিয়াদাতুহু	শায়খ আলবানি রহ.	আল-মাকতাব আল-ইসলামি
46	ইরওয়াউল গালীল ফি তাখরীজ আহাদিস মানারিস সাবীল	শায়খ আলবানি রহ.	আল-মাকতাব আল-ইসলামি, বৈরুত
47	নায়লুল আওতার	ইমাম শাওকানি রহ.	দারুল হাদিস, মিসর

48	আল-মিনহাজ শারাহ সহিহ মুসলিম	ইমাম নাবাবি রহ.	দার ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী, বৈরুত
49	ফাতহুল বারী শারাহ সাহিহুল বুখারী	ইমাম ইবনে হাজর আসকালানি রহ.	দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত
50	আত-তামহীদ লিমা ফিল মুওয়াত্তা	ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ.	ওযারাতু উমূমিল আওকাফ, মরক্কো
51	মারাতিবুল ইজমা' ফিল ইবাদাত ওয়াল মু'আমালাত ওয়াল ই'তিকাদাত	ইমাম ইবনে হাজম রহ.	দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
52	শারাহ বুলুগুল মারাম (উর্দু)	সফিউর রহমান মুবারকপুরি রহ.	দারুস সালাম
53	শারাহ সুনান আন-নাসাঈ	শায়খ আর-রাজিহী	সূত্র: অডিও দরস, ইসলামিক নেটওয়ার্ক ওয়েবসাইট
54	যাদুল মা'আদ ফি হাদি খাইরিল ইবাদ	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ.	মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত; মাকতাবাতুল মানার আল-ইসলামিয়্যাহ, কুয়েত
55	মাজমু' ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাওয়িয়াহ	শায়খ ইবনে বায রহ.	রিয়াসাত ইদারাতুল বুহুস আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, সৌদি আরব
56	আস-সুন্নাহ	ইমাম মারওয়াজি রহ.	মুআসসাসাতুল কুতুব আস-সাকাফিয়্যাহ, বৈরুত
57	বুহুস ওয়া ফাতাওয়া ফিল মাসহ 'আলাল খুফফাইন	শায়খ ইবনে উসাইমিন রহ.	দারুল ওয়াতান লিন নাশর
58	আত-তাহারাহ	শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ.	জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সৌদ, রিয়াদ
59	আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ	ইমাম ইবনুস সুন্নি রহ.	দারুল কিবলাহ লিস্ সাকাফাহ আল-ইসলামিয়্যাহ

60	‘আউনুল মা‘বূদ ‘আলা শারাহ সুনান আবি দাউদ	আল্লামা শামসুল হক আজিমাবাদি রহ.	দার ইবনে হাজম
61	তুহফাতুল আহওয়াযি শারাহ জামে‘ তিরমিযি	আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরি রহ.	দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
62	আল-‘আরফুশ শাযী শারাহ সুনান তিরমিযি	আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ.	দারুত তুরাস আল-আরাবী, বৈরুত
63	আদ-দারারী আল-মুদিয়্যাহ শারাহ আদ-দুরার আল-বাহিয়্যাহ	ইমাম শাওকানি রহ.	দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ
64	আস-সাইল আল-জারার আল-মুতাদাফিক ‘আলা হাদায়িক আল-আযহার	ইমাম শাওকানি রহ.	দার ইবনে হাজম
65	নায়লুল আওতার মিন আসরার মুনতাকাল আখবার	ইমাম শাওকানি রহ.	দার ইবনুল জাওযী, সৌদি আরব
66	মিশকাতুল মাসাবিহ	ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব আত-তাবরিজি রহ.	আল-মাকতাব আল-ইসলামি, বৈরুত
67	মিরকাতুল মাফাতিহ শারাহ মিশকাতুল মাসাবিহ	মুল্লা আলি আল-কারি রহ.	দারুল ফিকর, বৈরুত
68	মিরআতুল মাফাতিহ শারাহ মিশকাতুল মাসাবিহ	আবুল হাসান উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরি রহ.	আল-জামিয়া সালাফিয়্যাহ, বেনারস, ভারত
69	সুবুলুস সালাম	মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আস-সান‘আনি রহ.	দার ইবনুল জাওযী, সৌদি আরব
70	আর-রওযাতুন নাদিয়্যাহ (এবং এর সাথে: আর-রওযাতুন নাদিয়্যাহ-এর উপর আত-তা‘লীকাতুর রাযিয়্যাহ)	আল্লামা সিদ্দীক হাসান খান রহ.	দার ইবনুল কাইয়্যিম লিন নাশর ওয়াত তাওযী‘, রিয়াদ
71	মাজমু‘ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাওয়িয়াহ	শায়খ ইবনে বায রহ.	রিয়াসাত ইদারাতুল বুহুস আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, সৌদি আরব

72	ফাতাওয়া নূর ‘আলাদ দরব	শায়খ ইবনে বায রহ.	আর-রিয়াসাহ আল-আম্মাহ লিল বুহুস আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, রিয়াদ
73	মাজমু‘ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল	শায়খ ইবনে উসাইমিন রহ.	দারুল ওয়াতান, দারুস সুরাইয়া
74	ফাতাওয়া নূর ‘আলাদ দরব	শায়খ ইবনে উসাইমিন রহ.	আল-কিতাব মুরাক্কাম আলিয়্যা
75	লিকাউল বাব আল-মাফতুহ	শায়খ ইবনে উসাইমিন রহ.	সূত্র: অডিও দরস, ইসলামিক নেটওয়ার্ক ওয়েবসাইট
76	ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ	সংকলন ও বিন্যাস: আহমদ ইবনে আবদুর রাজ্জাক আদ-দুয়াইশ	রিয়াসাত ইদারাতুল বুহুস আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, রিয়াদ
77	আল-ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ লিল ইমাম আলবানি	শায়খ ইবরাহিম আবু শাদি	দারুল গাদ আল-জাদিদ
78	আল-মুলাখখাস আল-ফিকহি	সালেহ ইবনে ফাওযান ইবনে আবদুল্লাহ আল-ফাওযান	দারুল আসিমাহ, রিয়াদ
79	তাসহীলুল ফিকহ	আবদুল্লাহ ইবনে জিবরীন	দার ইবনুল জাওযী লিন নাশর ওয়াত তাওযী‘, সৌদি আরব
80	শারাহ আখসরুল মুখতাসারাত	আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জিবরীন	সূত্র: অডিও দরস, ইসলামিক নেটওয়ার্ক ওয়েবসাইট
81	শারাহ উমদাতুল আহকাম	আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জিবরীন	সূত্র: অডিও দরস, ইসলামিক নেটওয়ার্ক ওয়েবসাইট
82	আল-মাউসু‘আহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-মুয়াসসারাহ	হুসাইন আউদাহ আল-আওয়াইশাহ	দার ইয়াফা আদ-দাওলিয়্যাহ
83	সহিহ ফিকহুস সুন্নাহ ওয়া	আবু মালিক কামাল ইবনে	আল-মাকতাবাতুত

	আদিল্লাতুহু ওয়া তাওযিহ মাযাহিবিল আইম্মাহ	সাইয়্যিদ সালিম	তাওফিকিয়্যাহ, কায়রো, মিসর
84	আত-তারজীহ ফি মাসাইল আত-তাহারাহ ওয়াস সালাহ	ড. মুহাম্মাদ ইবনে উমর ইবনে সালিম বাজমুল	দারুল হিজরাহ, সৌদি আরব
85	আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ	শায়খ আলভী ইবনে আবদুল কাদির আস-সাক্কাফ	dorar.net
86	AskIslamPedia (ইসলামিক তথ্যভান্ডার)	ড. হাফিজ আরশাদ বাশির মাদানি	askislampedia.com
87	আল-উকাহ	সা'দ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হামিদ	alukah.net
88	সাইদুল ফাওয়ায়িদ	—	saaid.org